মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

রোমাঞ্চ

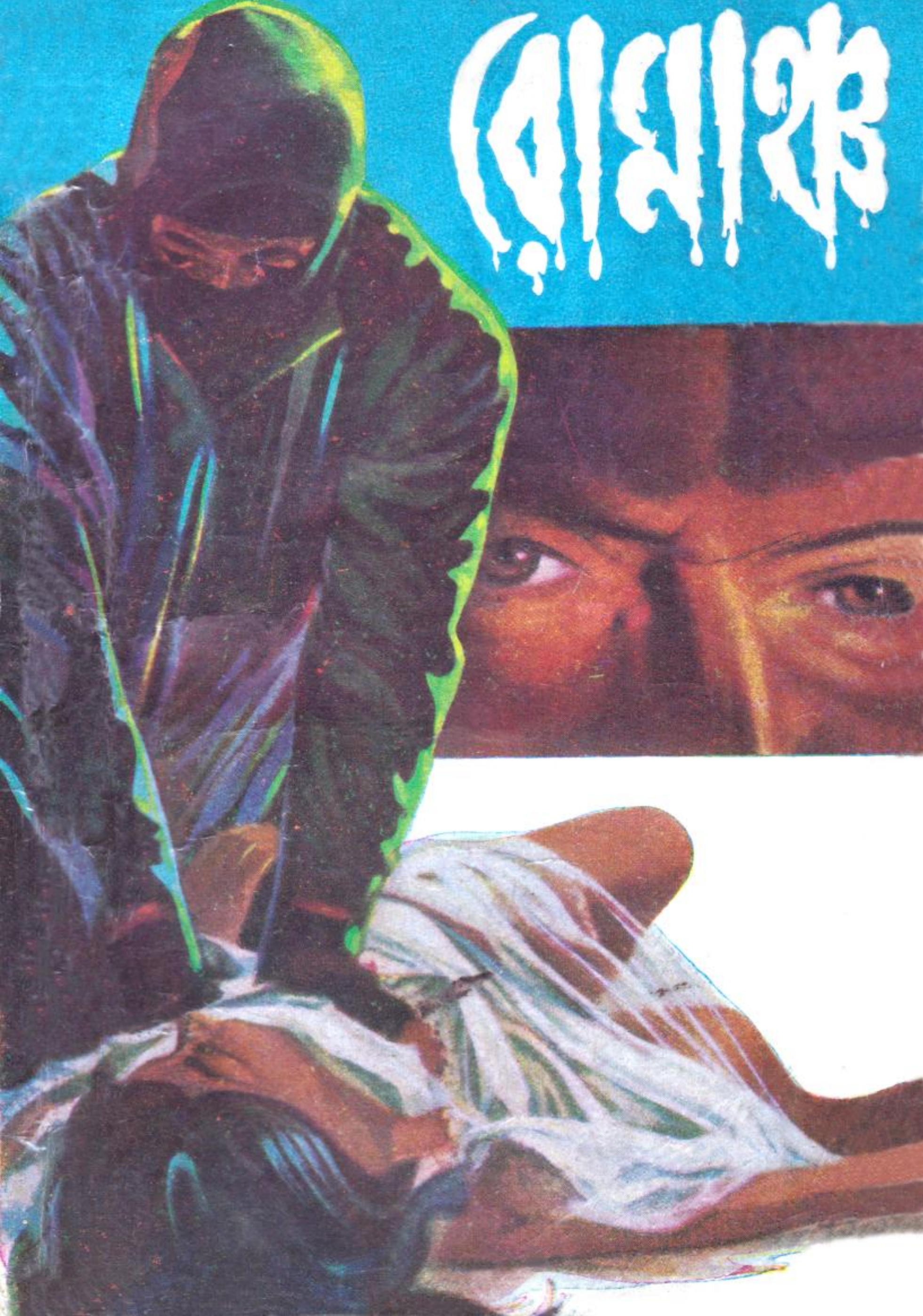

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন - রুস্তম মুখার্জি

স্ক্যান করেছেন - পদিপিসি

এডিট করেছেন - পদিপিসি

একটি আবেদন

আপনাদের কারোর কাছে যদি কোন পত্রপত্রিকার বিশেষ সংখ্যা থাকে এবং আপনি সেটা আমাদের স্ক্যান করতে দিতে চান কিংবা আপনি স্ক্যান করে দিতে চান তাহলে শীঘ্রই নিচের ইমেল এ যোগাযোগ করুন

dhulokhela@gmail.com

optifmcybertron@gmail.com

শারদীয় রোমাঞ্চ

দাম কুড়ি টাকা

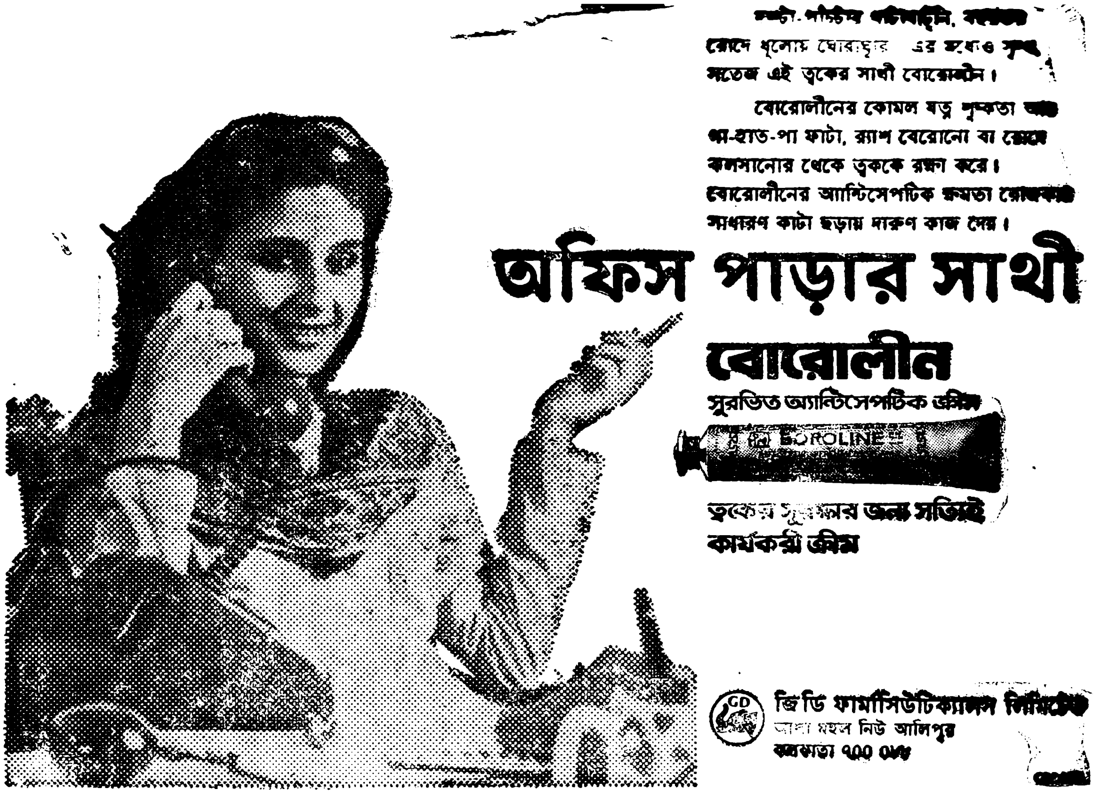

সতেজ এই ত্বকের সাথী বোরোলীন।
বোরোলীনের কোমল যত্ন
-হাত-পা ফাটা, র‍্যাশ বেরোনো বা
থেকে ত্বককে রক্ষা করে।
বোরোলীনের অ্যান্টিসেপটিক ক্ষমতা
সাধারণ কাটা ছড়ায় দারুণ কাজ দেয়।
অফিস পাড়ার সাথী
বোরোলীন
সুরভিত অ্যান্টিসেপটিক ক্রীম
BOROLINE
কার্যকরী ক্রীম
জি ডি ফার্মাসিউটিক্যালস
নিউ আলিপুর

মাসিক রোমাঞ্চ

শারদীয় সংখ্যা
১৩৯৭

সূচীপত্র

দুটি বৃহৎ গোয়েন্দা উপন্যাস

নীলকান্তপুরের হত্যাকাণ্ড ॥ ৪৯ ॥ মনোজ সেন

কালো সরকার ॥ ২০০ ॥ অদ্রীশ বর্ধন

দুটি রহস্য নভেলেট

বাসন্তী রঙের চন্দ্রমল্লিকা ॥ ৫ ॥ বিমল কর

অভিশপ্ত হাত ॥ ১৩৬ ॥ আনন্দ বাগচী

দুটি বড় রহস্য গল্প

ইচ্ছাপূরণ ॥ ৩৩ ॥ শোভন সোম

সোনার হরিণ ॥ ১৬৮ ॥ হীরেন চট্টোপাধ্যায়

ছটি ছোট রহস্য কাহিনী

ঠোঁট ॥ ১৫৮ ॥ শ্রীধর সেনাপতি

অপরাধের চিহ্ন থাকে ॥ ২৩৬ ॥ মনীশ প্রধান

মনে মনে ॥ ১৮৬ ॥ অমল রায়

একটি ভুলের জন্যে ॥ ১৪৫ ॥ সন্তোষ চট্টোপাধ্যায়

মিষ্টি বিষের স্বাদ ॥ ১৯৩ ॥ বসুমিত্র দত্ত

বুদ্ধির বাইরে ॥ ২৫০ ॥ শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়

প্রচ্ছদপট ॥ পূর্ণজ্যোতি ভট্টাচার্য

॥ এই সংখ্যার দাম কুড়ি টাকা ॥

With Best Compliments of :-

ROY ENTERPRISES

26/1A, Paik Para Row,

Calcutta-37.

With Compliments from :-

Phone : 35-9202

BHOLANATH TIN WORKS

Manufacturers of all shorts of Metal & Tin Boxes,
Fancy Screw Caps (Aluminium, Tin, Brass etc.)

102, Raja Dinendra Street,
Calcutta-700006

মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত মাসিক

রোমাঞ্চ

শারদীয় ॥ ১৩৯৭

'রোমাঞ্চ' পত্রিকা যে কোনদিন হীরক জয়ন্তী বর্ষের দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছবে, এমন অসম্ভব কল্পনা বোধ হয় স্বপ্নেও কোনদিন করি নি।

কিন্তু তবু তা সম্ভব হল। বর্তমান সংখ্যাটি রোমাঞ্চর উনষাটতম পূজাবার্ষিকী। পৃথিবীর ইতিহাসে, বিশেষ করে গোয়েন্দা-পত্রিকার ক্ষেত্রে, এ ধরণের ঘটনা ইতিপূর্বে কোনদিন ঘটেছে বলে জানি না—অন্তত আমাদের তা জানা নেই। সেদিক থেকে রোমাঞ্চই বোধ করি রেকর্ড সৃষ্টি করল প্রথম।

রোমাঞ্চ যখন পঞ্চাশ বছরে পা দেয়, ইচ্ছে হয়েছিল এর প্রকাশ বন্ধ করার। কিন্তু কেন জানি না, পারি নি। তাই, বহু দিক থেকে শরবিদ্ধ হওয়ার যন্ত্রণা ভোগ করেও এর প্রকাশ চালিয়ে গেলাম আরও দশ বছর। অবশ্য এর পেছনে যদি পাঠকবর্গের প্রেরণা না থাকত, তাহলে কি হত জানি না। আমরা মনে করি, যে কোন পত্রিকাকে টিকিয়ে রাখার পাথেয় হিসেবে প্রথম যে জিনিসটির প্রয়োজন, সেটি হল পাঠকদের ভালোবাসা এবং শুভেচ্ছা। রোমাঞ্চ বরাবরই তা পেয়ে এসেছে, আশা করি ভবিষ্যতেও বঞ্চিত হবে না তা থেকে।

বাসন্তী রঙের চন্দ্রমল্লিকা

বিমল কর

রুদ্ধনিশ্বাসে যেন কোন ক্ষ্যাপা কুকুর তাড়া করেছে—তেমনি দ্রুত-বেগে আধ-অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে সুশান্ত ওপরে উঠতে লাগল। বুকের কাঁপুনি তীব্র হয়ে উঠেছে—তীব্র হয়ে উঠেছে তার হাল্কা চোখ অদ্ভুত এক জ্যোতিতে। সমস্ত গা কণ্টকিত।

সিঁড়ির শেষে প্রথমেই চোখে যে ঘরখানা পড়ল, সুশান্ত পাগলের মতন তার ওপর ধাক্কা দিতে লাগল। দরজা বন্ধ—ধাক্কায় খুলল না একটুও; শুধু একটা বিশ্রী শব্দ উঠে সেই আধ-অন্ধকার ঢাকা জায়গাটা গমগম করে উঠল।

আরও জোরে—আরও জোরে, সুশান্ত যেন সত্যি সত্যি উন্মাদ হয়ে গেছে। আবার ধাক্কা দিল সে। দরজা খুলে গেল; পথ রোধ করে দাঁড়াল একমুখ দাড়ি-গোঁফ ভর্তি দীর্ঘ শীর্ণ একটা লোক।

কি চাই?—বিশ্রীরকম ধমক দিয়ে লোকটা জানতে চাইল। তার কথা আর দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে প্রচুর বিরক্তি ঝরে পড়ছে।

এখুনি—সুশান্ত যেন ভয় পেয়ে আশ্রয় চাইছে এমনি তাড়াতাড়ি, চাপা গলায়, উত্তেজনায় উত্তপ্ত হয়ে বলল, এখুনি একটি মেয়ে ঢুকেছে এ বাড়িতে?

দরজা আগলে দাঁড়িয়ে-থাকা লোকটা সুশান্তর কথায় বাধা দিল, মেয়ে? মেয়ে ঢুকবে এখানে? না, কোন মেয়ে-ফেয়ে ঢোকে নি।

কিন্তু—সুশান্ত গলায় দৃঢ়তা এনে বলল, আমি স্বচক্ষে দেখেছি, এই বাড়িতে সে ঢুকল।

লোকটা সুশান্তর কথায় কয়েক মুহূর্ত যেন অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে বলল, কি বলছেন, মশাই! মাল-ফাল খেয়ে পথ হাঁটছিলেন নাকি?

মানে?—সুশান্ত বিক্ষুব্ধ স্বরে বললে।

এ বাড়ির ত্রিসীমানায় কোন মেয়ে কখনো ঘেঁষে না!—লোকটার বীভৎস মুখ একটা অশ্লীল হাসিতে জ্বলজ্বল করে উঠল।

কি বলতে চান আপনি?—সুশান্ত অনেকটা নিভে গেল লোকটার হাসিতে। ভেতরে ভেতরে বিরক্ত হয়ে উঠল ও। কেমন যেন একটা ঘেয়ো গন্ধ ফেনিয়ে উঠছে লোকটার সর্বাঙ্গে।

এ বাড়িটা কিসের?

ভূ-তে-র!—লোকটা টেনে টেনে কথাটা বলে হো হো করে হেসে উঠল। সে হাসিতে যেমন অজস্র কদর্যতা, তেমনি বিক্ষিপ্ত একটা বীভৎসতা। বদ্ধ জায়গাটা হাসির দমকে গুমরে উঠল।

সুশান্ত থমথমে চোখে তাকিয়ে থাকল লোকটার দিকে। ঘরের মধ্যেকার মৃদু আলোয় তার বন্য মুখখানা আরও বন্য হয়ে উঠেছে।···এ কি! এ সে কোথায় এসেছে! এতক্ষণ পরে সুশান্তর খেয়াল হল। এ জায়গাটা তো তার অচেনা, অজানা! তবু আবার খানিকটা সাহস সংগ্রহ করে সুশান্ত বললে, দেখুন, আমি একটি মেয়েকে এ বাড়ির মধ্যে ঢুকতে দেখেছি।

স্বচক্ষে দেখেছেন, এ বাড়ির মধ্যে ঢুকল ?

হ্যাঁ, একরকম তাই। রাস্তার মোড় ঘুরলেই তো এই একখানা মাত্র বাড়ি এদিকে! ওকে আমি দেখলাম মোড় ঘুরতে। তার পেছনে পেছনে আমিও আসছিলাম। মোড়ের মাথায় আসতেই তাকে আর দেখলাম না। একটা মানুষ তো আর হাওয়ায় মিলিয়ে যেতে পারে না! স্বভাবতই আমার সন্দেহ হল, এ বাড়িতে সে ঢুকেছে। আর তো দ্বিতীয় কোন বাড়ি নেই এদিকে!

সুশান্ত যথেষ্ট বুদ্ধির প্রকাশ দেখাল তার কথায়।

কি জানি কেন, লোকটা সুশান্তর কথায় খানিকটা ভদ্র হল। বললে, আপনি ভুল করেছেন। এটা পোড়ো বাড়ি। এখানে—

লোকটা এক মুহূর্ত থেমে কি ভেবে গলার স্বর নামিয়ে নিয়ে বললে, এখানে মানুষ আসে না। যান—পালিয়ে যান; দাঁড়াবেন না বেশিক্ষণ!

আতঙ্কজনক লোকটা অদ্ভুত থমথমে গলায় তার কথা শেষ করল। তার চোখে-মুখে কোথাও আর সেই অশ্লীলতা নেই—কেমন করে না জানি নেমে এসেছে একটা অব্যক্ত শোকের গভীর ছায়া। তার চোখে কেমন একটা সুদূর অন্ধকারের আবেশ।

কিন্তু—। সুশান্ত দো-মনা হল।

বিশ্বাস না করেন, ঘরে আপনাকে আমি আসতে দিতে পারি—তন্ন তন্ন করে দেখে যেতে পারেন সব। কিন্তু তারপরে? কোন দায়িত্ব—'

থাক।—সুশান্ত বাধা দিল, আমি ফিরে যাচ্ছি।

দ্বিতীয় আর কোন কথা না বলে সুশান্ত সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল। সমস্ত দেহে-মনে অদ্ভুত একটা জমাট ভয় কাপড়ের মত জড়িয়ে ধরেছে তাকে।

পেছন থেকে লোকটার সেই বন্য হাসি শোনা গেল। তারপর যেমন করে হঠাৎ ঝড়ে-খোলা দরজা বন্ধ হয়ে যায়, তেমনিভাবে সশব্দে দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল।

চমকে উঠল সুশান্ত; দ্রুত হয়ে উঠল তার হৃদস্পন্দন! যেমন ভীতার্ত অবস্থায় সে এসেছিল, ঠিক তেমনিভাবেই নেমে যেতে লাগল অন্ধকার সিঁড়ি বয়ে।

পথে নেমে হনহন করে হাঁটতে লাগল সুশান্ত। মাথা তার তখনও গরম হয়ে রয়েছে; জ্বালা করছে চোখ দুটো; হাতগুলো কেমন যেন অসাড়।

ঠাণ্ডা হাওয়ায় অনেকটা হেঁটে সুশান্ত বাঁধের কাছাকাছি মাঠটার সামনে এসে দাঁড়াল। অন্ধকার ঘন হয়ে আসছে। তবু এখনও ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ভ্রাম্যমান ছেলে-মেয়ে-বুড়ো—এদের দেখা যায়। সুশান্তর প্রায় গা ঘেঁষে অশোক মিত্র তার নতুন বউয়ের হাত ধরে চলে গেল। কে ওটা! কে ওটা—ওই যে ছড়ির ওপর ভর দিয়ে হেঁটে এগিয়ে আসছে এদিকে! পরিতোষবাবু না? হ্যাঁ, পরিতোষবাবুই তো! সুশান্ত অন্যদিকে হাঁটতে শুরু করল। কে জানে কেন, পরিতোষবাবুকে একদম সে সহ্য করতে পারে না আজকাল। অথচ ভদ্রলোক প্রতিবেশী; একদা যথেষ্ট বন্ধু ছিলেন।

ভ্রাম্যমানদের ভিড় থেকে সরে এসে একটা পাথরের ওপর বসল সুশান্ত। সিগারেট ধরিয়ে খানিকক্ষণ নিঃশব্দে ধোঁয়া গিলল।

মাথার চুলগুলো জোরে জোরে আঙুলে জড়িয়ে জড়িয়ে টানল অনেকক্ষণ। তারপর পাথর থেকে নেমে ঘাসের ওপরই শুয়ে পড়ল। আকাশের তারায় থমকে থাকল তার চোখ।

কি আশ্চর্য! সুশান্ত প্রথম থেকে ভাবতে লাগল। এ নিয়ে দু-দুবার! অর্চনাকে সে দু-দুবার দেখল এখনে। কি করে যে তা হয়—ভাবতেও অবাক লাগে। যে লোক মরে গেছে, তাকে কি করে আবার দেখা সম্ভব? অদ্ভুত—অদ্ভুত কাণ্ড! গত সপ্তায় 'ভ্যারাইটি স্টোরস' থেকে সিগারেট কিনে পথে নেমে দাঁড়াতেই ঠিক উল্টো রাস্তায় ওর দিকে পেছন করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল অর্চনাকে। অর্চনাকে বলা কি ঠিক? হ্যাঁ, সুশান্তর তাই মনে হল। পেছন থেকে লোক চেনা কষ্টকর সত্যি। কিন্তু অর্চনা তো শুধু চেনা নয়, অনেক দিনের চেনা—অনেক আলো, অনেক অন্ধকারের জানা। ঠিক তেমনি হেলে দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গি। গায়ে সেই তার খুব-প্রিয় কমলা রঙের শাড়ি, আর তার বরাবরের অভ্যেস এলো খোঁপা বাঁধা! অর্চনা ছাড়া অন্য কোন মেয়ে সে হতে পারে না! সুশান্তর চোখ অর্চনার মাথার চুল দেখে চিনে নিতে পারে—আর সে কিনা গোটা দেহটাকে দেখে ভুল করবে! নাই-বা দেখল মুখ!

সুশান্ত প্রথমটা চমকে উঠেছিল, তারপর তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাবে—এমন সময় অর্চনা হাঁটতে শুরু করল। একটু এগিয়েই ও ঢুকল একটা গলির মধ্যে, তারপর মিলিয়ে গেল কোথায়। সুশান্ত সেদিন পিছু ধাওয়া করে নি—কেননা, সে অবসরই পায় নি। তা ছাড়া এত বেশি হকচকিয়ে গিয়েছিল যে পা বাড়াবার সংবিত ফিরে পাবার আগেই একরকম অর্চনা চলে গেল। তারপর সুশান্ত অনেক ভেবেছে। শেষ পর্যন্ত তার মনে হয়েছে, ওটা চোখের ভুল—মরা মানুষ কখনো বেঁচে উঠতে পারে না। কিংবা হয়তো-বা এ শহরে আর একজন কেউ এসেছে—যাকে পেছন থেকে অর্চনার মতই দেখায়, আর সেই নবাগন্তুক মেয়েটি অর্চনার মতনই কমলালেবু রঙের

শাড়ি পরে, হেলে দাঁড়ায়, এলো খোঁপা বাঁধে।

অর্চনাকে—কি বলা যায়—অর্চনার মত অবিকল সেই মূর্তি দেখে সুশান্তর মনে প্রথম যে ঝড় ওঠে, অনেক ভাবনা-চিন্তা, অনেক মানসিক গবেষণার পর ধীরে ধীরে তা স্তিমিত হয়ে আসে। মানসিক বিক্ষিপ্ততাও ক্রমে জুড়িয়ে গুটিয়ে আসে। আকস্মিকতার দোহাই মেনে মনে মনে সে আবার স্বচ্ছন্দ হয়ে ওঠে।

হয়তো সুশান্তর এরকম মানসিক ভারসাম্য অব্যাহতই থাকত, যদি না আজ আবার—আবার সেই একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি ঘটত। আজকের ঘটনাটা পুরোপুরি সুশান্ত আবার প্রথম থেকে ভাবতে শুরু করল।

বিকেলের রোদটুকু হাল্‌কা হতে না হতে সুশান্ত বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে। 'প্লেজার কর্নারে' বিপ্রদাসের সঙ্গে চা খাবার কথা ছিল। সেখান থেকে চা খেয়ে গল্পগুজব করে বেরুতে ওর প্রায় বিকেল গড়িয়ে এল। পথে নেমে খানিকটা এসে 'ভ্যারাইটি স্টোর্‌স'। সিগারেট কিনে সুশান্ত পথে নামতেই খানিকটা দূরে আবার ঠিক সেই আগের মতনই দেখল অর্চনার প্রতিমূর্তি। এবার যেন আরও পরিষ্কার, আরও স্পষ্ট। সুশান্ত দেখল, সেই কমলালেবু রঙের শাড়ি, এলো খোঁপা, হেলে দাঁড়ানো। এ ছাড়া লক্ষ্য পড়ল আরও একটা জিনিসের ওপর। অর্চনার হাতের লেডিস ছাতাটা! অবিকল সেইরকম ছাতা তার হাতে।

সুশান্তর বুকটা কেঁপে উঠল; চোখ দুটো বিস্ময় আর বিহ্বলতা নিয়ে থমকে থাকল খানিকক্ষণ। কয়েক মুহূর্ত অদ্ভুত একটা পরিস্থিতির মধ্যে কেটে গেল। হঠাৎ সুশান্ত দেখল, অর্চনার সেই মূর্তি হাঁটতে শুরু করেছে—এগিয়ে যাচ্ছে! সুশান্ত তাড়াতাড়ি পথে নেমে তার অনুসরণ করলে। আশ্চর্য, সুশান্ত যত পা চালায়—তার গতিবেগ বৃদ্ধি করে, সামনের সেই অস্পষ্ট মূর্তিও তত দ্রুত এগিয়ে যেতে থাকে। একেই তো অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে, তার ওপর ক্রমশ

এরকম দূরত্ব রেখে পিছু ধাওয়া অত্যন্ত অসুবিধাজনক। ওই তো এ রাস্তা শেষ হয়ে এল। তারপরেই মল্লারবাগের মোড়। গাছের ছায়ায় ঢাকা আঁকাবাঁকা মল্লারবাগের রাস্তায় যে-কোন মুহূর্তে অর্চনার ছায়ামূর্তি হারিয়ে যেতে পারে।

কথাটা মনে হতেই সুশান্ত দৌড়তে শুরু করল। সামনের মূর্তি যদিও দৌড়ল না, তবু মনে হল যেন তার হাঁটার গতিবেগ বৃদ্ধি পেয়েছে। সুশান্ত এবার আরও জোরে দৌড়তে শুরু করলে।

হয়তো এভাবে খানিকটা ছুটলে সুশান্ত মূর্তিটিকে অনায়াসে ধরে ফেলতে পারত, কিন্তু বাধ সাধল তাতে গৌতম। পেছন থেকে সাইকেল সমেত এসে পড়ল তার ঘাড়ের ওপর।

অন্য লোক হলে কি হত বলা যায় না, গৌতমকে দেখে অনেক কষ্টে রাগ সামলে সুশান্ত বললে, সাইকেল-রেস দিচ্ছ নাকি ?

গৌতম সাইকেলের প্যাডেলে পা দিয়ে হাসল। বললে, না, এদিক দিয়েই যাচ্ছিলাম। যাব একবার হিরণদের আড্ডায়। সন্ধ্যের আগেই পৌঁছবার কথা ছিল। দেরি হয়ে গেল, তাই স্পীডের মাথায়—

বুঝলাম।—সুশান্ত গৌতমকে থামিয়ে হাসি টেনে আনবার চেষ্টা করে বললে, স্পীডের ঝোঁকে অ্যাক্সিডেন্ট ঘটালে আমি নাহয় চুপ করে থাকতুম। অন্য লোক হলে যে গালাগাল দিত—চাই কি থানায় টেনে নিয়ে যেত।

সে কথার কোন জবাব না দিয়ে গৌতম শুধু হাসল। তারপর একটু ইতস্তত করে বলল, তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল—ভালই। আমাকে আজ রাত্তিরেই হয়তো যেতে হত তোমার কাছে।

কেন ?—সুশান্ত সামনের দিকে তাকিয়ে বিরক্তি চেপে বললে।

অর্চনার সেই মূর্তি আরও অস্পষ্ট হয়ে গেছে সত্যি, কিন্তু তবুও পুরোপুরি মিলিয়ে যায় নি। যদি এখনও আগের মতন ছুটে ধাওয়া করতে পারে, হয়তো তাকে ধরতেও পারবে। ব্যগ্র হয়ে উঠল

সুশান্ত।

আমার কিছু টাকার দরকার।—গৌতম বললে।

কত?

শ' খানেক।

অন্য সময় হলে সুশান্ত বোধ হয় চিৎকার করে উঠত; কিন্তু এখন সে একশ' কেন, তার বেশিও যদি চাইত গৌতম, শুধু তার হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে সুশান্ত রাজী হয়ে যেত। সুশান্ত বললে, বেশ, রাত্রে বাড়িতে এস।

ধন্যবাদ।—গৌতম সুশান্তর পিঠ চাপড়ে বললে, দাও, একটা সিগারেট দাও—খাই।

সিগারেট ধরিয়ে গৌতম সাইকেলে উঠতেই সুশান্ত বললে, মাঠের মধ্যে দিয়ে শর্ট-কাট করে যাও—হিরণদের আড্ডায় পৌঁছে যাবে।

তাই যাব।—দ্বিতীয় কোন কথা না বলে গৌতম মাঠের রাস্তা দিয়ে নেমে গেল সাইকেল সমেত।

গৌতম যদি সোজা যেত,—সুশান্ত ভাবল—তাহলে সেও বোধ করি অবাক হত। কিন্তু সুশান্ত তা যেন চায় নি আর।

সৌভাগ্যের কথা, গৌতম মল্লারবাগের রাস্তা না গিয়ে মাঠের রাস্তা নিল।

গৌতম চলে যাবার পর সুশান্ত আবার ছুটতে শুরু করলে।

অপস্রিয়মান মূর্তি কখনও ভেসে ওঠে, কখনও মিলিয়ে যায়। অনেক কষ্টের পর যদিও-বা তার কাছাকাছি আসা গেল—দুর্ভাগ্য সুশান্তর, আবার মোড় পড়ল তার পথে। মোড়ের আড়ালে মূর্তিটা যে কোথায় মিলিয়ে গেল, কে জানে। সুশান্ত ভেবেছিল, বুঝি-বা মোড়ের পরই যে বাড়িখানা আছে, সেখানেই ঢুকে পড়েছে মেয়েটি। তাই এমন একটা দৃঢ় সন্দেহের ওপর আস্থা রেখেই সুশান্ত বাড়ির মধ্যে ঢুকে খোঁজ নিতে গিয়েছিল।

আশ্চর্য, সেই বীভৎস লোকটা কিছুতেই স্বীকার করল না— কোন মেয়ে সেখানে ঢুকেছে। সুশান্ত সে কথা প্রথমে বিশ্বাস করতে পারে নি, তারপর তা বিশ্বাস করছে। কারণ, প্রথমে না হলেও সুশান্ত পরে বুঝতে পেরেছিল, ওটা অর্জুন সিংএর চোরাই আড্ডা। চাল, মদ, আফিং—এসবের গুদাম। ভয়ে—হ্যাঁ, ভয়েই আর সুশান্ত ঢুকতে রাজী হয় নি ভেতরে। কে জানে, কি বিপদ ঘটবে। আর এও সত্যি কথা, ও আড্ডায় স্বেচ্ছায় কোন মেয়ে কোনদিন ঢুকবে না। যারা ঢোকে, তারা স্বেচ্ছায় নয়—শয়তানের হাতে পড়ে ঢোকে। আর সে ঢোকাই তাদের শেষ; ফিরে আসে না আর—সুদূর দেশে বিভিন্ন শহরে দেহের ব্যবসা করে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেয়।...না, অর্চনা তো দূরের কথা, ওর মতন কোন মেয়েই ও বাড়িতে ঢোকে নি, ঢুকতে পারে না! কিন্তু কি আশ্চর্য, যে কোন মেয়েই হোক— সে গেল কোথায়? কেমন করেই বা মিলিয়ে গেল? একটা গোটা মানুষ ভূতের মতন—ছায়ার মতন—মিলিয়ে যায়? এ যে অসম্ভব!

সুশান্তর সমস্ত মাথা গরম হয়ে উঠল ভাবতে ভাবতে। একবার নয়, দু-দুবার সে দেখল একই জিনিস। অর্চনার প্রত্যেকটা ভঙ্গির সঙ্গে সুশান্ত যত পরিচিত, এতটা বোধ করি গৌতম ছাড়া আর কেউ নয়! ভুল হবার জিনিস তো এ নয়, তবে?

অনেক ভেবেও সুশান্ত কোন কূল-কিনারা পায় না। রাত বেড়ে ওঠে। ফাঁকা হয়ে আসে মাঠ। দমকা ঠাণ্ডা হাওয়ায় গা-টা তার শিরশিরিয়ে ওঠে। সুশান্ত একবার ভাবে, গৌতমকে তখন কথাটা বললে কেমন হত! পরক্ষণেই তার বুকটা ধ্বক্ করে কেঁপে ওঠে। না, না—না বলাই ভাল। ভালই করেছে সে গৌতমকে কোন কথা না বলে।

আরও খানিকক্ষণ মাঠে বসে থেকে সুশান্ত বাড়ি ফিরে চলল।

বাড়িতে এসেও শান্তি নেই, স্বস্তি নেই। সেই একই কথা বারবার তার মনের সমস্ত চিন্তাকে আঁকড়ে ধরে রাখল। খাওয়া-দাওয়া শেষ করে ঘরে এসে শুলো সুশান্ত, চেষ্টা করল মনটাকে অন্য কিছুতে আটকে রাখবার ; কিন্তু পারলে না। হাতের বই ছুড়ে ফেলে দিল মাটিতে, গ্রামোফোনের রেকর্ড শেষ হয়ে কখন থেমে গেল—কোন হুঁশ থাকল না তার। সিগারেটের পর সিগারেট পুড়িয়ে পাগলের মত সারা ঘরময় শুধু পায়চারি করতে থাকল।

হঠাৎ কি করে না জানি, তার অদ্ভুত একটা কথা মনে হল—অর্চনা কি সত্যি সত্যিই মারা গেছে ? হয়তো—হয়তো অর্চনা মরে নি।

কথাটা মনে আসতেই একটা সাপ যেন চলে গেল সুশান্তর সমস্ত গা বয়ে, এমনভাবে চমকে উঠল ও। বাস্তবিক, অর্চনা যদি না মারা গিয়ে থাকে ? সুশান্ত তো নিজের চোখে সনাক্ত করে নি অর্চনার মৃতদেহ !

সে তখন অসুস্থ, পীড়িত। গৌতম আর কে কে যেন সনাক্ত করেছিল। অবশ্য, সে সনাক্ত ভুল হবার নয়। তবে ? সুশান্ত চমকে উঠল, এ একটা চাল নয় তো ? কোন ফন্দী ? কোন দুর্ভেদ্য ষড়যন্ত্র ?

অনেক—অনেকক্ষণ সুশান্ত ভাবল—কি হতে পারে ? একটা কথা অবশেষে মনে হল তার— সম্ভবত চল্লিশ-পঞ্চাশ ফুট উঁচু জায়গা থেকে পড়ে গেলেও হয়তো অর্চনা বাঁধের জলে পড়ে নি—মরেও নি তাই। বেঁচে থাকলেও থাকতে পারে, কিংবা—

অকস্মাৎ সুশান্তর মনে হল, একবার গিয়ে দেখে এলে কেমন হয়—ঠিক কোথা থেকে কেমনভাবে সে পড়েছিল !

কথাটা আরও নানাভাবে ফেনিয়ে উঠল তার মনে। আর অবশেষে সুশান্ত ঘরের বাতি নিভিয়ে সোজা নেমে এল নিচে। চাকরটাকে নিচে দেখতে পেয়ে বললে, আমি একটু পরে ফিরে

আসব ; তুই যেন ঘুমিয়ে পড়িস না।

গ্যারেজ থেকে তার টু-সিটার 'হিল্‌ম্যান' গাড়িখানা বের করে সুশান্ত বেরিয়ে পড়ল।

বাঁধের ব্রীজে ওঠবার মুখে গাড়ি থামিয়ে নামল সুশান্ত। গাড়ির হেড লাইট নিভিয়ে অন্ধকারে সতর্ক পায়ে এগিয়ে এসে দাঁড়াল ঠিক ব্রীজের মুখে—ভাঙা রেলিঙের কাছে। এইখানে—হ্যাঁ, ঠিক এইখান থেকেই অর্চনা গড়িয়ে পড়েছিল। নিচে তাকাল সুশান্ত—অন্ধকারে জলের গভীরতা বোঝা যায় না, স্রোতের সামান্য একটু শব্দ শোনা যাচ্ছে শুধু। এখান থেকে যদি সে গড়িয়ে পড়ে, জলে পড়বারই কথা ; কিন্তু যদি একটু সরে যায় কোনরকমে, তা হলে ঢালু জমি দিয়ে পাথর আর জংলা গাছের ঘসড়ানি খেতে খেতে সে নিচে মাঠের বুকে গিয়ে পড়বে। বাঁধের ব্রীজের ঠিক মুখেই কাণ্ডটা ঘটেছে। সুশান্ত কোনক্রমেই বুঝতে পারল না, জমি না জল—অর্চনা কোথায় গিয়ে পড়েছে শেষ পর্যন্ত। রেলিঙের একেবারে ধারে এসে সুশান্ত ঝুঁকে তাকিয়ে থাকল সেই অন্ধকারে জলের দিকে।

ইট'স এ ডায়লেমা!—অস্ফুট কণ্ঠে উচ্চারণ করলে সুশান্ত—কেমন একটা থমথমে গলায়। আর ঠিক সেই মুহূর্তে কে যেন পেছন থেকে বললে, জানতুম, তুমি এখানে আসবে।

সাপের ছোবল খাওয়ার মতন চমকে মুখ ফিরিয়ে তাকাতেই সুশান্ত দেখল, তার ঠিক কাঁধের কাছে গৌতম দাঁড়িয়ে রয়েছে।

তুমি!—সুশান্তর বুকের কাঁপুনির শব্দ বুঝি গৌতমও শুনতে পেল।

হ্যাঁ, আমি।

কি বলবে, সুশান্ত কিছুতেই ঠিক করে উঠতে পারল না। তার সমস্ত মাথা তখন ঝিমঝিম করছে, গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

গৌতম তার একটা হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে পাশে টেনে নিল,

আমায় এমনভাবে দেখবে, আশা করো নি, না? বড্ড ভয় পেয়ে গেছো।

গৌতম হাসল—সামান্য শব্দ করে। সে হাসি অন্ধকারে পুরোপুরি দেখা না গেলেও সুশান্ত আভাস পেল—গৌতম আজ যেন ঠিক অহিংস হাসি হাসছে না।

সুশান্ত চেষ্টা করতে লাগল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সহজ হতে। খানিকটা সময় কেটে গেল চুপচাপ—যেন বাতাসের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রয়েছে দুজনে। তারপর সুশান্ত নিজেকে সামলে নিয়ে বললে, আমি এখানে কেন এসেছি জানো?

জানি।

না; আত্মহত্যা করতে নয়।

কথাটা শোনা মাত্র গৌতম সশব্দে হেসে উঠল। প্রতিধ্বনিত হল সেই হাসি সেই উন্মুক্ত বাতাসের স্তরে স্তরে।

হাসছ।

তোমার কথা শুনে।

কেন?

ওই যে কি বললে— আত্মহত্যা না কি করবে যেন।

গৌতম থেমে থেমে হাসতে লাগল।

এতে হাসির কি আছে? অর্চনার মৃত্যুর পর আমার মনের অবস্থা কি, তা বোধ হয় তুমি জানো। এ অবস্থায় আমার পক্ষে আত্মহত্যা করতে আসাটা খুব বেশি অস্বাভাবিক কি?

অর্চনাকে হারাবার দুঃখ সইতে পারছ না—এরকম কোন কারণে আত্মহত্যা করতে তুমি আসো নি, আমি জানি।— গৌতম বললে।

মানে?

বুঝতে তো সমস্তই পারছ— গৌতম হঠাৎ ক্লান্ত সুরে বললে, এ লুকোচুরির আর দরকার কি।

গৌতম!—সুশান্ত হঠাৎ অত্যন্ত কঠিন সুরে বললে, তোমার

কথার ইঙ্গিত অত্যন্ত অস্পষ্ট।

না। অত্যন্ত স্পষ্ট।—গৌতম সুশান্তর চেয়ে কঠিন সুরে জবাব দিল।

এক মুহূর্ত দুজনে স্তব্ধ থেকে পরস্পরের দিকে চাইল। সে দৃষ্টি থেকে পরস্পর কি বুঝল, কে জানে। সুশান্ত বললে, তোমার সঙ্গে বৃথা তর্ক-বিতর্ক করার সময় আমার নেই। আর, এটা তার উপযুক্ত সময়ও নয়। আমি চললুম।

যাবার জন্যে পা বাড়াল সে।

গৌতম কঠিনভাবে সুশান্তর হাত চেপে ধরল। বললে, না, অত সহজে তোমার যাওয়া হতে পারে না। তা ছাড়া, ফিরে যাবার কথা আর না ভাবাই ভাল।

সুশান্ত চমকে উঠল গৌতমের কথায়, কি বলছ তুমি।

গলার স্বরে তার ভয় কেঁপে উঠেছে।

আমি যা বলছি, তার অনেক বেশি তুমি জান। আজ তোমায় সেইসব কথা বলতে হবে।

আমি কিছু জানি না। তুমি আমায় যেতে দাও।—সুশান্ত এতক্ষণ পর সহজ কণ্ঠে বললে—অন্তত তার কণ্ঠস্বরে তাই মনে হয়।

গৌতম সুশান্তর হাত ছাড়ল না। আরও জোরে চেপে ধরে ওকে ব্রীজের পাশে টেনে এনে দাঁড় করালো।

তুমি যদি না বল,—গৌতম বললে—আমায় প্রথম থেকে শুরু করতে হয়। আমি তাই করব। কিন্তু সবচেয়ে আগে একটা কথা মনে করিয়ে দিতে চাই তোমায়। আমার এই হাতটার দিকে তাকিয়ে দেখ। পালাবার বা অন্য কিছু করবার চেষ্টা না করলেই ভাল করবে।

সুশান্ত দেখল, গৌতম যদিও বাঁ হাত দিয়ে তার হাত চেপে ধরেছে, ডান হাতে তার একটা রিভলবার। সুশান্তর কাছে এত বড় অপ্রত্যাশিত ও আতঙ্কজনক কিছু হতে পারে না। ভয়ে, বিস্ময়ে

বোবা হয়ে গেল ও।

গৌতম তাকে একটু সময় দিয়ে বললে, আমার কথা শুরু করব?

কর।—খুব মৃদু অথচ ভাঙা সুরে বললে সুশান্ত অনেকক্ষণ পরে।

দু বছর আগের কথা। এ শহরে অত্যন্ত আকস্মিকভাবে একটি ছেলে এসে হাজির হয়। নাম তার গৌতম। প্রথমে তার আসার বিশেষ কোন একটা উদ্দেশ্য থাকলেও সে কথা তখন সে গোপন রেখেছিল। আজও রেখেছে। ছেলেটা হয়তো ভাল, কিংবা বলতে পারো—কয়েকটা তার ভাল গুণ ছিল, যার জন্যে খুব শিগগির এ শহরের যুবক-মহলে সে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারল। প্রথমে স্কুল-মাস্টারি, তারপর একটা চায়ের স্টল খুলে গৌতম এ শহরে নিজেকে জাঁকিয়ে তুলল। তার চায়ের স্টল—রাজনীতি, ফুটবল, থিয়েটার, দাঙ্গা—সবকিছুরই আলোচনার কেন্দ্র।

ক্রমেই গৌতমের প্রতিপত্তি বাড়ে—যদিও পয়সা বাড়ে না। এমন অবস্থা যখন, তখন অর্থাৎ তার আসার মাস ছয়েক পরে এ শহরে একটি মেয়ে এল। নাম তার অর্চনা। অর্চনা গার্লস স্কুলের অ্যাসিস্ট্যাণ্ট হেড মিস্ট্রেস হয়ে এলেও তার আসবার আসল উদ্দেশ্য কেউ জানল না। আজও কেউ জানে না। আমি জানি। বরং বলা ভাল—আমাদের উভয়ের আসল উদ্দেশ্য আমরাই জানতাম দুজনে, আর কেউ নয়। অবাক হচ্ছো? হ্যাঁ, অবাক হবারই মতন কথা!

অর্চনা এ শহরে আসার পর তুমি জানো, ধীরে ধীরে কেমন করে একটা ঘূর্ণি জেগে উঠল সারা শহরময়। অর্চনা শুধু অন্দর-মহলের প্রীতি লুঠে নেয় নি—পুরুষ-মহলেও ঝড় জাগিয়ে দিয়েছিল। তার যৌবনের উত্তাপ, তার হাসি, তার দুর্দমনীয় জীবনের আবেগে যারা চমকে উঠেছিল, তুমি—সুশান্ত—তাদের মধ্যে একজন। এ শহরে তুমি একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি। তোমার সুন্দর বাড়ি আছে, টাকা

আছে। আভিজাত্যের নিষ্কলুষ টীকা আছে। তা ছাড়া, সত্যি বলতে গেলে কি, সত্যিই তুমি একজন আর্টিস্ট। তুমি কালচার্ড, ভদ্র। এ বিষয়ে কোন সন্দেহও কেউ কখনও করত না—আজও করে না। ভেবো না যেন, আজ আমি তোমায় আক্রমণ করছি বর্বর বলে। আমি জানি, তুমি বর্বর কেন, তার চেয়েও অধম হয়েছ মনের শুধু একটা দরিদ্রতার জন্যে, ধৈর্যের অভাবে। সামান্য একটা ভুলের জন্যে যা করেছ, তার চেয়ে বড় অপরাধ মানুষের সমাজে আর কিছু হতে পারে না।

অপরাধ ?—সুশান্ত অবাক সুরে বলল।

হ্যাঁ, তাই।—গৌতম বলে চলল, অর্চনার সঙ্গে আলাপ হবার পর তুমি তার ওপর ক্রমশই আকৃষ্ট হতে লাগলে। নানাভাবে সে তোমার মনে স্থান করে নিল। আর একদিন স্পষ্টই তুমি বুঝতে পারলে, অর্চনাকে শুধু তুমি ভালবাসো নি—বড় বেশি ভালবেসে ফেলেছ। তার ওপর তোমার দাবী তাই সবার চেয়ে বেশি। একটা কথা কি জানো সুশান্ত—যদি তুমি তোমার মনের এ অবস্থার কথা কোনরকমে একবার মুখ ফুটে অর্চনাকে বলতে পারতে, তা হলে হয়তো ভাল হত। তা তুমি বল নি। বলবার সাহস খুঁজে পাও নি। তাই অর্চনার সামনাসামনি তোমার ব্যবহার অত্যন্ত ভদ্র হলেও আড়ালে তুমি তার গতিবিধির ওপর কড়া নজর রাখতে। সে কোথায় যায়, কি করে, কার সঙ্গে বেশি মেশে—এমন কি, যদি বলি তুমি তার অতীত জীবনের কথাও জানবার জন্যে ক্ষেপে উঠেছিলে, তা হলেও তোমার বলবার কথা থাকে না। অর্চনার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা এ শহরের আর কারুর চোখে পড়বার কথা নয়, পড়েও নি —একমাত্র ব্যতিক্রম তুমি। তুমি আমার আর অর্চনার ঘনিষ্ঠতা আড়াল থেকে লক্ষ্য করলে এবং সেই থেকে জঘন্যরকম হিংসে পোষণ করতে লাগলে আমার বিরুদ্ধে।

গৌতম এখানে কিছুক্ষণ থামল—যেন কি স্মরণ করে নিল।

সুশান্ত আগের মতনই নির্জীব, নিস্তব্ধ।

আমায় তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী—আই মিন প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বী ভেবে নেবার অবশ্য প্রচুর কারণ ছিল। তবু আমি বলব, আমি তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলাম না। অর্চনার মন রাখবার জন্যে তুমি আমারও সামনাসামনি কোনদিন কিছু বলতে পারো নি। ফলে, আমি সে দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তোমার ওপর আব্দার করেছি অনেক। আমি জানতুম সুশান্ত, তুমি সে-সমস্ত আব্দারকে অত্যাচার হিসেবেই গ্রহণ করতে। তবু আমি তা কোনদিন গ্রাহ্য করি নি। করি নি—কারণ, তোমার কাছে যে টাকা নিতুম, সে টাকার ওপর আমারও অধিকার ছিল।

গৌতম এক মুহূর্ত থেমে যেন ভীষণ জরুরী একটা কথা মনে করে নিল। বললে, অর্চনাকে আমি আটকাতে পারতুম না, সুশান্ত। শেষ পর্যন্ত তুমিই তাকে জয় করে নিতে। কেন যে তোমার মতিভ্রম হল, আমি ভেবে পাই না, সুশান্ত। কোন মেয়েকে কি জোর করে নিজের করে নেওয়া যায়? না, কেউ তা নিতে পেরেছে? তুমি এত বুদ্ধিমান হয়েও সে কথা বুঝতে পারলে না। তুমি চিত্রশিল্পী—তোমার রুচি আছে, অনুভূতি আছে, সহানুভূতিও আছে—তবু তুমি শেষ পর্যন্ত পশু হয়ে গেলে। আমার ওপর হিংসে তোমার দিন দিন বেড়ে অবশেষে এমন একটা অবস্থায় দাঁড়াল, যখন আমায় এ পৃথিবী থেকে সরিয়ে না দিতে পারলে তোমার আর চলছিল না! সে চেষ্টা তো তুমি করেছ!

সুশান্ত বাধা দিতে গেল।

গৌতম সে বাধা গ্রাহ্য না করে বলে চলল, অর্চনা যদি বাধা না দিত, এক বসন্তের সকালে আমারই ঘরের বিছানায় আমার মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা যেত। সে মৃত্যু হত অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং সহজভাবে। কেউ সামান্য মাত্র সন্দেহ করত না—তুমি সুশান্ত, শহরের একজন সেরা ভদ্রসন্তান, আসলে একজন খুনী। বাস্তবিক

সুশান্ত, আমার সৌভাগ্য আর তোমার দুর্ভাগ্য—আমার রোগশয্যার পাশে তুমি যখন বন্ধুকে সেবা করবার অজুহাতে বসেছিলে, আর সুযোগ খুঁজছিলে কোন্ ফাঁকে ওষুধের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে দেবার, তখন অর্চনা হঠাৎ ঘরে ঢুকে তোমায় তাড়াতাড়ি একবার বাইরে আসতে বলে। তোমার হাতে তখন যে বিষ-মেশানো পাউডারটা ছিল, তা মাটিতে পড়ে যায়। অত্যন্ত নার্ভাস হয়ে পড়ায় এমনটা হয়েছিল। আরও মজা, হাত থেকে যা পড়ে গেল, তা কুড়িয়ে নেবার সাহসও তোমার হল না তখন! তুমি বাইরে বেরিয়ে গেলে। মুখ-চোখ ভয়ে-ভাবনায় তখন তোমার বিবর্ণ—বিশ্রী হয়ে গেছে। আমি তা লক্ষ্য করেছিলুম। আরও লক্ষ্য করেছিলুম তোমার হাত থেকে পড়ে-যাওয়া সেই পাউডারের পুরিয়াটা। তুমি চলে যাবার পর আমার কেমন যেন সন্দেহ হল। মাটি থেকে পুরিয়াটা কুড়িয়ে নিলাম। রাখলাম আমার বালিশের তলায় লুকিয়ে। মিট-সেফে আমার আসল ওষুধের পুরিয়াগুলো ছিল। দেখলুম, সেগুলো প্রত্যেকটা হলদে রঙের কাগজে মোড়া—তোমারটা ছিল সাদা। যাক, আমি তাড়াতাড়ি একটা সাদা কাগজে আমার ওষুধ ঢেলে আবার তা মাটিতে ফেলে রাখলাম। খানিক পরে তোমরা যখন ঘরে এলে, আমি নিজে থেকেই বললুম, কি সুশান্ত, ওষুধ খাওয়াতে খাওয়াতে যে উধাও হলে! দাও পাউডারটা, পেটে আবার পেনটা বেড়েছে···তুমি আগের মত নার্ভাস অবস্থাতেই একবার কি যেন ভেবে অর্চনাকে ওষুধ দিতে বললে। তারপর তোমার মনে আছে, তুমি কি করলে?

সুশান্ত চুপ করে থাকল—কোন উত্তর দিল না।

তুমি প্রথমে যেন অজান্তেই জুতো দিয়ে মেঝের ওপর পড়ে-থাকা পুরিয়াটা মাড়ালে। তারপর অত্যন্ত সচকিত হয়ে সেটা তুলে নিয়ে জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলে। জুতো সমেত মাড়িয়ে ফেলেছ, তাই ওটা আর খাওয়া উচিত নয়—এইরকম একটা কথা বলে সেই

পুরিয়াটা জানলা দিয়ে বাইরে ফেলে দিলে। বাস্তবিক সুশান্ত, তোমার তখনকার উপস্থিত-বুদ্ধি প্রশংসনীয়।

গৌতম আবার থামল খানিকক্ষণের জন্যে।

রাত গভীর হয়ে উঠেছে। আকাশের বুকে মেঘ জমছে একটু একটু করে। হারিয়ে যাচ্ছে তারার আলো। ঘন হয়ে উঠছে অন্ধকার—কালো মিশমিশে অন্ধকার। একটানা হাওয়ার শব্দ, আর নিচে থেকে স্রোত বয়ে যাওয়ার ক্ষীণ শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনা যায় না। সুশান্ত যেন পাথর হয়ে গেছে। তার মুখ দিয়ে একটা কথা বেরোয় না—সামান্য একটা শব্দও। শুধু কখনও কখনও দীর্ঘ-নিশ্বাসের একটা সাপ-চলার মত শব্দ গৌতমের কানে বাজে।

সেদিন থেকেই—গৌতম বললে, সেদিন থেকেই আমি তোমায় সন্দেহ করতে শুরু করি, সুশান্ত। সে পাউডারের পুরিয়াটা আমি পরে পরীক্ষা করাই। তার মধ্যে কাচের গুঁড়োর সঙ্গে মেশানো ছিল নিকোটিন।...যাক, অর্চনাকে সে বিষয়ের বিন্দুবিসর্গ জানাই নি। জানালে যে কী ভীষণ আঘাত পেত সে, তা শুধু আমিই জানি। এ ঘটনার পর আমি স্পষ্টই বুঝলাম—আমি যদি অর্চনার কাছ থেকে না চলে যাই, তোমার জীবনের বাঁকা পথ আর কোনদিন সোজা হবে না। বিশ্বাস কর, সুশান্ত—আমি এ ঘটনার পর আবার শহর ছেড়ে উধাও হয়ে যেতেই চেয়েছিলাম। আরও চেয়েছিলাম, অর্চনা যেন আমায় অন্তত ভুল বুঝেও তোমার ঘরে গিয়ে আশ্রয় নেয়। তাকে আশ্রয় দেবার জন্যেই একদিন এ শহরে এসেছিলুম। কিন্তু যখন বুঝলাম, আমার দেওয়া আশ্রয় না হলেও তার কপালে আরও ভাল আশ্রয় জুটবে, তখন নিজেকে সরিয়ে নেওয়া ছাড়া অন্য পথ কি খোলা থাকতে পারে?

গৌতম আবার থামল, বলল, একটা সিগারেট খাওয়াবে?

সুশান্ত সিগারেট দিল। সিগারেট জ্বালাবার সময় যেটুকু আলো জ্বলল, সেইটুকু আলোতেই গৌতম দেখল, সুশান্ত একচাপ বরফের

মত সাদা দাঁড়িয়ে রয়েছে।

শোন।—গৌতম বলে চলল। তার হাতের সিগারেটের আগুন জ্বলতে লাগল জোনাকির মতন—কুন্তলাকে চেনো? এ শহরের সেরা ফ্লার্ট। তাকে গিয়ে পাকড়াও করলাম। কুন্তলা আমার কাছে নানা ভাবে উপকৃত। কুন্তলাকে বললাম, আমার সঙ্গে তাকে কিছুদিন ফ্লার্ট করতে হবে। কেন, তা বলি নি। শুধু বলেছিলাম, না করলে তাকে বিপদে ফেলব। কুন্তলা রাজী হল। অর্চনার চোখের সামনে কুন্তলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়ালাম একটু একটু করে—যেন অর্চনা অহেতুক অন্য কোন সন্দেহ না করে বসে। কুন্তলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা যখন গভীর হল, অর্চনা আমায় বললে, আমি কেন জেনে-শুনে অমন ধরণের একটা মেয়ের সঙ্গে নিজেকে জড়াচ্ছি! আমি বললুম, কুন্তলা বাইরে যা, ভেতরে তা নয়। অর্চনা আমার ইঙ্গিতটা ঠিক বুঝতে না পেরে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকল। আমি তার সেই বিস্ময়-বোধের সুযোগ নিয়ে বললুম, দেখ অর্চনা, সুশান্তকে ছেড়ে আমার ঘরে তুমি আসবে, এ বিশ্বাস আমি আর করি না। কুন্তলাই আমার ভাল—তাকে সঙ্গে করে আজ রাত্রেই আমি এখান থেকে চলে যাব। …আমার কথায় অর্চনা আঘাত পেল—গভীর আঘাত। কান্নাকাটি করলে। বললে, আমি যেন তাকে ভুল বুঝে না চলে যাই। সে এ শহরে আমার জন্যেই এসেছিল, আমার সাহায্যেই তার অতীত-জীবন গড়ে উঠেছে। প্রয়োজন হলে সে সব কিছুর বিনিময়ে আমার জন্যেই তার বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে আমার হাতে তুলে দেবে। অর্চনা তা দিত, আমি জানতাম। কিন্তু সুশান্ত, যাকে আমি ভালবাসি, তাকে অমন ভাবে গ্রহণ করতে আমার সত্যিই খুব আপত্তি ছিল। আশ্চর্য মানুষের মন! অর্চনা আমায় শ্রদ্ধা করত, ভালবাসত। এ শহরে সে আসে আমারই জন্যে—একসময় আমার ঘরেই আশ্রয় নেবে বলে। কিন্তু কি করে আমি তোমায় বোঝাই, আমার ওপর তার শ্রদ্ধা থাকলেও সে ভালবাসা আর ছিল না—যাকে আমরা

বিয়ে করে সংসার পাততে পারি। অর্চনা নিজেও তা বুঝেছিল। আর পাছে আমিও তা বুঝতে পারি, তাই আমার সঙ্গে তার ব্যবহারে, কথাবার্তায় সব সময়ে নিজের নতুন-মনকে চাপা দিতে চাইত। যেন আগের মতই সে আমায় ভালবাসে—বরং আরও বেশি। তুমি যেন তার কাছে তেমন কিছু নও।...

অর্চনার কান্নাকাটি দেখে আমি আমার কর্তব্য ভুলি নি। তাই তাকে বললুম, সে যদি সত্যিই আজও আমায় আগের মত ভালবাসে, তাহলে যেন আজই রাত্রে বাঁধের ব্রীজ শেষ হয়ে যেখানে তেঁতুল-গাছটা নুয়ে রয়েছে, সেখানে একটা পাথরের ওপর বসে অপেক্ষা করে রাত দশটা থেকে এগারোটা পর্যন্ত।

আমি জানতুম অর্চনা যাবেই। আর গিয়ে দেখবে, যদিও আমি একলা সেই পাথরের ওপর বসে রয়েছি, তবু একটু আড়ালে রয়েছে বিস্রস্তবাসা কুন্তলা। অর্চনা যখন আমার সঙ্গে কথা বলবে, আমি তখন নেশায় বিহ্বল এবং তার হাত ধরে আবার সেই পুরোন দিনের মতন প্রেম নিবেদন করব। ইতোমধ্যে আড়ালে ফুঁপিয়ে উঠবে কুন্তলা। অর্চনা প্রথমে ভয় পাবে; তারপর অবাক হবে। সবশেষে কৌতূহল বশে যখন দেখতে যাবে, তখন বুঝবে, কুন্তলার সান্নিধ্যে আমি এতক্ষণ মেতে ছিলাম—অর্চনার সাড়া পেয়ে তাকে সরিয়ে দিয়েছি। বুঝতেই পারছ, অর্চনার মনের ভাব তখন কি রকম হবে? হয়তো নয়, সেই হবে তার আমার মধ্যে শেষ সাক্ষাৎ—ইহজীবনের মত শেষ চাওয়া-চাওয়ি।...

অর্চনা রাত্রে যেতে রাজী হল।...হ্যাঁ, ইতোমধ্যে কেমন করে না জানি, তুমি জানতে পেরেছিলে, অর্চনা আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে রাত্রে।...না, ঠিক হল না কথাটা। তুমি অনুমান করেছিলে, অর্চনা সেইদিন রাত্রেই আমার সঙ্গে এ শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছে। তোমার এ অনুমান এতদিনকার রুদ্ধ আক্রোশকে ভয়ঙ্কর করে তুলল। অর্চনা যখন একান্তই তোমার হল না, সে আর কারুর

হবে না—হতে পারবে না। কি অদ্ভুত তোমার এই ভালবাসা, সুশান্ত! তোমার ভালবাসা অস্থির, উত্তপ্ত, বর্বর। সে শুধু চাইতে জানে—সে যা নিজের বলে মনে করে, তার ওপর হয় তার অধিকার প্রতিষ্ঠা করবে, না-হয় নিশ্চিহ্ন করে দেবে সব। বর্বর ছাড়া এ ভালবাসাকে আমি কিই-বা বলতে পারি!

যাক, শোন। অর্চনাকে তো আমি আসতে বললুম। কিন্তু যে পরিকল্পনা আগে করেছিলুম, তা যেন অত্যন্ত নীচ বলে মনে হল শেষে। এরকম প্রতারণা—জঘন্য অভিনয় করে অর্চনার কাছে বিদায় নিতে বাধল। আমার স্মৃতি বলতে সারা জীবন তার শুধু অশ্রদ্ধাই থাকবে, এ কল্পনা আমায় পাগল করে তুলল। না, যা তাকে বলেছি, তা হয় না—হতে পারে না। চলে আমি নিশ্চয়ই যাব ; কিন্তু খোলাখুলি অর্চনাকে বুঝিয়ে দিয়ে তার পর। তাই সেই রাত্রে অর্চনা যখন তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসে ফিরে সোজা পথ ধরল, আমি তার পিছু নিলাম। বাঁধের ব্রীজের মুখে ডাকলুম তাকে—তার নাম ধরে। তারপর ঠিক এইখানে—এইখানে, যেখানে আজ তুমি আর আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি, ঠিক এইখানে আমি আর অর্চনা দাঁড়ালুম। সেদিন কিন্তু আজকের মত আকাশ ভরে অন্ধকারের কালি ঢালা ছিল না। সেদিন ছিল চাঁদের আলোর বান। ধবধবে আলোর সমস্ত বাঁধ, মাঠ, ব্রীজ, দূরের ওই মল্লারবাগের শিবমন্দির ঝকঝক করছিল। কি সুন্দর সেই রাত, তা তুমি অনুভব করতে পারবে না!

আমরা এখানে দাঁড়ালুম। নির্জন, শান্ত, স্তব্ধ এই ব্রীজের ওপর অর্চনার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ আমার মনে পড়ল, তার জন্যে আনা বাসন্তী রঙের চন্দ্রমল্লিকার কথা। আশ্চর্য, অতীতে একদিন ওই বাসন্তী রঙের চন্দ্রমল্লিকাকে কেন্দ্র করেই তার সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হয়। আজ যাবার দিন ওর জন্যে তাই এনেছিলুম, ওর অতি প্রিয় আমাদের প্রথম পরিচয়ের সেই।

ফুলটিকে। বাসন্তী রঙের চন্দ্রমল্লিকা দিলাম তার হাতে। সে নীরবে হেসে ফুলের বুকে মৃদু চুম্বন ছোঁয়াল।...

তারপর—তারপর আমি অর্চনার একটি হাত ধরে বলে গেলাম সব। এ শহরে আমি যার জন্যে এসেছিলাম, আজ সে উদ্দেশ্য আর নেই। হ্যাঁ, ভাল কথা—কি উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিলাম, সে কথাটা আজ তোমার জেনে রাখা উচিত। আমার মার মৃত্যুশয্যায় আমি শপথ গ্রহণ করেছিলাম: যে লম্পট ভদ্রলোকটি তাঁকে সংসার থেকে পথে এনে একটি সন্তান উপহার দিয়ে উধাও হয়ে গিয়েছিলেন আজীবনের মতন—আমি তার প্রতিশোধ নেব। আমার মা এ শহরেরই মেয়ে। সতেরো বছর বয়সে তিনি নিঃসন্তান অবস্থায় বিধবা হন। তিনি ছিলেন শিক্ষিতা এবং সংস্কারবর্জিতা। তাই এই শহরেরই আর একজন গণ্যমান্য, বিদ্বান, বুদ্ধিমান অর্থশালী ভদ্রলোক যখন মাকে আমার লোভ দেখালেন, তাঁকে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে বিধবা-বিয়ে করবেন—মা পরিপূর্ণ বিশ্বাসে তাঁর সঙ্গে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন। এখানে একটু অসুবিধে ছিল—ভদ্রলোকের বাবা-মা বর্তমান এবং তাঁরা বিধবা-বিয়েতে রাজী হবেন না, এ কথাই ভদ্রলোক মাকে বুঝিয়েছিলেন। কিন্তু একবার বাইরে গিয়ে যদি বিয়েটা হয়ে যায়, পরে একমাত্র সন্তানের হঠকারিতাকে তাঁরা গ্রহণ করবেন—এ ভরসা ভদ্রলোক দিয়েছিলেন। মা বেশির ভাগ মেয়ের মত সরল বিশ্বাসে ঘর ছাড়লেন গোপনে। কিন্তু পরে বুঝলেন, তিনি ভুল—এমন ভুল করেছেন, যার আর সংশোধনের উপায় নেই। কঠিন দারিদ্র্যের মধ্যে অভিশাপ সম্বল করে আমার জন্ম হল।

বেড়ে উঠলাম ধীরে ধীরে।...

মা কোনরকমে একটু ভদ্রসমাজে আশ্রয় নিলেন নাম বদলে সমস্ত গোপন করে। আমি বিদ্যাশিক্ষা পেলাম, পেলাম মার অকৃপণ স্নেহ। তারপর এল অর্চনা। মা যখন মারা গেলেন, তখন আমায় বলে গেলেন সব কথা। আর আমিও শপথ করলাম, এ বর্বরতার

প্রতিশোধ আমি নেবই।

এলাম এ শহরে। দেখলাম, সে ভদ্রলোক অনেকদিন হল মারা গেছেন। তাঁদের বাড়িতে একটি মাত্র বংশধর জীবিত—ভদ্রলোকের একটি মাত্র সমাজ-স্বীকৃত সন্তান। তা হোক, আর কিছু না পারি, সেই সমাজ-স্বীকৃত সন্তানটিকে যেমন করে হোক জীবনের সর্বদিক দিয়ে বঞ্চিত করে যেতে হবে—এই হল আমার উদ্দেশ্য। ডেকে পাঠালাম অর্চনাকে। অর্চনার সঙ্গে আমার কথা ছিল—যতদিন না মার মৃত্যুশয্যায় গ্রহণ-করা শপথ আমি পালন করি, ততদিন আমরা পরস্পরকে বিয়ে করব না। অর্চনাকে আনলাম এ শহরে, কেননা, অর্চনাকে চোখের সামনে না রাখলে আমি হয়তো পশুর চেয়েও হীনতম কিছু করতে পারি প্রতিশোধ নেবার জন্যে। তা ছাড়া, প্রতিশোধ নেবার ব্যাপারে অর্চনারও সাহায্য আবশ্যক হয়ে পড়েছিল।...

দিন কেটে যায়। ক্রমশই আমি আমার শপথ ভুলতে বসি। ভাবি, অপরাধ করল একজন—তার জন্যে অপরজনকে শাস্তি দিই কোন অধিকারে। অর্চনাও শেষে সেই কথা বলতে লাগল। তা ছাড়া, অর্চনা যে তাকে—

গৌতম মুখের পিছলে-যাওয়া কথাটা আটকে নিল। একটু থেমে বলল, হ্যাঁ, যা বলছিলাম। সেই চাঁদের আলো-ভরা রাত্রে এই ঠিক এমনি মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অর্চনাকে আবার সব বললাম, বুঝোলাম। অর্চনাও বুঝল, আমাকে ছেড়ে দেওয়া ছাড়া তার অন্য কোন পথ নেই। অর্চনা বুদ্ধিমতী—সে আমায় বিদায় দিল। আমি চোখের জল মুছিয়ে সেই বাসন্তী রঙের চন্দ্রমল্লিকার যেখানে অর্চনা তার চুম্বনের স্পর্শ রেখেছে, সেখানে নিজের প্রথম ও শেষ চুম্বনের স্পর্শ দিয়ে বিদায় নিলাম। অর্চনা বাসন্তী রঙের চন্দ্রমল্লিকা সম্বল করে দাঁড়িয়ে থাকল। তারপর—

গৌতম অকস্মাৎ থেমে গেল।

কি তারপর ?—সুশান্ত এতক্ষণ বাদে যেন ঘুম থেকে জেগে উঠে প্রশ্ন করল।

তারপর যা, তা তুমি জানো, আমি জানি না।—গৌতম বললে।

আমি ? না, না—আমি কিছু জানি না।—সুশান্তর স্বরে আর্ত্ততা।

আর কেন, সুশান্ত! আমি জানি—ভাল করেই জানি, তারপর কি করে তুমি অর্চনাকে হত্যা করলে, তা তুমি বলবে।

আমি অর্চনাকে হত্যা করেছি ?

সুশান্ত!—গৌতমের স্বরের কঠিনতা সুশান্তকে বিচলিত করলে।

সুশান্ত বললে, অনেক পরে : আমি অর্চনাকে খুন করেছি, তার প্রমাণ কই ?

তুমি আরও প্রমাণ চাও ? ভেবে দেখ, কে গত সপ্তাহে অর্চনাকে পথে দেখে মেতে ওঠে, আর আজকেও তো তাকে দেখে পিছু ধাওয়া করেছিলে!

সুশান্ত চমকে উঠল। ভীত গলায় বললে, তুমি কি করে জানলে ?

আমি জানব না তো কে জানবে ?—গৌতম হাসল, আমি শুধু সন্দেহই তোমায় করি নি, সুশান্ত—সন্দেহকে সত্য প্রমাণিত করবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেছি।

সুশান্ত এবার খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, অর্চনা বেঁচে আছে ?

—না।

তাহলে তোমার প্রমাণ কই ? আজ আমায় হাতের মুঠোয় পেয়ে তুমি যা খুশি করতে পারো, গৌতম। কিন্তু তোমার মন-গড়া সন্দেহের বশে আমায় খুনী বলে ঠাওরানো কি ঠিক হবে ?—সুশান্ত খুব সংযত গলায় বললে।

আমাকে যখন বিষ দিয়ে মারবার চেষ্টা কর, গৌতম বললে, তার

সব প্রমাণই আছে। আর অর্চনাকে যে তুমি হত্যা করেছ, তার সবার বড় প্রমাণ পুলিশের লোকের কাছে তুমি যে বিবৃতি দিয়েছ, তাতে বলেছ, অর্চনাকে তুমি শেষ দেখ তোমার বাড়িতে—রাত প্রায় সাড়ে ন'টা নাগাদ। কিন্তু তুমি হয়তো জানো না, সুশান্ত—আমি সেদিন সন্ধ্যে থেকে সর্বক্ষণ অর্চনার পিছু ধাওয়া করেছি। সে যখন তোমার সঙ্গে দেখা করতে যায়, তুমি তার সঙ্গে দেখা কর নি। বারান্দায় উঠেই অর্চনা তোমার চাকরের সঙ্গে কথা বলে নেমে আসে। তোমার চাকর তাকে জানায়, তুমি ভীষণ অসুস্থ—কারুর সঙ্গে দেখা করবে না; নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করে শুয়ে আছো।

'বেশ, তাই হল, তাতে কি? আমি জানলা দিয়ে দেখেছি অর্চনাকে!

সে কথা তো তুমি বল নি, পুলিশের কাছে! তুমি বলেছ, তুমি তাকে তোমার বাড়িতে দেখেছ। সে সময়ে তার গায়ে ছিল একটা কমলালেবু রঙের শাড়ি, আর হাতে ছিল একটা বাসন্তী রঙের চন্দ্রমল্লিকা। বল নি সে কথা!

হ্যাঁ, বলেছি।

কিন্তু তুমি জানো, সুশান্ত—অর্চনাকে তুমি দেখ নি; অথচ তাকে দেখেছ, এ কথা না বললেও তোমার চলে না। কারণ, তুমি সব সময় এটুকু প্রমাণ রাখতে চাও যে, তোমার দেখার পরও অর্চনাকে জীবিত অবস্থায় আর কেউ দেখেছে। আমি তাকে তোমার পরে দেখেছি এবং ফুল সমেত দেখেছি—এ কথা পুলিশের কাছে আমিও বলেছি। এর থেকে অন্তত এটুকু প্রমাণিত হবে, তোমার দেখার পর তবে আমি অর্চনাকে দেখেছি এবং অর্চনা জীবিত ছিল। নয় কি?

নিশ্চয়ই!—সুশান্ত জোর দিয়ে কথা বললে।

আমিও তাই বলি। তবে কি জানো, তোমার এই একটি মাত্র কথা থেকেই আমি বুঝতে পারি, অর্চনাকে আমি দেখে আসার পর

তোমার সঙ্গে নিশ্চয়ই তার দেখা হয়েছে! না হলে যে বাসন্তী রঙের চন্দ্রমল্লিকা আমি দিয়ে এলাম অর্চনাকে বিদায় জানাবার সময়, তুমি সে ফুল কি করে আগে থাকতেই দেখলে তার হাতে ?

সুশান্ত যেন অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে একটা বৈদ্যুতিক শক্ খেলে। তার বিহ্বল আর্তস্বর শোনা গেল।

খানিক অপেক্ষা করে গৌতম বললে, আর দেরি করো না। যা তোমার বলবার আছে, বল। মরার আগে কনফেসন করার গৌরব বাদ দিয়ে আর লাভ কি!

সুশান্তকে অন্ধকারে পরিষ্কার দেখা না গেলেও গৌতম বুঝল, সুশান্ত নিজেকে তৈরি করে নিচ্ছে।

অনেক—অনেক পরে সুশান্ত বললে, স্বীকার করলাম। বেশি কিছু আমার বলবার নেই। যতটুকু বলবার আছে, তা এখানে নয়—গাড়িতে বসেই বলব।

মানে ?

আমি ওই গাড়িতেই অর্চনাকে খুন করি। ওর মধ্যে গিয়ে না বসলে সে কথা তোমায় বোঝাতে পারব না।

সুশান্তর কথায় গৌতম কি যেন ভাবল খানিকটা, তারপর বলল, বেশ, চল।

একটু হেঁটে ব্রীজের গোড়ায় গাড়িতে এসে বসল সুশান্ত আর গৌতম। সুশান্ত স্টিয়ারিংএ হাত রাখল। পাশে বসে থাকল গৌতম।

বল।—গৌতম তাগাদা দিল।

বলছি।—সুশান্ত এক মুহূর্ত কি যেন ভেবে নিয়ে বলল, একটা কথা বলব—বিশ্বাস করবে ?

কি ?

আমার ভীষণ ভয় করছে। গাড়িটায় স্টার্ট দিয়ে রাখব। তবু খানিকটা শব্দ হবে। না—না, বিশ্বাস করো, যদি ব্রীজের ওপারে

গাড়ি এগিয়ে যায়, তুমি আমায় গুলি কোরো। তাতে তো তোমায় কেউ বাধা দেবে না।—সুশান্ত মিনতি জানাল।

বেশ।—রাজী হল গৌতম।

গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে তা মৃদু করে সুশান্ত বললে, তুমি যা বলেছ, সবই ঠিক। অর্চনাকে আমি ভালবাসতাম। সে ভালবাসা তীব্র—তোমার ভাষায়, বর্বর। তাই তাকে যখন পেলাম না, ভাবলাম নাই যখন পেলাম, তখন তুমিও যাতে তাকে না পাও, সে ব্যবস্থা আমি করব। সেদিন রাত্রে তোমরা পালিয়ে যাবে সন্দেহ হওয়ায় অর্চনাকে রাস্তার মধ্যে আটক করে মারবার ফন্দি করি। উল্টো রাস্তা দিয়ে মোটর নিয়ে এসে আমি অপেক্ষা করছিলাম। তোমার সঙ্গে অর্চনার দেখা হবার পর তুমি ফিরে গেছ, তা আমি জানতুম না। আমি ভেবেছিলাম, অর্চনা বুঝি ওখানে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। অর্চনা একলা দাঁড়িয়েছিল। আমি গিয়ে তাকে ডাকতেই সে শিউরে উঠল। দেখলাম তার হাতে সেই চন্দ্রমল্লিকা—ঠোঁটের কাছে ধরে সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। তাকে টেনে আনলাম এই গাড়িতে। তারপর বালিশ চেপে ধরলাম তার মুখে—যতক্ষণ না দমবন্ধ হয়ে অর্চনা নেতিয়ে পড়ল, নিস্পন্দ হয়ে গেল। তারপর আর কি! তার দেহটা টেনে এনে ছুঁড়ে দিলাম জলে।

সুশান্ত সহজভাবে তার কথা শেষ করল।

এর পর দুজনেই নিস্তব্ধ—দুজনে দুজনের মনকে ভাবছে।

অনেকক্ষণ পরে গৌতম বললে, অর্চনাকে হত্যা করার জন্যে তুমি অনুতপ্ত নও?

খুব বেশি। মাঝে মাঝে ভাবি, এ কাজ না করে আমি যদি নিজে আত্মহত্যা করতুম—ভাল হত।

হয়তো সত্যিই তাই ভাল হত।—গৌতম বললে।

সুশান্ত সে কথার জবাব না দিয়ে হঠাৎ বললে, তোমার সেই অমানুষ বাবার নামটা কি, বললে না তো?

জেনে লাভ ?—গৌতম ক্লান্ত সুরে বলল।

লোকসানই বা কি! সব লাভ-লোকসানের পালাই তো আজ আমরা চুকিয়ে দেব! বল—তোমার সেই অমানুষ বাবার নামটা বল।—সুশান্ত বললে।

স্টার্টের শব্দ একটু দ্রুত আর জোর হল।

একান্তই জানতে চাও ?

হ্যাঁ।

অতুলপ্রসাদ মিত্র।

সুশান্ত নাম শুনে একটুও চমকাল না—যেন এটাই সে আশা করছিল। বললে, ব্যাপারটা অস্পষ্ট আভাসে আমি শুনেছি আগে; কিন্তু তুমি যে আমার সেই লম্পট বাবার ছেলে, তা জানতাম না—জানলুম। তোমার মাকে আমি দেখি নি—তাঁর কাছে আজ বাবার হয়ে আমি ক্ষমা চাইছি, তোমার কাছেও।

সুশান্ত গাড়ির স্টার্ট আরও একটু বাড়িয়ে দিল। বললে, জীবনে আমাদের আর কিছু চাইবার আছে, গৌতম ?

না।—ভাঙা সুরে গৌতম বললে।

চল, তাহলে একটু ঘুরে আসি।

কোথায় ?

এই তো, এখানে—

সুশান্ত তার কথা শেষ করল না। ধীরে ধীরে কখন ক্লাচ টিপে গিয়ার খুলে দিয়েছে। একটা ঝাঁকুনি খেয়ে গাড়িটা বিদ্যুৎ-গতিতে এগিয়ে গেল।

সুশান্তর মুখ দেখতে না পেলেও গৌতম একটা হাত রাখল সুশান্তর গলায়।

সুশান্ত স্টিয়ারিংটা বেঁকিয়ে দিল। চোখের পলকে ব্রীজের কাঠের রেলিং ভেঙে টু-সিটার গাড়িখানা নিচে বাঁধের জলে ছিটকে পড়ল। *

* পুনর্মুদ্রণ

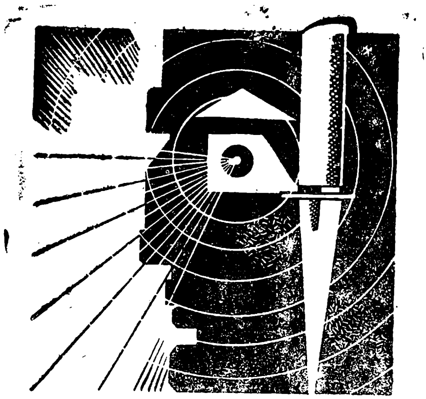

ইচ্ছাপূরণ

শোভন সোম

জীবনের একটানা চল্লিশটি বছর শান্ত প্রায় নির্বিরোধ এবং অনুগত ভাবে কাটিয়ে সুবীরচন্দ্র সরকার নামক রাম শ্যাম যদু গোষ্ঠীর ব্যক্তিটি একচল্লিশ বছরে পা দিয়ে এক নতুন ঘরে প্রবেশ করল। লোকে সেই ঘরকে শ্রীঘর বলে থাকে।

ঝিমন্ত শহরটা হঠাৎ একদিন গা ঝাড়া দিয়ে জেগে উঠেই আকাশে মোটা মোটা চিমনির আঙুল উঁচিয়ে বলল, দেখ, আমায় দেখ। দেখতে দেখতে শহরটার পরিসরে গাড়লের মত যে সব চৌকো আয়তাকার আর বেহিসেবি জমি পড়েছিল—সব উদ্ধত বাড়ির চাপে পড়ে পড়ে মরে যেতে লাগল। প্রকৃতি মানুষের তাড়া খেয়ে সেই শহর থেকে পালিয়ে বাঁচল। ঝকঝকে গাড়ি, চকচকে দোকান আর রঙচঙে মানুষ সেই শহরের জৌলুষ আর মর্যাদা বাড়িয়ে তুলল। শহরটা যেন প্রাক ইতিহাসের থেকে এক লাফে ডিঙিয়ে আধুনিকতম যুগের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে আরম্ভ করল। আর

পেছন ফেরা নেই।

সেও ছ'সাত বছর আগের কথা। সে বছরই সুবীরচন্দ্র মৃণালিনীকে বিয়ে করেছিল। আর পাঁচ-দশটা সাধারণ মেয়ের থেকে মৃণালিনী কোন অংশেই ব্যতিক্রম ছিল না। অতি আট-পৌরে, সাজে, চেহারায় ছিল মৃণালিনী। কিন্তু যাদুকর শহরের সম্মোহন এতই প্রবল যে নগণ্যা মানবী মৃণালিনীর সাধ্য কি তাকে ঠেকায়। মৃণালিনী প্রথমেই ছাঁটল নাম, হল মীনু। তারপর ছাঁটল চুল। ছেঁটে ফেলল ব্লাউজের হাতা, পিঠ গলা আর কোমরের ঘের। সব ছেঁটেছুটে গুটিপোকা মৃণালিনীর ভেতর থেকে বেরিয়ে এল প্রজাপতি মীনু।

তারও আঠারো বছর আগে চাকরিতে ঢুকেছিল সুবীরচন্দ্র। তখন সে ষোলো বছরের ছেলে সবে ম্যাট্রিক ডিঙিয়েছে। মা-বাপ কবে মরে গেছে, তার মনেও নেই। কখনো মামার, কখনো কাকার, কখনো আত্মীয়তার গন্ধ-ছোঁয়া সংসারে গলগ্রহ হয়ে থেকে যখন ষোলো বছর বয়সে ম্যাট্রিকের বেড়া ডিঙোল সুবীরচন্দ্র, তখন তাঁরা বললেন, বাপু হে এবার, নিজের পায়ে দাঁড়াও। আমরা আর সিন্ধবাদের মত কাউকে বেশি দিন ঘাড়ে বইতে নারাজ। কিন্তু চাকরি বললেই তো তা নিউটনের আপেলের মত টুপ করে পড়ে না। তখন এই তখনকার-ঝিমন্ত শহরটায় এক দুঃসাহসী ব্যাঙ্ক শাখা খুলতে উদ্যোগী হয়েছিল। যেখানে সিনেমা নেই, যেখানে লাইফ নেই, সেখানে যাবে কে! কপাল ভাল সুবীরচন্দ্রের। তাই ওই ব্যাঙ্কের ওই শহরের শাখায় তার কেরানীর চাকরি জুটে গেল। সুবীরচন্দ্রের সিনেমার ঝোঁক ছিল না, সে দারিদ্র-লালিত, তাই তার সম্ভোগের বিলাস ছিল না, পরের অনুগ্রহে ও দাক্ষিণ্যে বর্ধিত হওয়ার দরুন সামান্য চাকরির আশ্রয় লাভ করেই তাই ধন্য; এবং তার কোন অ্যাম্বিশন ছিল না। আসলে ওর লাইফটাই লাইফলেস।

এ হেন সুবীরচন্দ্র আঠারো বছর নিরবচ্ছিন্ন নিরুপদ্রব কেরানী-

গিরি করার পর তার এক বয়স্ক সহকর্মীর খেয়াল হল, এই তো হাতের কাছে একটি উপযুক্ত পাত্র রয়েছে, একে পাত্রীস্থ করা যাক। তারই মহৎ প্রেরণায় সুবীরচন্দ্র চৌত্রিশ বছর বয়সে আঠারো বছরের ভরা যুবতী মৃণালিনীকে ঘরে আনল। সুবীরচন্দ্রের প্রয়োজন ছিল মাত্র একঘটি জল, কিন্তু পেয়ে গেল এক বিশাল নদী। সাঁতার জানা দূরের কথা, নদীর বাঁধ ভাঙা ঠেকানোই তার দ্বারা সম্ভব হল না। ফলে যা হল, তা মৃণালিনী থেকে ওই মীনুতে প্রমোশন।

আঠারো বছর ধরে সে তিলে তিলে গড়েছিল সততার এক উজ্জ্বল প্রতিষ্ঠা। অর্জন করেছিল ব্যাঙ্কের প্রতিটি ব্যক্তির প্রবল বিশ্বাস। এবং সে ক্রমেই এইভাবে মানুষের চারিত্রিক দুর্বলতা থেকে গা বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে নিজেকে দেবতার মত দূরত্বে অধিষ্ঠিত করতে পেরেছিল। লোকে তাকে শ্রদ্ধা করত, কিন্তু কাছ ঘেঁষত না, পাছে তাদের দুর্বলতা সুবীরচন্দ্রর চোখে পড়ে এবং সুবীরচন্দ্রও এই সব পার্থিব কলুষ থেকে নিজেকে স্বতন্ত্র রাখতে তৎপর ছিল।

কিন্তু, ওই যে বলে রোজ যা রুটিন মাফিক হয়ে চলেছে, তা ঘটনা নয়, ব্যতিক্রমই ঘটনা। রোজ সুবীরচন্দ্র খেয়েদেয়ে বগলে ছাতা নিয়ে একই ভাবে হেঁটে এসে ঠিক সময়মত নিজের চেয়ারটিতে বসে, লেজারে ডুবে যায়—এসব তো ঘটনা নয়, ঘটনা তখনই ঘটল, যখন সুবীরচন্দ্র তহবিল তছরূপের দায়ে ধরা পড়ল। সুবীরচন্দ্র অবশ্য খুব খারাপ একটা মাইনে পেত না। এত বছরের চাকরি, এত সুনাম। আর সুবীরচন্দ্র যে লাখে লাখে টাকা তছরূপ করেছে, তাও নয়। যখন যেটুকু প্রয়োজন সে নিয়েছে, সেও মীনুকে ভালবাসে বলেই। মুনিদেরই মতিভ্রম হয় আর সুবীরচন্দ্র কোন যোগীবর হে! মীনুর কোন দাবি সে ঠেকাতে পারে নি। হয়তো তার মানবিক গঠনের দরুণ তা সম্ভবও ছিল না। প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ কাকে বলে সুবীরচন্দ্র তা শেখে নি। সুবীরচন্দ্র শুধু জানত অসহায় আত্মসমর্পণ; ষোলো বছর বয়স অব্দি আশ্রয়দাতাদের

কাছে, তারপরে চাকরির পায়ে, তারপরে মীনুর শ্রীচরণে। এই তার কাল হল। নিয়তি কেন বাধ্যতে। ঝকঝকে গাড়িতে করে চকচকে দোকানে যে রঙচঙে মানুষগুলো আসে, স্টিল টাউনশিপের সেই আধুনিক যুগের উচ্চ বর্ণের কুলীনদের সঙ্গে মীনুর পাল্লা দেওয়ার দায় সামলাতে গিয়েই মরল সুবীরচন্দ্র। মীনু মেয়েদের ক্লাবে নাম লেখালো, মীনু সমাজ-সেবিকা সাজল মীনুর গান না হলে ফাংশন জমে না। অনেক কুলীন জায়া আড়ালে মীনুকে বলতে লাগল, ন্যাকা। আসলে মীনু তাদের মনে ঈর্ষা জাগাতে সক্ষম হল, অর্থাৎ এই তার উন্নতির সোপান এবং এই সুবীরচন্দ্রের পতনের শুরু। তুমি যদি কারো মনে ঈর্ষা জাগাতে পারো, তবে তক্ষুণি তুমি তার মনে একটা আলাদা, ভি আই পি'র স্থান পেয়ে গেলে। তাতেই সার্থকতা নিহিত।

ব্যাংকেই সুবীরচন্দ্রকে গ্রেপ্তার করা হল। সে নিজেকে দেবতার মত দূরে সরিয়ে রেখেছিল বলেই কিনা কে জানে, তাকে বাঁচাতে কেউ এগিয়ে এল না। কিংবা এও হতে পারে, ওরা জানল, ও, সুবীরচন্দ্রও আমাদেরই মত সামান্য মানুষ তাহলে! হাজতে সুবীরচন্দ্র বিচারের আশায় বসে রইল।

সাতদিন বাদে মীনু এসে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলল, ওগো, একি করলে তুমি! আমি যে তোমাকে অন্য মানুষ জানতুম!

বশংবদ পতিদেব সুবীরচন্দ্র মীনুকে বলতে পারল না যে, মীনুর দাবীর বিরাট হাঁ-র খাই মেটাতে এছাড়া অন্য পথ ছিল না। সুবীরচন্দ্র বোকার মত মীনুর দিকে কেবল তাকিয়ে রইল।

মীনু কেঁদে কেঁদে বলল, ওগো, আমার কাছে একথা লুকোলে কেন?

সুবীরচন্দ্র বোকার মত বলে বসল, মাইনের টাকাকড়ি পকেটমার হয়েছিল, তাই...

মীনু বিস্মিত হয়ে বলল, সেকি! আমি যে তোমাকে লালকেল্লার

চেয়েও দুর্ভেদ্য বলে জানতুম।

মীনুর অবশ্য ভাবনার কারণ ছিল না। সুবীরচন্দ্রর ব্যাঙ্ক ব্যালান্স বিয়ের পর থেকেই জয়েন্ট নামে করা ছিল। ওর লাইফটাই লাইফলেস ছিল এবং সে বিবিধ দায়-দায়িত্ব মুক্ত ছিল বলে টাকা নেহাৎ কম জমে নি। বুদ্ধিমতী মীনু সে টাকা সঙ্গে সঙ্গে তুলে নিয়েছিল। সুবীরচন্দ্রের এক চিলতে জমি কেনা ছিল. সেটাও মীনুরই নামে। যা হোক, সুবীরচন্দ্রের কাছে বিস্তর কান্নাকাটি করে বেরিয়ে এসেই মীনু সোজা গেল উকিলের বাড়ি বিবাহ-বিচ্ছেদের ব্যাপারে পরামর্শ করতে।

গ্রহের ফের ছাড়া আর কি বলা যায়, নইলে তার ঠিক একচল্লিশ-তম জন্মদিনেই তার দ্বিজত্ব লাভ! তার ফোটো তোলা হল, আঙুলের ছাপ নেওয়া হল, ওজন নেওয়া হল, মাপ নেওয়া হল। তারপর তার পোশাক খুলে নতুন পোশাক পরিয়ে দেওয়া হল। আর সুবীরচন্দ্রকে একটি সংখ্যায় চিহ্নিত করা হল। অতঃপর সুবীরচন্দ্রর পরিচয় কয়েদী নম্বর···। একে দ্বিজত্ব ছাড়া আর কি বলা যায়!

এর আগে সুবীরচন্দ্রর ধারণা ছিল না জেলের সেল কি বস্তু। গ্রেপ্তার হবার পর থেকে জেলে আসার মধ্যবর্তী সময়টুকু কেটেছে অন্যভাবে। কখনো থানার লক-আপে, কখনো জেলের বিচারাধীন বন্দী-নিবাসে, আর মধ্যে মধ্যে জেরার জন্য আদালতে ওকে ঘোরানো হয়েছে। তাছাড়া কখনো উকিল আসছে, কখনো ডাক্তার, কখনো সাইকিয়াট্রিস্ট। তার আশেপাশে ছিল মেলা লোকের মিছিল। বরাবরই সে একটু চুপচাপ ও শান্ত প্রকৃতির মানুষ এবং জীবন সংগ্রামের কঠোরতা তাকে মিশুক হয়েও গড়ে উঠতে দেয় নি। এ হেন সুবীরচন্দ্র যেন বুঝতেই পারছিল না, এই যে থানা জেল-আদালত-জিজ্ঞাসাবাদ-উকিল-ডাক্তার-স্বাস্থ্য পরীক্ষা-মনোবিদ ইত্যাদি ইত্যাদি ক্রমেই তাকে একটি নির্দিষ্ট ধারণার দিকে ঠেলে নিয়ে চলেছে। রায় যখন ওকে শোনানো হল, সে মনে মনে নিজেকে

এই বলে স্তোক দিল, এ টিঁকবে না। সে আবার অতি শীঘ্র আগের জীবনে ফিরে যাবেই। কিন্তু মানুষ যা কল্পনা করে ভগবান তা বানচাল করে দেন। সদর জেলের ব্লক ডি'র উনত্রিশ নম্বর সেলে তাকে ঢুকিয়ে যখন দরজা বন্ধ করে দেওয়া হল, তখন যেন তার দিব্য দৃষ্টি ক্রমেই উন্মোচিত হতে লাগল এবং সে বুঝতে পারল, এই দৃশ্য-হীন সঙ্গীহীন অতি ক্ষুদ্র পরিসরের বাইরে তার গতিবিধি অতি দীর্ঘ দিনের জন্যে বন্ধ হয়ে গেল।

সুবীরচন্দ্রর প্রথম সমস্যা হল সময় নিয়ে। চব্বিশ বছর চাকরি করে মজ্জায় মজ্জায় সে বশংবদ কেরানী হয়ে উঠেছিল। বাড়ি ফিরত রাত আটটায় ব্যাঙ্ক-ফিরতি বাজার-টাজার সেরে। বাড়িতেও তার খুঁটিনাটি কাজের অন্ত ছিল না যতক্ষণ সে বাড়িতে থাকত। সুবীর-চন্দ্রই সংসারের বেশি দিক সামলাতো, কারণ মীনুর 'পৃথিবী আমারে চায়, রেখ না বেঁধে আমায়…।' সেই কাজের লোকটা হঠাৎ যখের ধনের মত অফুরন্ত সময় হাতে পেয়ে দিশেহারা হয়ে গেল। সময়ের অন্য ব্যবহার তার জানা নেই। প্রতিটি সেকেণ্ড, প্রতিটি মিনিট, প্রতিটি ঘণ্টা যেন ভয়ঙ্কর রকমের প্রসারিত হয়ে গেল; প্রতিটি বেলা অন্তহীন মরুভূমিপ্রায় দিগন্তবিহীন হয়ে উঠল। ছাতের কাছাকাছি দেয়ালে পেন্সিলে লেখা একটি অস্পষ্ট নাম আর বেশ পুরোন তারিখ, নিশ্চয়ই সুবীরচন্দ্রর মত কোন এক সেল নিবাসীর কীর্তি। দেখে সুবীরচন্দ্রর মনে হল, এরা জেলে চুনকামও কি করে না! পাশের সেলের কয়েদীকে একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা দেওয়া হয়, সুবীরচন্দ্র দেখেছে। কিন্তু তার কাছে পয়সা নেই যে সে-ও এমনই একটি অনুমোদিত পত্রিকা রাখে। বাইরের দুনিয়ায় কি ঘটছে কে জানে! সুবীরচন্দ্র চোখ থাকতেই অন্ধ হতে বাধ্য হয়েছে, কান থাকতেই বধির হতে বাধ্য হয়েছে এবং মুখ থাকতেও প্রায় নির্বাক হতে বাধ্য হয়েছে।

তাহলে সুবীরচন্দ্র করে কী? অতীতের রোমন্থন অসার এবং

বেদনাসঙ্কুল। বর্তমান তো একটা বিস্তৃত শূন্য কর্মহীন সময়ের মরুভূমি। ভবিষ্যৎ অন্ধকার। বর্তমানের কাছে তার পাবার কিছু নেই কয়েকটা বরবাদ বছর ছাড়া, যেগুলো বহন করা তার পক্ষে দায় হয়ে উঠবে। যতদিন সে বাঁচবে ততদিন এর জের চলবে।

সুবীরচন্দ্র বাবা-মাকে মনে করতে চেষ্টা করল। ওরা স্মৃতির ধুলোয় এতই মলিন যে সে তাদের মুখ মনে আনতেই পারল না। তাকে ফাঁকি দিয়ে ওরা কবেই রিটার্ন জার্নি করেছে। তারপর কত লোকের সংস্পর্শ, কত বিচিত্র আশ্রয়দাতা। যিনি তাকে প্রথমে আশ্রয় দিয়েছিলেন তিনি তার মামা। মামার কোন বাচ্চা-কাচ্চা ছিল না। সুবীরচন্দ্র মামার কাছে দশ বছর বয়স অবধি ছিল। মামী শুঁটকি, খিটখিটে, মুখে মাছি বসতে পায় না। মামা ছিলেন মামীর বশংবদ। মামার সঙ্গতিও বিশেষ ছিল না। অভাবের সংসারে যা হয়; বিলাসিতার লেশ মাত্র দুঃস্বপ্ন তো ছিলই, উপরন্তু অনেক প্রয়োজনকেও ঠেকিয়ে রাখার প্রাণপণ প্রয়াস ছিল। দুধ আসত কেবল চায়ের জন্যে। বারো মাসের খাবার মেনু এক—ডাল আর ভাত, আর একটা বাড়তি কিছু মানেই ছিল মোচ্ছব। সুবীরচন্দ্রর যখন বোঝবার বয়স হল, তখন প্রায়ই রাতে মামা-মামীর কথায় তার ঘুম ভেঙে যেত। যেটুকু সে উদ্ধার করতে পারল, তার নিগলিতার্থ এই—মামার কাতর আবেদনে সুবীরকে দত্তক নেন, কিন্তু মামী নারাজ। মামীর নারাজী ক্রমেই কাজে ও কথায় প্রকাশ পেতে লাগল। পরের গলগ্রহ হয়ে যারা মানুষ হয়, সাধারণত তাদের কিছু বোধ বেশ প্রখর হতে দেখা যায়। সুবীরচন্দ্র বুঝতে পারল মামার অন্ন ওর কপালে বেশিদিন লেখা নেই।

সেখান থেকে দূর সম্পর্কের এক কাকার সংসারে। এখানে একপাল আত্মজ আত্মজা নিয়ে কাকা-কাকী হিমশিম। এখানে-ওখানে ভাসতে ভাসতে সুবীরচন্দ্র শেষ অবধি যাঁর আশ্রয়ে এসে পড়ল, তিনি লতায়-পাতায় তার জ্যাঠামশাই। জ্যাঠামশাই আর জেঠিমা

ছিলেন বিপরীত দুই মেরুর অধিবাসী। জ্যেঠিমা ছিলেন কঠোর-ভাষিণী এবং কঠোর সংসারী। জ্যেঠিমা বলতেন, ব্যাটাছেলে যদি আত্মভোলা হয়, তবে মেয়েমানুষের সংসারের হাল না ধরে উপায় কি ? নইলে যে সব ভেসে যাবে। জ্যাঠামশাই একটা চাকরি করতেন বটে, মাইনেও মন্দ ছিল না, তবে ওই যতক্ষণ অফিসের সময় ততক্ষণ চাকরি। বাকি সময়টুকু ছিল তাঁর একান্ত নিজস্ব। অধ্যাত্ম এবং জ্যোতিষচর্চাই ছিল তাঁর ধ্যানজ্ঞান। জীবন। জ্যাঠামশাই তাকে বিশেষ স্নেহ করতেন। তিনি বলতেন, মানুষের ইচ্ছাশক্তির চেয়ে কোন শক্তিই বড় নয়। যে এই শক্তিকে আয়ত্ত করতে পেরেছে, সে-ই একমাত্র জানে এই শক্তি কত পরিশ্রমসাধ্য ও এর কী স্বাদ। এই যে জগতে পার্থিব নানা রকম জিনিস তুমি চক্ষুর সামনে দেখতে পাচ্ছ, এ তো পরিণতি নয়, এই তো প্রধান নয়। বস্তু তো জড় পদার্থ মাত্র, এর নিজস্বত্ব কি ? তুমি যদি না তাকে চালাও, সে অচল। এই যে অ্যারোপ্লেন, কি তার ক্ষমতা, মানুষকে উড়িয়ে নিয়ে যায় কত সমুদ্র-পর্বত-মহাদেশ ডিঙিয়ে। কিন্তু তার চালক তো ওই মানুষ। মানুষ না চালালে সে অচল। আর প্রতিটি বস্তুর কর্মবিধান নির্দিষ্ট এবং নিয়ন্ত্রিত। বাল্বের কাজ আলো দেওয়া, ফ্যানের কাজ হাওয়া দেওয়া, ট্রেন বাস লরির কাজ পরিবহন —এবং এরা সেই ভাবেই তৈরি। কেউ কারো পরিপূরক নয়, একটিকে দিয়ে অপর কোন কাজ পাওয়া যায় না। কিন্তু মানুষ দেখ কত বিচিত্র জীব। কত ফ্লেক্সিবল আবার কত রিজিড, কত স্থাবর আর কত জঙ্গম। তার ক্ষুদ্র মগজের কোষে কোষে রয়েছে লেবরেটরি, সেখানে বস্তুর রূপকল্পনা তৈরি হয় তারপর সে হাতে-কলমে তার পার্থিব বস্তুগত রূপ সৃষ্টি করে। আসলে মানুষই বিশ্বকর্মা। আর সবচেয়ে বিস্ময়কর জিনিস হচ্ছে মানুষের মন। তার মগজের চেয়েও যা বিস্ময়কর। এই মনকে সে ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রণও করতে পারে, পরিচালিতও করতে পারে যদি সে চেষ্টা

করে। বস্তুর ওপরে মন এবং মনের দ্বারা সে বস্তুকেও চালিত করবার শক্তি রাখে। এরই দরুণ মানুষ শূন্যে আসন করতে পারে, জলের ওপর দিয়ে হেঁটে যেতে পারে।

জ্যাঠামশাই তার ম্যাট্রিক পরীক্ষার বছরই মারা গেলেন। সুবীরচন্দ্র জ্যাঠামশাইয়ের সব কথা বুঝতে পারত না, কিন্তু তাঁর কথা তার শুনতে ভাল লাগত। অনেক দিন বাদে জ্যাঠামশাইয়ের কথাগুলো তার মনে পড়ল। আর আশ্চর্যের কথা, সে আবিষ্কার করল জ্যাঠামশাই-ই তার জীবনের একমাত্র স্মরণীয় ব্যক্তি। সংসার আর চাকরির ভেতর সে এমন ভাবে দীর্ঘ কয়েক বছর নিমজ্জিত ছিল যে, এই সব কথা স্মরণ করার মত অবকাশও তার ছিল না। এখন সে খুব সযত্নে প্রতিটি খুঁটিনাটি স্মৃতি হাতড়ে অনেক কিছু বিস্তৃত ভাবে দেখতে পাচ্ছে। জ্যাঠামশাই যে মনের শক্তির কথা বলতেন, সেটা কি জিনিস?—ভাবল সুবীরচন্দ্র। মেসমেরিজম বা সম্মোহনের কথা শুনেছে। টেলিপ্যাথি বা মানসিক যোগাযোগের কথাও সে জানে। যদুমাসি হলুদ বাটতে বসে হঠাৎ বলে উঠেছিলেন, মণিটার জন্যে বড় মন কেমন করছে রে। মেয়েটা কেমন আছে, কে জানে! যদুমাসির মেয়ে মণি সেদিনই মারা যায়। নিরাপদবাবু কোনদিন স্কুলে কামাই দিয়েছেন বলে কেউ মনে করতে পারে না। একদিন সকালে নিরাপদবাবু বিছানা ছেড়ে উঠতে পারলেন না, সমস্ত শরীর যেন অবশ। সেদিন তাঁর স্কুলে যাওয়া হল না। আর সেদিনই স্কুলবাড়িটা ভেঙে অতগুলো ছেলেমেয়ে আহত হল, সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল নিরাপদবাবুরই ক্লাশ। অথচ পরদিন থেকে তিনি দিব্য সুস্থ। জ্যাঠামশাইয়ের কথা মনে পড়তেই এই সব ঘটনাও তার মনে পড়ল। সাতঘাটে ঘুরেছে যতদিন পরাশ্রয়ী ছিল। দেখেছে কত কি। তখনকার জীবনে অনেক ঘটনাও ঘটেছে। তারপর ষোলো বছর বয়স থেকেই তার জীবন ঘটনাহীন নিষ্প্রভ, একটানা, নিস্তরঙ্গ। সুবীরচন্দ্র ভাবল, জ্যাঠামশাই যা বলতেন,

তার সঙ্গে কি এই সব ঘটনাকে একসূত্রে গেঁথে বিশ্লেষণ করা যায়? মনের মধ্যে যে এইসব অদ্ভুত ঢেউ কখনো জাগে, এর মানে কি? সবার মনে এই ধরনের পূর্বাভাষ জাগে না কেন? আর, পূর্বাভাষ কি বিক্ষিপ্ত কোন তাৎক্ষণিক ঘটনা মাত্র? একে কি নিয়ন্ত্রণ করা যায় না? মনকে কি বশীভূত করে চালনা করা যায় না?

এইবার সুবীরচন্দ্র একটি কাজের মত কাজ পেল। দিনরাত চুপচাপ বসে সে জ্যাঠামশাইয়ের কথা আর তার পরিপ্রেক্ষিতে মনের শক্তির কথা ভাবতে লাগল। সুবীরচন্দ্রর মনে হল, মনের শক্তি আসলে এক বিরাট অব্যবহৃত কণ্ট্রোল টাওয়ার। মানুষ তার ব্যবহার জানে না। যদি ব্যবহার জানত, তাহলে নিউটন তার বিখ্যাত আপেলটিকে শূন্যে স্থির করে রেখে দিতে পারতেন। সুবীরচন্দ্রের বদ্ধমূল ধারণা হল, মগজ এক অদৃশ্য তরঙ্গ সৃষ্টি করে তার দ্বারা অচল বস্তুকে সঞ্চালন করতে পারে। সুবীরচন্দ্র এমন কথাও ভাবল যে, এই শক্তির দ্বারা মানুষও যে কোন বাধা অতিক্রম করে নিজেকে সঞ্চালন করতে পারে। শরীরকে বাধাভেদী সূক্ষ্ম রূপে পরিবর্তিত করে তারপর অন্যত্র পৌঁছে ফের পূর্বরূপে নিজেকে ফিরিয়ে এনে সেটা সম্ভব।

এইবার সুবীরচন্দ্র এক নিগূঢ় কঠিন সাধনায় ব্রতী হল। এই সাধনা মনকে—সমস্ত ভাবনা চিন্তাকে একটি বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত করার সাধনা। তার স্থির বিশ্বাস হল যে, মনকে কেন্দ্রীভূত করে যে শক্তির সৃষ্টি করা যায়, তার উদ্দেশ্যমূলক প্রক্ষেপণের দ্বারা যে কোন ইচ্ছাপূরণই সম্ভবপর। এই উৎকাঙ্ক্ষায় নিজেকে সম্পূর্ণ ন্যস্ত করে সে কোন একটি বস্তু নির্দিষ্ট করে তার প্রতি সমস্ত মনোযোগ নিবদ্ধ করতে শুরু করল; যেমন গাছের কোন একটি পাতা বা দেয়ালের কোন একটি সামান্য দাগ। এমনভাবে সে অন্যসব ভাবনা চিন্তাকে মন থেকে শূন্য করে কখনো পাতা বা কখনো দেওয়ালের দাগে সমস্ত মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করতে লাগল যে, কালে কালে

তার খুব শীঘ্র মনঃসংযোগের এক অদ্ভূত শক্তি আয়ত্তাধীন হল জেলের শান্ত পরিবেশে, যেখানে চিত্ত বিভ্রমের অবকাশ নেই,— তার সাধনায় তাকে যথেষ্ট সাহায্য করল।

সুবীরচন্দ্রের সেলের দরজার ওপরে একটা বাল্ব সারারাত জ্বলত। তার আলো সোজাসুজি চোখে পড়ত বলে তার ঘুমের বড় ব্যাঘাত হত। সে প্রায়ই ভাবত, একদিন সন্ধ্যেবেলা যদি ওটা ফিউজড হয়ে যায়, তবে সে অন্তত একটি রাত শান্তিতে ঘুমোতে পারে। কিন্তু ভাবলেই কি তা হয়। সে ভাবল, চেষ্টা করেই দেখা যাক মনের শক্তি দিয়ে ওটাকে নষ্ট করা যায় কিনা। যাহাতক ভাবা অমনি কাজ শুরু। দীর্ঘ সময় ধরে সে মন থেকে সমস্ত ভাবনা চিন্তা দূর করে স্থির দৃষ্টিতে ওই বাল্বটির প্রতি পুরোপুরি মনঃসংযোগ করতে চেষ্টা করল। অর্জুনের পাখির চোখের মত তার অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ জগত-সংসার পার্থিব অপার্থিব সমস্ত বিলুপ্ত হয়ে ওই জ্বলন্ত বাল্বই একমাত্র অস্তিত্ব হয়ে জেগে রইল। সুবীরচন্দ্র একটি ইচ্ছেই শুধু প্রয়োগ করতে চেষ্টা করল, নিভে যাক, নিভে যাক, নিভে যাক, নিভে যাক···। কতক্ষণ কেটেছে সে বলতে পারে না, কেননা সময়ের অস্তিত্ব সে ভুলে গিয়েছিল, হঠাৎ বাল্বটা নিভে গেল। সে একটু অবাক হল, ভাবল হয়তো বা কাকতালীয় ব্যাপার। তারপর নিশ্চিন্তে সে লম্বা ঘুম দিল।

পরদিন নতুন বাল্ব লাগানো হল। সে ফের নতুন বাল্বের ওপর পরীক্ষা চালাল। এবারও বাল্বটা হঠাৎ ফিউজড হয়ে গেল।

পরদিন আবার আরেকটা নতুন বাল্ব লাগানো হল। এবার সুবীরচন্দ্র বুঝতে পারল, সমস্ত ভাবনা চিন্তাকে সূচের মত সূক্ষ্ম তীক্ষ্ণ তরঙ্গে পরিণত করে বাল্ব-সর্বস্ব প্রবল ইচ্ছাশক্তি দিয়ে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সে বাল্বটাকে অকেজো করে দিতে পেরেছে। সে আরো বুঝতে পারল, সে এক আশ্চর্য শক্তি আয়ত্ত করেছে এবং তার

প্রয়োগ অতি সতর্কতার সঙ্গে করা প্রয়োজন। শক্তির সার্থকতা তার উচিত ব্যবহারে নিহিত।

সেদিন ইলেকট্রিসিয়ান এসে লাইট পয়েন্টটা পরীক্ষা করে কোন ত্রুটি খুঁজে পেল না। তবে সুবীরচন্দ্র সতর্ক হয়ে গেল। সে ভাবল, নিয়মিত যদি সে ওই বাল্বের ওপরে তার ইচ্ছাশক্তি আরোপ করে, তাহলে জেল-কর্তৃপক্ষ সন্দেহ করবে, নিশ্চয়ই সুবীরচন্দ্র এর জন্যে কোনভাবে দায়ী, নচেৎ ওই পয়েন্ট থেকেই রোজ বাল্ব ফিউজড হবে কেন?

সুবীরচন্দ্র এবার ভাবল, কাছের জিনিসের ওপর ইচ্ছাশক্তি আরোপ করে যখন প্রার্থিত ফল পাওয়া গেছে, এবার দূরের জিনিসের ওপর পরীক্ষা করা যাক। দূরে ইন্সপেকশন বক্সের পেছনে একটা জানলার শার্সিতে সে শক্তি প্রয়োগের কথা ভাবল। শার্সিটা তার সেল থেকে দেখা যায় না। প্রাতঃকৃত্যের জন্যে সেল থেকে বেরোলে সে শার্সিটা দেখতে পেত। অনেকক্ষণ ধরে মনঃসংযোগ করে সে নিশ্চিত হতে পারল না, শার্সিটা ফেটেছে কিনা। সে কথা পরদিন ভোরের আগে জানা যাবে না। রাত কাটালো সে দুশ্চিন্তায়। যদি তার পরীক্ষা ব্যর্থ হয়! যদি সে না পারে, তাহলে!

পরদিন ফাইল করে দাঁড়াবার পরও সুবীরচন্দ্র ওই দিকে তাকাবার সাহস পেল না। যখন সে চোখ ফিরিয়ে তাকাল, সে দেখতে পেল জানলার শার্সির নিচের দিকটা কোণাকুণি লম্বা, নিপুণ, যেন হাতে কাটার মত ফাটা।

একদিন অঝোর বৃষ্টির রাতে শুয়ে শুয়ে সুবীরচন্দ্র ভাবল, উঠোনের জলের পাইপটা ফেটে যাক। পরদিন ফাইল করে প্রাতঃকৃত্যে যাবার সময় দেখল ফাটা পাইপের জলে উঠোন ভেসে যাচ্ছে। ওদের তাই একটু ঘুরে যেতে হল।

সুবীরচন্দ্র একদিন ভাবল, কেন সে এসব করছে? কী উদ্দেশ্য? এটা কি নেই কাজ তো খই ভাজ, সময় কাটাবার সাধন? আর

কেনই বা তার সমস্ত পরীক্ষা ধ্বংসের উদ্দেশ্যে নিবদ্ধ ? বাল্ব ফিউজ করা, শার্সি ফাটানো, জলের পাইপে চিড় ধরানো—এসব কি জেল কর্তৃপক্ষের প্রতি তার মনের নিরুদ্ধ প্রতিবাদের বহিঃপ্রকাশ ! না, তা তো নয় ! জেলের কেউ তো তার প্রতি কোন রকমের দুর্ব্যবহার করে নি, বরং সামান্য সান্ত্রী থেকে উচ্চতম জেলার সাহেব পর্যন্ত সবাই কয়েদীদের প্রতি যথেষ্ট সমবেদনাবান। এরা তো তার জেল-জীবন দুর্বহ করে তোলে নি। বরং এরা বাইরের জগতের মানুষদের চেয়ে অনেক অর্থে ভাল।

ঝরাপাতা উড়িয়ে ঠাণ্ডা শীত স্বেচ্ছা-নির্বাসনে গেল। জেলের গাছগুলিতে বসন্তের আভাষণ দেখা দিল। এবার সুবীরচন্দ্রকে এক অসম্ভব ইচ্ছা পেয়ে বসল। নিজেকে সে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় কি স্থানান্তরিত করতে পারে না ! সে ভাবল, ইচ্ছা অতি শীঘ্র ফলবতী না হলে ক্রমেই তার উদ্যম নিস্তেজ হয়ে যেতে পারে এবং এইখানে এইভাবে থাকার সঙ্গে সে একটা আপোষও করে নিতে পারে, কেননা জেলজীবন ক্রমেই তার কাছে সহনীয় হয়ে উঠছে। সে ভাবল, শরীরকে সূক্ষ্মভাবে সঞ্চালন করা কি খুব যন্ত্রণাকর হবে ? এতে কি শরীরের কোন ক্ষতি হবে ? আর যদি মাঝপথে ব্যর্থ হয়, তবে ? এতসব ভবিতব্য জানার একমাত্র উপায় নিজেকে নিয়ে পরীক্ষা করা ছাড়া আর দ্বিতীয় নেই। সে ভাবল, যে এই দুঃসাহসের স্বপ্ন দেখে, বাধা-বিপত্তি ও পরাজয়ের সম্মুখীন হবার মত দুঃসাহস থাকাও তার অতি বাঞ্ছনীয় বৈকি !

এক বসন্ত-নিশীথে, জেলের লোক ঘুমন্ত হয়ে যাবার পর, সে এই নতুন পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য তৈরি হল। কিন্তু সে যাবে কোথায় ? প্রথম পরীক্ষা হিসেবে কাছাকাছি কোন একটা জায়গায় যাওয়া উচিত হবে বলে সে স্থির করল। কারাগারের শেষপ্রান্তে একটা সেল বেশ কিছুদিন ধরে খালি আছে, সুবীরচন্দ্র

দেখেছে। আপাতত সেখানেই যাওয়া যেতে পারে।

যখন জেল নিঝুম হয়ে এল তখন সে তার সেলের গরাদে ধরে মনকে একটি ভাবনায় নিবদ্ধ করে প্রবল ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগে সচেষ্ট হল।

কি করে কি হল সুবীরচন্দ্র বুঝতেই পারল না। মুহূর্ত বিক্ষেপে সে ওই খালি সেলে এসে হাজির হয়ে গেল। কোন গতি সে অনুভব করল না, কোন শারীরিক ব্যথাই নয় এবং আদৌ কালক্ষেপ এ জন্য হল না। সে চোখ খোলা রেখেছিল, কিন্তু সে শূন্যে নিজেকে সঞ্চরণমানও দেখতে পায় নি। আশ্চর্য। সে খুশি হল। তাহলে তার অভীষ্ট সিদ্ধ হয়েছে ; সে এখন থেকে নিজেকে ইচ্ছানুসারে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে যেতে পারে।

তখনি তার মনে সংশয় জাগল, যদি সে ফিরে যেতে না পারে, তাহলে সমূহ সর্বনাশ। তাহলে কোন কৈফিয়ৎই তাকে রক্ষা করবে না। ভয়ে সে সিঁটিয়ে গিয়ে তৎক্ষণাৎ আবার নিজের সেলে ফিরে যাবার জন্য মনকে একটি ইচ্ছায় কেন্দ্রীভূত করল। সঙ্গে সঙ্গে সে দেখতে পেল, সে নিজের পরিচিত সেলে বসে রয়েছে। স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়ল সে। তাহলে সে তার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। নতুন খেলনা হাতে পাওয়া উত্তেজনায় বিহ্বল শিশুর মত সুবীরচন্দ্র বার বার এই নতুন খেলা খেলতে লাগল সারারাত ধরে।

সুবীরচন্দ্র দেখে রেখেছিল, কোন্ কোন্ সেল খালি আছে। একবার এই সেল, একবার ওই সেল, সারারাত সে অভিযান চালাল। সে এইবার জানতে পারল, ইচ্ছামত গতিবিধি তার করায়ত্ত। পদার্থ বিদ্যাকে পরাভূত করে সে মনঃশক্তিকে পরমা-শক্তির সন্ধান দিতে পেরেছে, এই তার কৃতিত্ব।

এইবার সুবীরচন্দ্র সিরিয়াসলি ভাবতে লাগল কোথায় যাওয়া যায়। এমন এক জায়গায় যেতে হবে, যেখানে তাকে ভাষার অসুবিধেয়, আচার-ব্যবহারের বিপাকে পড়তে হবে না, উপরন্তু সেটা

এমন একটা জায়গা হওয়া চাই, যা একটি স্বতন্ত্র দেশ।

তার বাড়িতে ফিরে যাওয়ার প্রশ্ন উঠে না। মীনুর সঙ্গে তার বিচ্ছেদ ঘটে গেছে। মীনু যে কোথায়, সে তাও জানে না। তার ওপর পুরোন জায়গায় ফিরে গেলে তাকে ফের এখানেই ফিরতে হবে, এটা নিশ্চিত। আকাশ-পাতাল হাতড়ে সে একটি যথার্থ বন্ধুর খোঁজ পেল না, যে তাকে আশ্রয়ের বিশ্বাস দিতে পারে। তাই প্রবাসের নিশ্চিন্তির কথাই তার বার বার মনে হতে লাগল।

সুবীরচন্দ্র গোঁফ-দাড়ি বাড়াতে লাগল। খাওয়া কমিয়ে দিয়ে শরীরটাকে ছিপছিপে করে তুলতে চেষ্টা করল। সে পূর্ববঙ্গের ছেলে; তার কথার বিশেষ আঞ্চলিক টানকে মনে মনে ঝালিয়ে ভালভাবে রপ্ত করতে লাগল। অতঃপর সুবীরচন্দ্র নিজেকে ইক্রামুল হক ভাবতে ভাবতে ইক্রামুল হক হয়ে গেল।

বাংলাদেশের একটি ছোট মফস্বল শহরের জেলে ভোরবেলা ঘুম ভেঙে জেগে উঠল ইক্রামুল হক। সেলের দরজার কাছে গিয়ে সে দেখল, সকালের সোনালি আলোয় সামনের লনের সবুজ ঘাস উজ্জ্বল কার্পেটের মত পড়ে আছে। আকাশে মাটিতে আলিশায় অনেক চেনা পাখি।

রোঁদে বেরিয়ে জেলের সান্ত্রীটি তার সেল পেরিয়ে চলে যাচ্ছিল, ইক্রামুল হক তাকে সম্ভাষণ জানাল: আদাব আরজ।

আদাব আরজ।—সান্ত্রীটি অভ্যাস বসে সম্ভাষণ বিনিময় করেই চমকে উঠল: তুমি আবার কে হে?

আমি কে?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি কে?

জনাব, ঠাট্টা করবেন না।

ঠাট্টা! কে তুমি—কদ্দিন আছ এখানে? ঠিক করে বল।

জনাব, আজ্ঞে, আমি ইক্রামুল হক। আমি এখানে দু' বছর

যাবৎ আছি। আরো অনেকদিন থাকতে হবে।

সান্ত্রীটি উত্তেজিত হয়ে উঠল : এ অসম্ভব—অসম্ভব! এ হতেই পারে না। গতকাল রাতে এই সেলটা খালি ছিল, স্বচক্ষে দেখে গেছি!

না জনাব, আপনি ভুল করছেন।—ইক্রামুল হক হাসল।

তাহলে কি আমার মাথা খারাপ হয়েছে? দাঁড়াও দেখি!—সান্ত্রীটি দ্রুতপদে ছুটে গেল পাশের ব্যারাকের সান্ত্রীর কাছে, গিয়ে সব বলল।

সান্ত্রী থেকে জেলার পর্যন্ত সবাই ভেবে হয়রাণ। কোন নথিতে নাম নেই, কোথাও উল্লেখ নেই, কোত্থেকে এল, কি জন্য জেল খাটছে—অসংখ্য সমস্যা, অসংখ্য প্রশ্ন, কোনটার মীমাংসা নেই। ওকে নিয়ে যে ওরা কি করবে ভেবে পেল না।

ইক্রামুল হককে এই সব কোন কিছুই স্পর্শ করল না। সে বেশ শান্ত, সুশৃঙ্খল কয়েদীর মত জেল খেটে যেতে লাগল। অন্যান্য কয়েদীর সঙ্গেও তার বেশ ভাবসাব হল এবং বিনীত, নিয়মপরায়ণ কয়েদী হিসাবে সে সুনাম অর্জন করল।

তার আর মনেও পড়ে না, সে কোনদিন সুবীরচন্দ্র ছিল; সে যে এক আশ্চর্য মানসিক শক্তির অধিকারী, সে কথাও সে ভুলে গেল। তার যে মীনু নামে এক স্ত্রী ছিল, সে-কথাও পূর্বজন্মের ঘটনার মত সে বিস্মৃত হল।

অতি সাদাসিধে শান্তশিষ্ট ভাল মানুষ কয়েদী ইক্রামুল হকের মনে এখন আর কোন্ অসম্ভব স্বপ্নই হানা দেয় না।

নীলকান্তপুরের হত্যাকাণ্ড

মনোজ সেন

'আপনি কি ডাক্তার অরিজিৎ বোসের নাম শুনেছেন ?' প্রশ্ন করল শিবেন।

দময়ন্তী মাথা নাড়ল।

'না শোনবারই কথা। ভদ্রলোক পাগলের ডাক্তার, মানে মনস্তত্ত্ববিদ। ডাক্তারি করেন গড়িয়া ছাড়িয়ে নীলকান্তপুর বলে একটা জায়গায়। ওখানেই ওঁর চেম্বার এবং নার্সিং হোম। চলে বেশ ভালই। যাঁরা এ ব্যাপারে খোঁজখবর রাখেন বা রাখতে বাধ্য হন, তাঁদের কাছে ডাক্তার বোস অপরিচিত নন। সম্প্রতি একটা খুব বিচ্ছিরি ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছেন। কাগজে খুব ছোট করে বেরিয়েছিল, আপনার নজরে পড়েছে কি না জানি না।'

দময়ন্তী ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, 'এটা কি সেই স্ত্রীকে খুন করার দায়ে ডাক্তার গ্রেপ্তার—সেই ব্যাপারটা ? সে খবরটায় তো নাম ধাম কিছুই ছিল না, কেবল গড়িয়ার কাছে বলে একটা উল্লেখ ছিল।'

'ঠিক বলেছেন। সেই ঘটনাটাই। একবার ব্যাপারটা দেখবেন নাকি ?'

'কি হয়েছিল ? আপনারা তো তদন্ত করছেনই।'

'তা করছি। তদন্ত শেষও হয়ে গেছে। কিন্তু তদন্তের ফলাফলটা মোটেই আমার পছন্দ হচ্ছে না। কোথায় যেন একটা গোলমাল ঠেকছে।'

'কেন ?'

'আসলে আপনি যদি ভদ্রলোককে দেখেন, আপনার কিছুতেই বিশ্বাস হবে না যে তিনি স্ত্রীকে খুন করতে পারেন। হাসবেন না। জানি মানুষের বাইরের চেহারা বা চালচলন দেখে কল্পনাও করা যায়

না যে তার ভেতরে কি লুকিয়ে আছে। এত বছরের অভিজ্ঞতার পর বাইরের রূপ দেখে ভোলবার পাত্র আর আমি নই। কিন্তু এত বছরের অভিজ্ঞতায় আবার কেমন একটা ইনটুইশনও গজিয়ে গেছে। কাউকে অপরাধী নয় বলে মনে হলে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখেছি সেটা ভুল হয় না।'

'ঘটনাটা গোড়া থেকে বলবেন ?'

সমরেশ এতক্ষণ লম্বা হয়ে ডিভানের ওপর শুয়ে সিগারেট টানছিল। বলল, 'হ্যাঁ, বেশ বিশদ ভাবে বলবি।'

'প্রথমে ডাক্তার বোসের চেহারার একটা বর্ণনা দেওয়া প্রয়োজন। ভদ্রলোক পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চি লম্বা, রোগাটে গড়ন, গায়ের রঙ ফ্যাকাশে, বড় বড় চোখ, মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, মাথায় টাক, বয়েস পঁয়তাল্লিশ। কলকাতা থেকে ডাক্তারি পাশ করে বিলেতে যান, ফিরে আসেন দশ বছর বাদে। সে আজ প্রায় বছর বারো হল। এখনও কিন্তু বিলেতের গন্ধ যায় নি। সবসময় স্যুট পরে থাকেন। কথা বলেন খুব আস্তে আস্তে, শান্ত ভাবে।

'এসবের কোনটাই অবশ্য তাঁর খুনী হওয়ার পথে কোন বাধা নয়। বাধাটা অন্যত্র। আপনি যদি ওঁর সঙ্গে কথা বলেন, তাহলে বুঝবেন, ভদ্রলোকের সর্ববিষয়ে পাণ্ডিত্য অসাধারণ, অত্যন্ত বিনীত, নম্র, ভদ্র ব্যবহার, সরল সাদাসিধে কথাবার্তা এবং স্থির বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব—এমন লোক যখন অপরাধী হয়, তখন তাকে চট করে ধরে ফেলা যায় না।

'সে যাই হোক, আমি এবার আসল ঘটনাটা বলি।

'বিলেত থেকে ফিরে ভদ্রলোক কেয়াতলার কাছে একটা ক্লিনিক খুলে বসেছিলেন বছর বারো আগে। চলে নি। বেশ অর্থকষ্টে পড়েছিলেন তখন। এই সময় তাঁর সঙ্গে বিয়ে হয় ডাক্তার দীপিকা মিত্রের। লাভ ম্যারেজ নয়, সম্বন্ধ করে বিয়ে। সেটাও আশ্চর্য,

কারণ বীথিকার সঙ্গে কারুর লাভ হওয়া সম্ভব বলে আমার মনে হয় না। ভদ্রমহিলা মারা গেছেন, তাঁর সম্বন্ধে এরকম মন্তব্য করা হয়তো আমার উচিত নয়। তবে না করেও পারছি না। এঁর সম্পর্কে পরে আরও বলব। তার আগে ডাক্তার বোসের কথাটা বলে নিই।

'বীথিকার সঙ্গে বিবাহের পর অরিজিৎ বোসের ভাগ্য ফিরতে আরম্ভ করে। তার একটা কারণ অবশ্যই বীথিকার টাকা। তাঁর বাবা অন্নদা মিত্র তখন কলকাতার বিখ্যাত বড়লোকদের একজন। তিনি জামাইয়ের ক্লিনিক সাজিয়ে গুজিয়ে দিয়েছিলেন প্রচুর খরচা করে। আর অন্য কারণ, অন্নদা মিত্র ও তাঁর পরিবারের সমাজে বিশেষ করে ডাক্তার মহলে ইনফ্লুয়েন্স। এই সব কারণে এবং নিজের হাতযশে বছর পাঁচেকের মধ্যেই অরিজিৎ তাঁর কর্মক্ষেত্রে খুব সুনাম অর্জন করেন। এবং, বলাই বাহুল্য, অনেক টাকাও রোজগার করেন। সেই টাকায় বছর সাতেক আগে নীলকান্তপুরে কয়েক বিঘে জমি কিনে প্রজ্ঞা মনোবিকলন কেন্দ্র বলে একটা ছোটখাটো মেণ্টাল হসপিটাল আর গবেষণা কেন্দ্র খুলে বসেন। আজ ওখানে আছে একটা নার্সিং হোম যেখানে জনা তিরিশেক রুগী থাকতে পারে, একটা ক্লিনিক, একটা লাইব্রেরী, একটা রিসার্চ সেণ্টার ইত্যাদি। এছাড়া আছে নার্সেস কোয়ার্টার্স, আর একটা ছোট পোলট্রি। স্বামী স্ত্রী থাকতেন হাসপাতালেই একটা ফ্ল্যাটে।

'এই ফ্ল্যাটের বেডরুমে বীথিকাকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায় গত চোদ্দই জানুয়ারী সন্ধ্যেবেলা। ভদ্রমহিলার কলকাতায় আসবার কথা ছিল। রওনা হবার আগে সাজগোজ করে ঠোঁটে লিপস্টিক লাগিয়েছিলেন। লিপস্টিকে পটাসিয়াম সায়ানাইড লাগানো ছিল। মৃত্যুর সময় কেউ কাছে ছিল না।

'এবার ভদ্রমহিলার কথা বলি। ধলা কুৎসিত কাকে বলে জানেন ? ভদ্রমহিলা ছিলেন তাই। যেমন ফর্সা, তেমনি কুৎসিত। পাঁচ ফুট ছয় ইঞ্চি লম্বা, ঘোড়ার মত মুখ, আর তেমনি স্বভাব।

প্রজ্ঞা কমপ্লেক্সের একজনও ভদ্রমহিলাকে পছন্দ করত না। সবাই তাঁকে সহ্য করত একমাত্র অরিজিতের জন্যে। বড়-ডাক্তারবাবুর প্রতি প্রত্যেকের লয়ালটি প্রশ্নাতীত।

'এমন মহিলাকে খুন করতে খুব একটা চমকপ্রদ মোটিভের দরকার হয় না। কিন্তু অরিজিৎ যদি খুনী হয়েই থাকেন, তাহলে তাঁর যে মোটিভ আমরা তদন্ত করে দেখতে পাচ্ছি, সেটা কিন্তু অত্যন্ত চমকপ্রদ। সে সম্পর্কে একটু বিশদভাবে বলা দরকার।

'অরিজিৎ আর বীথিকার জয়েন্ট অ্যাকাউন্টের পাশবই চেক করতে গিয়ে আমরা দেখতে পাই যে গত বছরের এপ্রিল মাসে এবং তার আগের বছরের ফেব্রুয়ারী মাসে দুটি খুব মোটা অঙ্কের টাকা জমা পড়েছে সেখানে। কোত্থেকে যে সেই টাকাগুলো এল, তার খোঁজ করতে গিয়ে আমরা দেখি যে উভয় ক্ষেত্রেই সেই টাকা এসেছে দুজন সুস্থ হয়ে যাওয়া অর্থশালী রুগীর সম্পত্তি থেকে। এই দুজন মৃত্যুর আগে তাঁদের সম্পত্তির একটা বেশ বড় অংশ ডাক্তার অরিজিৎ আর বীথিকা বোসকে দান করে গেছেন। তাঁদের উভয়েরই উইলের বক্তব্য ছিল যে তাঁদের পরিবারের লোকেরা ষড়যন্ত্র করে সম্পত্তি বেদখল করার অসদুদ্দেশ্য নিয়ে তাঁদের পাগল বানিয়ে হাস-পাতালে পাঠিয়েছিল। সেখানে থাকার সময় অরিজিৎ আর বীথিকার নিঃস্বার্থ সেবাপরায়নতার মধ্যে তাঁরা স্বর্গসুখ উপভোগ করেছেন এবং বুঝেছেন যে তাঁদের সত্যিকার আপনার জন ওই দুজন, শয়তান নিকটাত্মীয়েরা নয়। অতএব, তাঁদের সম্পত্তির সিংহভাগ ওই দুজনকেই তাঁরা দান করে গেছেন।

'এরকম ঘটনা যে ঘটে না তা নয়। কিন্তু, আমাদের যেখানে খটকা লাগল তা হচ্ছে যে দুজনেই হাসপাতাল থেকে বেরোনোর ঠিক ছ' মাসের মাথায় মারা গেছেন এবং দুজনেরই মৃত্যুর কারণ এক— কী এক ধরণের জণ্ডিস। তখন আরও খোঁজ করে জানা গেল, এরকম আরও একজন বড়লোক রুগী হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবার

ছ' মাসে মধ্যে মারা যান, একই কারণে। তবে তিনি কোন উইল করে যান নি বা যেতে পারেন নি। এখানে আমরা একটা ফাউল প্লে সন্দেহ করি এবং ডাক্তার বোসের কেস উঠলে এই সন্দেহটার ওপর একটা খুব জোরদার আলোচনা হবে আদালতে।

'এরপর যে ব্যাপারটা আমাদের নজরে পড়ে, তা হচ্ছে যে গত বছরের অগাস্ট মাস থেকে ওই জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট থেকে বড় বড় চেক কেটে অনেক টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে। সেই টাকা তোলেন বীথিকা। কেন, তা ডাক্তার অরিজিৎ বোসের অজানা। তার কারণটা অনুমান করা কিন্তু কঠিন নয়। আমরা জানি যে অন্নদা মিত্র মশাইয়ের মৃত্যুর পর গত পাঁচ বছরে তাঁর দুই ছেলে, রাজমোহন আর রাজকুমার তাঁর বিশাল ব্যবসা লাটে তুলে দিয়ে আপাতত দেউলিয়া হবার উপক্রম করেছে। ওই টাকাগুলো যে ভাইদের প্রতি বোনের সামান্য উপহার তাতে সন্দেহ থাকে না।

'অতএব, পুলিশের সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে ডাক্তার অরিজিৎ বোস একটি সাক্ষাৎ শয়তান। তিনি ষড়যন্ত্র করে বড়লোক রুগীদের সরিয়ে দিয়ে তাদের সম্পত্তি দখল করেছিলেন। বীথিকা তাঁর ওপর বাটপাড়ি করে নিজের ভাইদের সেই টাকা বিলিয়ে দেওয়ায় ক্ষেপে গিয়ে তিনি তাঁকে খুন করে বসেছেন।'

দময়ন্তী মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করল, 'আপনার বিশ্বাস যে এই সিদ্ধান্ত ভুল, তাই না?'

'হ্যাঁ, তাই বটে।'

'কেন? স্রেফ বড়লোকের সম্পর্কে আপনার ব্যক্তিগত ধারণা থেকে, না অন্য কোন কারণ আছে?'

'আছে। প্রথমত লিপস্টিকে সায়ানাইড মাখিয়ে রাখার পেছনে একটা ষড়যন্ত্রের গন্ধ পাচ্ছি। এটা হঠাৎ রাগের মাথায় করা কাজ নয়। তাহলে এমন বোকার মত ষড়যন্ত্র করার কি দরকার ছিল? আগেই বলেছি, ডাক্তার বোস শান্ত প্রকৃতির, কিন্তু মোটেই গাধা

নন। বিশেষত, পুলিশ নিজেই যেখানে তাঁকে ধুরন্ধর শয়তান বলে প্রমাণ করার চেষ্টায় আছে।

'দ্বিতীয়ত, সম্পত্তিগুলো যদি শয়তানী করেই আদায় হয়ে থাকে, তাহলে কোন ক্ষেত্রেই কোন মামলা মোকদ্দমা হয় নি কেন? আত্মীয়স্বজনরা যদি কনটেস্ট করত, তাহলে হয়তো জিতে যেতেও পারত।

'তৃতীয়ত, রাজমোহন আর রাজকুমারের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক অত্যন্ত ভাল ছিল। এখনও আছে। তারা এমনিতে যতই অপদার্থ হোক, অরিজিৎকে দুজনে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করে এবং ভালবাসে। তাদের টাকা নেবার জন্যে বীথিকার লুকিয়ে চুরিয়ে কিছু করার কোন প্রয়োজন ছিল না। আপনি শুনলে আশ্চর্য হবেন, অরিজিতের মামলা চালাবার সব দায়িত্ব নিয়েছে এই দুই ভাই।'

দময়ন্তী জিজ্ঞেস করল, 'দুই ভাই কি বলছে, তারা বোনের কাছ থেকে কোন টাকা পায় নি?'

'হ্যাঁ। পুলিশ অবশ্য তাদের কথা বিশ্বাস করছে না।'

'অর্থাৎ আপনি বলছেন বীথিকার আর একটা গোপন জীবন ছিল এবং সেখানেই রয়েছে তার মৃত্যুর সমাধান, এই তো?'

শিবেন সহাস্যে মাথা নেড়ে বলল, 'হ্যাঁ, একেবারে ঠিক ধরেছেন।'

'তাহলে আপনি নিজে বীথিকা সম্পর্কে আর যা যা জানেন, যা আপনার ডিপার্টমেন্টের সহকর্মীরা জানে না, সেগুলো একটু বলুন।'

শিবেন মাথা নেড়ে বলল, 'আশ্চর্য! আপনি কি করে বুঝলেন যে আমি ব্যক্তিগতভাবে কিছু জানতে পারি?'

'খুব সহজে। প্রথম থেকেই বীথিকার সম্পর্কে আপনি যেসব মন্তব্য করেছেন, তাতে বুঝতে অসুবিধে হয় না যে আপনি তাঁকে তাঁর মৃত্যুর আগে থেকেই জানতেন।'

'ঠিকই। বীথিকা মিত্রকে আমি অনেকদিন থেকেই জানি।

মানে তার বিয়ের আগে থেকেই। আমার পিসীমার বাড়ি অবিনাশ ঘোষ রোডে। সেই পাড়াতেই অন্নদা মিত্তিরের অরিজিন্যাল বাড়ি। পরে বালিগঞ্জে উঠে গিয়েছিলেন। তখন বীথিকার বিয়ে হয়ে গিয়েছে। মহা পাজী মেয়ে ছিল বীথিকা। ওই তো চেহারা, অথচ ঠমকে মাটিতে পা পড়ত না। পাড়াশুদ্ধ সকলের সঙ্গে ঝগড়া, কেউ দু'চক্ষে দেখতে পারত না। ওদিকে আবার নিমফোম্যানিয়াকও ছিল। পাড়ার দুই হ্যাণ্ডসাম দাদার পেছনে লেগেছিল, তারা কেঁদে কূল পায় না। শেষ পর্যন্ত মেডিক্যাল কলেজে পড়ার সময় এক সহপাঠীর সঙ্গে ভাগলবা। অন্নদা মিত্তির খুঁজেপেতে তাদের ধরে নিয়ে এলেন পুরীর এক হোটেল থেকে। তারপর পাশ করার সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার অরিজিৎ বোসের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিলেন।'

'বীথি া কি তাঁর বাবার সবচেয়ে ছোট মেয়ে ছিলেন?'

'ছোট মেয়ে তো বটেই, একটিই মেয়ে। আদর দিয়ে মাথা খেয়েছিলেন অন্নদা মিত্তির।'

'বীথিকার কোন ছেলেপুলে হয় নি?'

'না।'

'কাউকে অ্যাডপ্ট করেছিলেন বা দত্তক নিয়েছিলেন?'

'না।'

'ডাক্তার অরিজিৎ বোসের আত্মীয়স্বজন কে কে আছেন? মানে, নিকট আত্মীয়?'

'ওঁর বাবা আছেন, সুজিত বোস, একসময় তারাচাঁদ বিদ্যাপীঠের হেডমাস্টার ছিলেন। ওঁর মা মারা গেছেন অনেক বছর আগে। এক দাদা আছেন, অভিজিৎ, বসিরহাট মিউনিসিপ্যালিটিতে ওভারসিয়ারের চাকরি করেন। এক বোন আছেন, বিয়ে হয়ে গেছে, থাকেন দুর্গাপুরে বা আসানসোলে কোথাও। তাঁকে এ ব্যাপারে কেউ ডাকে নি।'

'কেন?'

'প্রয়োজন মনে করে নি, তাই।'

'আশ্চর্য।' বলে দময়ন্তী চুপ করে গেল।

শিবেন কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে বলল, 'আচ্ছা, বেশ, অরিজিতের বোনকে না ডাকাটা হয়তো অন্যায়ই হয়েছে। কিন্তু আমার প্রশ্নটার জবাব এখনও পাই নি। ব্যাপারটা আপনি দেখবেন, না দেখবেন না?'

দময়ন্তী হেসে ফেলল। বলল, 'ঠিক আছে, দেখব। ইন্টারেস্টিং ব্যাপার, সন্দেহ নেই। তবে কি জানেন, অরিজিৎকে আপনি যতটা ধোয়া তুলসীপাতা ভাবছেন, ততটা তিনি নন। বীথিকাকে তিনি টাকার লোভে বিয়ে করেছিলেন।'

শিবেন হাত নেড়ে বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমাদের ডিপার্টমেন্টও সেই কথাই বলছে! টাকার লোভে বিয়ে করেছিলেন, টাকার লোভে খুন করেছেন। কিন্তু আমি আপনাকে বলছি, এই সিদ্ধান্ত ঠিক নয়। আপনি একবার অরিজিতের সঙ্গে কথা বলুন, তাহলেই আমি কি বলতে চাইছি, তা বুঝতে পারবেন।'

দময়ন্তী মাথা নাড়ল। বলল, 'না, আমি এখনই অরিজিতের সঙ্গে কথা বলতে চাই না। আমি চাই ওঁর বোনের সঙ্গে কথা বলতে। ব্যবস্থা করতে পারবেন?'

শিবেন হাত উল্টে বলল, 'ঠিক আছে। ব্যবস্থা করা যাবে। আগামী রোববার বিকেল বেলা ভদ্রমহিলাকে নিয়ে আসব এখানে।'

সমরেশ কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কেমন দেখতে রে ভদ্রমহিলাকে?

শিবেন বিরক্ত গলায় বলল, 'কে জানে কেমন! দেখেছি নাকি কোনদিন?'

রোববার বিকেল বেলা অতিথি এলেন চারজন। শিবেন, একজন মহিলা, একজন য়ুনিফর্ম-পরা পুলিশ অফিসার এবং একজন সিপাহী

সাদাসিধে ধুতি-পাঞ্জাবি পরিহিত ভদ্রলোক। ভদ্রমহিলা মোটের ওপর সুন্দরী, তবে বয়েস চল্লিশ পেরিয়েছে। মাথার চুলে পাক ধরেছে, মুখের বলিরেখায় সংসারের পোড়-খাওয়া চিহ্ন, পরণে একটি লালপাড় ধূসর রঙের ধনেখালি শাড়ি আর লাল রঙের ব্লাউজ। পুলিশ অফিসারটি প্রকাণ্ড লম্বা চওড়া, মাথায় টাক, চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা, হাসিখুশি মুখ, কিন্তু চোখ দুটি সজাগ ও তীক্ষ্ণ। ভদ্রলোকটির বয়েস পঞ্চাশের কাছাকাছি, মাথার বেশির ভাগ চুলই পাকা, চোখে সরু ফ্রেমের চশমা, শীর্ণ মুখে উদ্বেগ ও আশঙ্কা।

শিবেন পরিচয় করিয়ে দিল, 'ইনি ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর হেমন্ত কুমার সরকার, এই কেসটার চার্জে আছেন। ইনি ডাক্তার অরিজিৎ বোসের ছোট বোন মিসেস অলকা ঘোষ আর ইনি এঁর স্বামী শ্রীবিকাশচন্দ্র ঘোষ। বিকাশবাবু বার্নপুরে মডার্ন স্টিল কোম্পানীতে অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টে চাকরি করেন।'

শিবেন থামতেই হেমন্ত সরকার বললেন, 'দেখুন, গত বুধবার শিবেনদার সঙ্গে আপনার যে কথাবার্তা হয়েছে, তার কিছু কিছু আমি শুনেছি। মিসেস ঘোষকে জেরা না করা সত্যিই আমাদের ভুল হয়েছিল। এখন, আপনি যদি কিছু মনে না করেন, তাহলে আমি আপনার জেরার সময় উপস্থিত থাকতে চাই।'

হেমন্ত সরকারের কথা শুনে দময়ন্তী একটু গম্ভীর হয়ে গেল। বলল, 'উপস্থিত আপনি অবশ্যই থাকতে পারেন। তবে মিসেস ঘোষকে আমি কিন্তু জেরা করবার জন্যে ডাকি নি। আমার উদ্দেশ্য ওঁর সঙ্গে একটু কথা বলা, কয়েকটা কথা ওঁর কাছ থেকে জানা।'

সরকার হেঁ হেঁ করে হেসে বললেন, 'না, না, মানে হ্যাঁ, তাই তো, কথাই তো বলবেন। মানে, আই অ্যাম সরি, জেরা করাটা আমার ঠিক বলা উচিত হয় নি। মানে, ওই কথাই আর কি—'

দময়ন্তী হেসে ফেলল। বলল, 'হ্যাঁ, কথাই। আমরা বলি, আপনি শুনুন। তবে, তার আগে একটু জলযোগ না করলে তো

চলবে না।'

দময়ন্তী জিজ্ঞেস করল, 'আপনার দাদা, ডাক্তার অরিজিৎ বোসের যখন বিয়ে হয়, তখন কি আপনার বিয়ে হয়ে গিয়েছিল, মিসেস ঘোষ ?'

অলকা মাথা নাড়লেন। বললেন, 'হ্যাঁ, হয়েছিল। অনেক আগেই হয়েছিল। ছোড়দার বিয়ে তো ওর বেশ বেশি বয়সেই হয়। বোধ হয় পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ হবে।'

অ্যাকাউন্ট্যান্ট বিকাশচন্দ্র শুধরে দিলেন। বললেন, 'না, চৌত্রিশ বছর বয়সে। তোমার ছোড়দার বিয়ে হয়েছিল আমাদের বিয়ের সাত বছর বাদে।'

দময়ন্তী মৃদু হেসে আবার অলকাকে প্রশ্ন করল, 'আমাদের দেশের স্ট্যাণ্ডার্ডে এটা বেশি বয়েস সন্দেহ নেই, কিন্তু এত বয়স পর্যন্ত উনি বিয়ে করেন নি কেন ?'

অলকা চুপ করে কিছুক্ষণ ভাবলেন। তারপর বললেন, 'দেখুন, আমরা নিতান্ত মধ্যবিত্ত পরিবার। অভাব অনটনের মধ্যে মানুষ হয়েছি। বাবা ছিলেন স্কুলটিচার, কতই বা আর মাইনে পেতেন। ছোড়দা এই দারিদ্র্য সহ্য করতে পারত না। ওর মধ্যে অনেক উচ্চাশা ছিল, অনেক বড় হবার স্বপ্ন দেখত। কাজেই বিলেত থেকে ফিরে যখন প্র্যাকটিস জমাতে পারল না, তখন অত্যন্ত মুষড়ে পড়েছিল। বিয়েই করবে না স্থির করেছিল।'

'প্র্যাকটিস জমল না কেন ?'

'ছোড়দা যে লাইনে স্পেশালাইজড করেছিল, সে লাইনে পসার জমানো সে সময় বড় সহজ ছিল না। এমনিতেই পাগলের ডাক্তারের কাছে ক'জন রুগী আর যায় ? তার ওপর ছোড়দা তখন নতুন ডাক্তার, ওকে চেনেই বা কে, জানেই বা কে ?'

'আপনার ছোড়দার বিয়ের গল্প কিছু বলুন।'

অলকা আবার কিছুক্ষণ চুপ করে ভাবলেন। তারপর বললেন, 'ছোড়দার বিয়ে হবার খবর আমি বার্নপুরে পাই। বাবা চিঠি লিখেছিলেন। সেটা পড়ে জানা গেল যে, বীথিকার সঙ্গে বিয়ে পাকাই হয়ে গেছে। আমার সঙ্গে পরামর্শ করার সময় ওঁরা পান নি, কারণ অন্নদাবাবুর চাপে পড়ে খুব তাড়াতাড়ি সব কিছু শেষ করে ফেলতে হয়েছে। মেয়ে দেখতে গিয়েছিলেন বাবা, ছোড়দা আর বড়বৌদি। বাবা ওখানেই কথা দিয়ে দিয়েছেন। আমাদের ডেকে পাঠিয়েছেন আশীর্বাদ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্যে। আশীর্বাদের ত্বদিন পরেই বিয়ে।

'আমার খুব তুঃখ আর অভিমান হয়েছিল। কিন্তু না গিয়ে তো পারি না। আমার বড় ছেলের বয়স তখন চার বছর—ওকে নিয়ে আমরা তুজনে বসিরহাটে বড়দার বাড়িতে গিয়ে উঠলুম। বাড়িতে ঢুকে দেখি চারদিক থমথম করছে। উঠোনে বড়দা গম্ভীর মুখে চুপ করে দাঁড়িয়ে আর বারান্দায় বাবা একটা মোড়া পেতে প্রচণ্ড রাগী রাগী মুখ করে বসে আছে। আমরা ঢুকতেই বড়দা আমাকে আর বড়খোকাকে ভেতরে পাঠিয়ে দিল আর ওকে বলল ওখানে থাকতে।

'রাত্রে ওর কাছে সব কথা শুনলুম। শুনে আমার ভীষণ কান্না পেল। ও বলল বড়দা নাকি খবর এনেছে যে বীথিকার স্বভাব-চরিত্র ভাল নয়। কেবল ভাল নয় বললে কম বলা হয়—বেশ খারাপই বলা উচিত। ছোড়দার ঘাড়ে ওই মেয়েকে চাপানো মানে তার সর্বনাশ করা। কিন্তু বাবা এই কথা শুনে ক্ষেপে লাল হয়ে গেছে; বাবা বলছে, এসব তুষ্টু লোকের রটনা। বড়লোকের মেয়েদের নামে পাড়ার বখাটে ছেলেরা এসব কথা বলেই থাকে। যতই যাই হোক না কেন, বীথিকা একজন পাশ করা ডাক্তার; সে কখনো খারাপ হতে পারে না। এই কথায় বড়দার খুব আঁতে ঘা লাগল। তুঃখে, অপমানে প্রতিজ্ঞা করে বসল যে ছোড়দার বিয়েতে কোনরকম অংশই নেবে না। শেষ পর্যন্ত, আমরা তুজনে অনেক বলে কয়ে

বড়দাকে রাজী করাই।'

দময়ন্তী বলল, 'আপনার বড়বৌদি আপনাকে কি বললেন? এ ব্যাপার ওঁর মতামত কি ছিল?

'বড়বৌদি বাবার পক্ষেই ছিল। কারণ বড়বৌদির এক মামা এই সম্বন্ধ এনেছিলেন। তিনি আবার অন্নদাবাবুর অফিসে চাকরি করতেন। শুনেছি অন্নদাবাবু খুব বিশ্বাস করতেন ওঁকে।'

'তারপর কি হল? আপনারা আশীর্বাদে গেলেন?'

'হ্যাঁ, গেলুম। সে এক এলাহী ব্যাপার হয়েছিল। আর, বাবাকে সে কি খাতির! আমার তো বেশ বাড়াবাড়ি বলেই মনে হল। সেই প্রথম ছোটবৌদিকে দেখি। ওই তো ঘোড়ার মত মুখ. সেটা আবার বেঁকিয়ে বসে ছিল। দেখে, ছোড়দার জন্যে দুঃখই হল।'

'আপনার ছোড়দা কোন আপত্তি করেন নি?'

'না। প্রথমে বলেছিল যে বিয়েই করবে না। এই সম্বন্ধটা যখন এল, তখন কিন্তু কোন আপত্তি করল না। বলল, বাবা যা বলবেন, তাই হবে। আসলে অন্নদাবাবুর টাকা দেখে মাথা ঘুরে গেছল। আজ তার শাস্তি ভোগ করছে।'

অলকার কথা শুনে বিকাশচন্দ্র অসন্তুষ্ট মুখে মাথা নাড়লেন। বোঝা গেল স্ত্রীর কথা তাঁর পছন্দ হয় নি। দময়ন্তী সেট লক্ষ্য করল। বলল, আপনি এ ব্যাপারে কিছু বলবেন মিস্টার ঘোষ?'

বিকাশ বললেন, 'দেখুন, আমার মতে ছোড়দার কিন্তু খুব একটা দোষ ছিল না। আপনি সে সময়টার কথা ভাবুন। বিলেত থেকে ফিরে পসার জমাতে পারে নি। দাদার অভাবের সংসারে বোঝার ওপর শাকের আঁটি হয়ে বসেছেন। বিলেত ফিরে যাবেন সে সঙ্গতি পর্যন্ত নেই। সে যে কী ভয়ঙ্কর অবস্থা! সে অবস্থায় ছোড়দার সিদ্ধান্ত খুব একটা অন্যায় হয়েছিল বলে তো আমার মনে হয় না।'

অলকা বললেন, 'তাই বলে টাকার জন্যে বিয়ে করবে?'

'কেন করবে না? টাকার জন্যে লোকে খুন করে, আর বিয়ে করবে না? ব্যাপারটা অন্তত বেআইনী তো নয়। আর রোমান্স? ওসব ছাড় তো! অন্নচিন্তা চমৎকারা, কাতরে কবিতা কুতঃ?'

'থাক, তোমাকে আর সংস্কৃত শ্লোক আওড়াতে হবে না। তাহলে, আশীর্বাদ থেকে ফিরে এসে ব্যাঙ্গার মুখে বসেছিলে কেন? কেন বলেছিলে যে ছোড়দার কপালে দুঃখ আছে?'

'সেটা অন্নদাবাবুর টাকার জন্যে নয়। ছোটবৌদির চেহারার জন্যে।'

দময়ন্তী জিজ্ঞেস করল, 'কেন, চেহারায় কি দেখলেন?'

'দেখুন, ছোটবৌদিকে আপনি এখন শুধু ফোটোগ্রাফে দেখতে পাবেন, কাছ থেকে নয়। সেজন্যে ওঁর কতগুলো বৈশিষ্ট্য আজ আর আপনার জানা সম্ভব নয়। কেবল আমার কথায় আপনাকে বিশ্বাস করতে হবে। ভদ্রমহিলা বাঙালী মেয়ের তুলনায় খুব লম্বা ছিলেন। আর ওঁর সব কিছুই ছিল খুব বড় বড়। যেমন, হাতের সাইজ, পায়ের সাইজ। মুখটা তো···সে যাই হোক, নাক-কানও খুব বড় বড় ছিল। চুল আর চোখ ছিল কটা। হাতে বড় বড় লোম। আমাদের শাস্ত্রে বলে, এ ধরণের মেয়েরা সংসারে অশান্তি আনার জন্যেই জন্মায়।'

'আপনি একথা বিশ্বাস করেন?'

'না, করি না তবে, আমার ছেলের সঙ্গে এ ধরণের চেহারার মেয়ের বিয়ে আমি স্বেচ্ছায় দেব না।'

'চমৎকার! আচ্ছা মিসেস ঘোষ, গত এগারো বছরে ডাক্তার বোস, মানে আপনার ছোড়দা, আপনার কাছে তাঁর বিবাহিত জীবন সম্পর্কে কিছু বলেছেন? কোন দুঃখের কথা বা আনন্দের কথা?'

অলকা মাথা নাড়লেন। বললেন, 'না, কিচ্ছু না। বলার তেমন সুযোগও হয় নি। বিয়ের পর ছোড়দা কেয়াতলাতেই থাকত। বাবাকে সে বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার কথা কোনদিনও বলে নি। আর,

বাবা তো ওর বিয়েয় বছর দুয়েকের মধ্যেই মারা গেলেন। তার পর থেকে আমাদের মধ্যে তেমন আর কোন সম্পর্ক রইল না। ছোড়দা বা ছোটবৌদি কোনদিনও কোনরকম যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করে নি। তবে, কোন নেমন্তন্ন বাড়িতে দেখা হলে খুব ভাল ব্যবহার করত। ওই পর্যন্তই। আসলে, আমরা গরীব আর ছোড়দা দারিদ্র্য সহ্য করতে পারত না। তারপরে তো ওরা নীলকান্তপুরে চলে গেল। তখন থেকে দেখাশুনোও বন্ধ হয়ে গেল।'

'আপনার ছোটবৌদির মৃত্যু-সংবাদ কি ভাবে পেলেন ?'

'বড়দার চিঠিতে। বিস্তারিত খবর পাই বড়বৌদির চিঠিতে।'

'আচ্ছা, আপনার ছোড়দার স্বভাবের একটা দিক আপনার কথায় জানতে পারছি যে উনি দারিদ্র্য সহ্য করতে পারতেন না। এছাড়া অন্য কোন দিক আপনার মনে পড়ে ?'

'ছোড়দা খুব সাজগোজ করতে ভালবাসত। অভাবের সংসারে দামী জামাকাপড় পেত না, কিন্তু অপরিষ্কার বা ইস্ত্রি না করা জামা কখনো পড়ত না। সব সময় ফিটফাট থাকত। তাই বলে আপনি যদি ভাবেন যে খুব স্টাইল করে কায়দা মেরে হাঁটাচলা করত, তা কিন্তু মোটেই নয়। কক্ষণো জোরে কথা বলত না, জোরে হাসত না, অসভ্য বা খারাপ কথা বলত না, অকারণে আড্ডা মারত না।'

বিকাশ বললেন, 'আমিও একটু বলতে চাই। আমি অবশ্য ছোড়দাকে খুব বেশিদিন কাছ থেকে দেখি নি। আমাদের যখন বিয়ে হয়, উনি তখন বিলেতে। ফিরে আসার দেড় বছরের মধ্যেই ওঁর বিয়ে হয়। এর মধ্যে যেটুকু দেখেছি তাতে আমার মনে হয়েছে যে ওঁর মত মেন্টাল ডিসিপ্লিন বাঙালীদের মধ্যে সচরাচর দেখা যায় না। ওঁর সময়ের নড়চড় হয় না, কথার নড়চড় হয় না। ব্যবহার অত্যন্ত মার্জিত, কিন্তু ঘনিষ্ঠ বা গায়েপড়া নয়। আমরা কাছাখোলা বাঙালী, উনি পাক্কা সাহেব।'

সমরেশ বলল, 'অর্থাৎ বাঙালীসুলভ চপলতা আর ঢলাঢলে

সফলতা ওঁর মধ্যে একেবারেই ছিল না, এই তো ?'

'ঠিক বলেছেন। তবে কি জানেন, একটা ব্যাপার আমার খুব খারাপ লাগত। স্ত্রীকে খুশি রাখার জন্যেই হোক বা অন্য যে কোন কারণেই হোক, শ্বশুরমশাইয়ের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করাটা ওঁর উচিত কাজ হয় নি। উনি যে কী কষ্ট করে ছেলেমেয়েদের মানুষ করেছেন, সে কথা ছোড়দা ছাড়া বেশি ভাল করে আর কে জানতে পারে ?'

অলকা বললেন, 'বাবা তাঁর কৃতকর্মের ফল ভোগ করে গেছেন।'

দময়ন্তী বাধা দিয়ে প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা, ওঁদের যে কোন ছেলেপুলে হয় নি, তা নিয়ে কোন দুঃখ বা মনোকষ্টের কথা কি কখনো জানতে পেরেছেন ?'

অলকা মাথা নেড়ে বলল, 'না, কখনো নয়।'

আপনার বড়দার সন্তান আছে ?'

'আছে. একটি ছেলে। ভাল নাম সুরজিৎ, ডাকনাম গালু। এঞ্জিনীয়ারিং পড়ে, ফাইন্যাল ইয়ার।'

'এই সুরজিতের সঙ্গে তার কাকিমার কিরকম সম্পর্ক ছিল ?'

'কোন সম্পর্ক ছিল না। কোনদিন বাড়িতে নেমন্তন্ন করে নি পর্যন্ত।'

'রাজমোহন বা রাজকুমারকে আপনারা চেনেন ?'

'ছোড়দার দুই শালা তো ? মুখ চিনি। ওই পর্যন্ত।'

'আচ্ছা বিকাশবাবু, আপনার কি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউণ্ট আছে ? বা ক্যাশ সার্টিফিকেট ?'

বিকাশ একটু চমকে উঠলেন। বললেন, 'ব্যাঙ্ক অ্যাকাউণ্ট আছে, বার্নপুরের স্টেট ব্যাঙ্কে, তবে তাতে গেয়ে বেড়াবার মত কিছু নেই। ক্যাশ সার্টিফিকেটও আছে—হাজার টাকার।

'ইন্সিওরেন্স করান নি ?'

'করিয়েছি। পনেরো হাজার টাকার। তবে মাঝে মাঝে মনে

৫

হয় না করালেই বোধ হয় ভাল ছিল। কোয়ার্টারলি প্রিমিয়াম দিতে প্রাণ বেরিয়ে যায়।'

'আপনার সন্তান ক'টি?'

'দুটি। বড়টি ছেলে, এবার মাধ্যমিক দেবে। ছোটটি মেয়ে, ক্লাস সিক্সে পড়ে।'

অলকা আর বিকাশ চলে গেলে আর এক প্রস্থ চা এল। হেমন্ত সরকার শিবেনকে সম্বোধন করে বললেন, 'স্যার, এই যে কথাবার্তা হল, এতে কিন্তু আমাদের সিদ্ধান্তে ভুল আছে প্রমাণিত হল না।'

শিবেন বলল, কিরকম?'

'অরিজিৎ বোসের চরিত্র যা তার বোনের মুখেই আমি শুনলুম, তাতে তো তাকে খুব একটা আদর্শ পুরুষ বলে মনে হল না। যে দারিদ্র্য সহ্য করতে পারে না, টাকার লোভে বিয়ে করে গরীব আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করে, তার পক্ষে অসদুপায়ে বড়লোক রুগী মেরে তাঁর সম্পত্তি আত্মসাৎ করা বা অতিরিক্ত খরচ-করা স্ত্রীকে খুন করা কি খুব কঠিন বা অসম্ভব কাজ?'

'না, তা হয়তো নয়। কিন্তু, আমার দুটো প্রশ্নের জবাব দাও তো হেমন্ত। প্রথম, যে লোক অত্যন্ত শিক্ষিত এবং ডিসিপ্লিণ্ড, সে বিষ দিয়ে তার বৌকে মেরে বিষ-মেশানো লিপস্টিকটা সরিয়ে ফেলল না কেন এবং দ্বিতীয়, এমন ভাবে খুন করল না কেন যাতে সেটা স্বাভাবিক মৃত্যু বলে মনে হয়? মনে রেখ, লোকটা ডাক্তার, সে নাকি বাড়ি ফিরে যাওয়া রুগীকে রিমোট কন্ট্রোলে এমন ভাবে মেরেছে যাতে সেটা যে খুন সে বিষয়ে কেবল সন্দেহই করা যায়, কিছুই প্রমাণ করা যায় না।'

'হয়তো রাগের মাথায় খুন করে বসেছে। হয়তো সময় পায় নি।'

'না হেমন্ত, হয়তো হয়তো করে একজনের মাথায় খুনের দায়

চাপিয়ে দেওয়া উচিত নয়। তোমার কাছে সব প্রশ্নের অভ্রান্ত উত্তর থাকতে হবে, কোন কিছুই হয়তো বলে পাশ কাটিয়ে যাওয়া চলবে না।'

হেমন্ত কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন, বাধা দিল দময়ন্তী। প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা, এই যে দুজন বা তিনজন রুগী মারা গেছেন, এঁদের সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়েছেন?'

হেমন্ত বললেন, 'হ্যাঁ, নিয়েছি।' বলে পকেট থেকে একটা নোটবই বের করে সেটা খুলে বলতে লাগলেন, 'প্রথম যাঁর বাড়িতে আমরা গিয়েছিলুম, তাঁর নাম ঈশ্বর ভোলানাথ চক্রবর্তী। বয়েস হয়েছিল ছাপ্পান্ন। ভোলানাথের মস্ত ওষুধের দোকান রাজেন্দ্রলাল অ্যাভিনিউতে, শ্যামবাজারে প্রকাণ্ড বাড়ি, গোবিন্দপুরে বিশাল জমি আর ব্যাঙ্কে অনেক টাকা। কিন্তু নিকটাত্মীয় বলতে এক দূর সম্পর্কের ভাগনে আর দূরতর সম্পর্কের এক মামাতো ভাই। এরা দুজনেই ভোলানাথের পয়সায় মানুষ বা অমানুষ। দ্বিতীয়, রাণী নির্ঝরিণী দেবী, বয়েস ষাট। বাংলাদেশের কোন স্টেটের রাণী ছিলেন। থাকতেন বিদ্যাসাগর রোডে। রাজত্ব না থাকলে কি হবে, এঁর কলকাতায় দুটো বড় বড় বাড়ি, আর গয়না, শেয়ার আর ব্যাঙ্ক ব্যালান্স মিলিয়ে অনেক সম্পত্তি ছিল। এঁর দুই মেয়ে, দুজনেই বিয়ে হয়ে তাদের স্বামীদের সঙ্গে বিদেশে। যেটুকু জানতে পেরেছি, এদের দুজনের কারুর সঙ্গেই নির্ঝরিণী দেবীর সদ্ভাব ছিল না। গত সাত-আট বছরে এরা একবারও মাকে দেখতে আসে নি? দেখাশুনো করত ওঁর এক ভাগনী আর তার স্বামী। এরা দুজনের কেউই খুব সুবিধের লোক ছিল না। আর, তৃতীয় জনের নাম ঈশ্বর শম্ভুচন্দ্র ধাড়া। এঁরও বয়েস হয়েছিল ষাট। ইনিও প্রথম জনের মত ব্যবসায়ী, তবে ছেলেপুলে নাতিনাতনী নিয়ে বিশাল সংসার। থাকতেন বজবজে। স্ত্রী মারা যাবার পর মাথাখারাপের মত হয়েছিল। তখন ছেলেরা তাঁকে নীলকান্তপুরে রেখে আসে।

বছর খানেক মাত্র ছিলেন। অন্য দুজন অবশ্য অনেক বেশিদিন ছিলেন। এঁদের মধ্যে ভোলানাথ উইল করে প্রজ্ঞা মনোবিকলন কেন্দ্রকে গোবিন্দপুরের জমি আর ডাক্তার বোসেদের সাড়ে চার লক্ষ টাকা দান করে গিয়েছিলেন। রাণী নির্ঝরিণী তাঁর বোষ্টমঘাটার বাড়িটা প্রজ্ঞাকে এবং ডাক্তার বোসেদের তিন লক্ষ টাকা দান করে গিয়েছিলেন। শম্ভুচন্দ্র অবশ্য কিছু দিয়ে যান নি।'

'তিনজনেই একই রোগে মারা গিয়েছেন বলছেন। কী রোগ?'

'জণ্ডিস। আমাদের ধারণা ওষুধের সঙ্গে ওই রোগের জীবাণু শরীরে ঢোকানো হয়েছিল।'

'সেরকম কোন ওষুধের সন্ধান কি এঁদের বাড়িতে পেয়েছেন?'

'না। তবে, একটা আশ্চর্য জিনিস আবিষ্কার করেছি।'

'যথা?'

'এঁরা তিনজনেই মৃত্যুর আগে হোমিওপ্যাথিক ওষুধ খেতে আরম্ভ করেছিলেন।'

'ভোলানাথ আর নির্ঝরিণী দেবীর দুটো উইলেই সাক্ষী হিসেবে নিশ্চয়ই একজন করে ডাক্তার আছেন? উনি কি হোমিওপ্যাথ?'

'না। উভয় ক্ষেত্রেই তাঁদের ফ্যামিলি ফিজিশিয়ানরা সাক্ষী হিসেবে সই করেছেন। এবং সেই কারণেই আদালতে উইল দুটোর বিরুদ্ধে কোন মামলা দায়ের করা যায় নি। উভয় ক্ষেত্রেই উইল স্বহস্তে লেখা, ডাক্তার সাক্ষী, অতএব উইলকর্তা যে সুস্থ শরীরে প্রফুল্লচিত্তেই উইল করেছেন, তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না। পাগলের প্রলাপ বলে উড়িয়ে দেবার কোন সম্ভাবনাই নেই।'

'এঁরা বাড়ি ফিরে আসার পর প্রজ্ঞা মনোবিকলন কেন্দ্রের সঙ্গে কোন যোগাযোগ ছিল কি?'

'ছিল। প্রথম দু' মাস পনেরো দিনে একবার এবং তার পরের দু' মাস মাসে একবার করে তাঁদের ওখানে নিয়ে যেতে হত চেক-আপের জন্যে।'

'আচ্ছা, এঁরা হোমিওপ্যাথি কি কোন বিশেষ ডাক্তারের কাছে করাতেন? আপনার বর্ণনায় বোঝা যাচ্ছে, এঁরা তিনজনেই প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ। এঁরা কি ডাক্তারের চেম্বারে যেতেন, না ডাক্তার বাড়িতে আসতেন? যদি চেম্বারে যেতেন, তাহলে তখন কি তাঁদের সঙ্গে কেউ যেত?'

হেমন্ত মাথা চুলকে বললেন, 'এ প্রশ্নগুলো অবশ্য আমরা করি নি। তবে যদি আপনি চান, তাহলে কালই আপনাকে সব জানিয়ে দেব।'

দময়ন্তী বলল, 'শুধু এই ক'টা প্রশ্ন নয়, আরও আছে। কে এঁদের হোমিওপ্যাথের কাছে যেতে উপদেশ দিয়েছে বা ডাক্তার ঠিক করে দিয়েছে? উইল করবার আগে উইলের বয়ান এঁরা নিকটাত্মীয়দের জানিয়েছেন না জানান নি? জণ্ডিসে অসুস্থ হয়ে পড়ার আগে এঁদের ব্যবহার বা চালচলনে কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে কি না? মৃত্যুর আগে, এঁদের আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে কোন তুমুল ঝগড়া বা মনোমালিন্য হয়েছে কি না?'

হেমন্ত মৃদু হেসে খাতা বন্ধ করে বললেন, 'আপনার শেষ প্রশ্নটার উত্তর আমার জানা আছে। এঁরা তিনজনেই প্রচণ্ড খিটখিটে স্বভাবের ছিলেন এবং প্রায় প্রত্যেক দিন ঝগড়াঝাঁটি লেগেই থাকত।'

দময়ন্তী বলল, 'আপনি তো একথাটা জেনেছেন এঁদের আত্মীয়দের কাছ থেকে। বাড়ির ঠাকুর চাকর বা ড্রাইভারদের সঙ্গে কথা বলে দেখুন না। হয়তো নতুন তথ্য পাবেন।'

'আসল কথা কি জানেন, আমরা এই রুগীদের বাড়িতে গেছি তাঁদের মৃত্যুর প্রায় দু বছর বাদে। তাঁদের মৃত্যু যে অস্বাভাবিক, সে কথাটা কিন্তু সন্দেহের পর্যায়ে আছে, কোন প্রমাণ নেই, এমনকি কেউ সেরকম অভিযোগও আমাদের কাছে করেন নি। কাজেই, বাড়ির লোকেদের আমরা বেশি খোঁচাখুঁচি আর করি নি; দেখি,

এবার একটু নাড়াচাড়া দিয়ে কিছু বেরোয় কি না।'

হেমন্ত বিদায় নেবার পর শিবেন বলল, 'কি মনে হচ্ছে বৌদি? ব্যাপারটা বেশ ইন্টারেস্টিং নয়?'

দময়ন্তী হাসল। বলল, 'নিশ্চয়ই, খুব ইন্টারেস্টিং।'

'কি ধারণা হল আপনার? অরিজিৎ বোসই খুনী?'

'আপাতত, সে রকম মনে হওয়ার তো কারণ দেখছি না। তবে, অনেক জায়গায় খটকা আছে। সেগুলোর সদুত্তর না পাওয়া পর্যন্ত কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছনো একেবারেই ঠিক হবে না।'

পরদিন হেমন্ত এলেন একটু রাত্রের দিকে, সঙ্গে একজন ধুতি-পাঞ্জাবি পরিহিত নিরীহদর্শন ভদ্রলোক। শিবেন এসেছিল আগেই। বসে বসে চা খাচ্ছিল আর সমরেশের সঙ্গে দাবা খেলছিল।

হেমন্ত আগন্তুক ভদ্রলোকের সঙ্গে সকলের পরিচয় করিয়ে দিলেন। বললেন, 'এঁর নাম শ্রীবিবেকানন্দ ধাড়া, থাকেন বজবজে। এঁর বাবার নাম ঈশ্বর শম্ভুচন্দ্র ধাড়া। আজ যখন এঁদের বাড়িতে জিজ্ঞাসাবাদ করবার জন্যে যাই, তখন কথায় কথায় আপনার নাম এসে পড়ায় ইনি নিজেই আপনার সঙ্গে কথা বলবেন বলে আমার সঙ্গে চলে এলেন।'

দময়ন্তী হেসে বলল, 'তা বেশ তো। সে তো ভাল কথা। বলুন আপনার কি বলবার আছে।'

বিবেকানন্দ নতমস্তকে চিন্তিত মুখে বসেছিলেন। বললেন, 'দেখুন, আজ থেকে প্রায় বছর দেড়েক আগে আমার বাবার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর কারণ ইনফেকটিভ হেপাটাইটিস যেটা নাকি এক ধরণের জণ্ডিস। আমরা জানি যে জণ্ডিস একটা খারাপ অসুখ, আমাদের ওদিকে মাঝে মাঝেই দেখা দেয় আর আমার বাবা তখন ষাট বছরের বৃদ্ধ। কাজেই তাঁর মৃত্যু কোন অস্বাভাবিক ব্যাপার

বলে আমাদের কখনোই মনে হয় নি। এই ঘটনার প্রায় বছর খানেক বাদে যখন পুলিশ আমাদের বাড়িতে আসে, তখন আমরা বিরক্তই হয়েছিলুম এবং আমাদের সন্দেহ হয়েছিল যে আমাদের অকারণে কোন ঝামেলায় জড়িয়ে ফেলার চেষ্টা হচ্ছে। কিন্তু, তারপর গত ছ' মাস ধরে আমি এ ব্যাপারটা নিয়ে ভেবেছি এবং আমার মনে কতগুলো সন্দেহ দেখা দিয়েছে। এই সন্দেহগুলো নিয়ে অবশ্যই আমার পুলিশের সঙ্গে কথা বলা উচিত ছিল। কিন্তু কি জানেন, ওঁরা চলেন বাঁধা-ধরা রাস্তায়, আমার প্রশ্নগুলো ঠিক যেভাবে গ্রহণ করা উচিত, হয়তো তাঁরা সেভাবে নেবেন না, এই ভেবে আমি চুপ করে ছিলুম। আজ যখন ওঁরা এলেন এবং আপনার নাম করলেন, তখন আমি চলেই এলুম। আপনি যদি দয়া করে আমার কথাগুলো শোনেন।'

দময়ন্তী বলল, 'নিশ্চয়ই শুনব বিবেকানন্দবাবু। এঁরা থাকলে আপনার বলতে কোন আপত্তি নেই তো?'

বিবেকানন্দ একটু চিন্তা করে বললেন, 'না, আপত্তি নেই, যদি আমি যা বলব তা রেকর্ড করা না হয়।'

হেমন্ত মাথা নেড়ে বললেন, 'আপনার কোন কথা রেকর্ড করা হবে না, আপনি নির্ভয়ে বলুন। এমনকি আমি কোন নোটও নেব না। এই আমার কলম বন্ধ করলুম।'

বিবেকানন্দ ম্লান হাসলেন। বললেন, 'ঠিক আছে। বলছি। দেখুন বজবজে আমাদের বহু পুরুষের বসবাস জমিজমা আছে, টাকাপয়সাও কম নেই। মস্ত যৌথ পরিবার আমাদের। আমার বাবা এ বাড়ির মেজোকর্তা? বড়কর্তা আমাদের জ্যাঠামশাই, আশির কাছাকাছি বয়েস, কিন্তু এখনো শক্তসমর্থ আছেন, দোর্দণ্ড প্রতাপ তাঁর। আমার বাবা ছিলেন এমনিতে চুপচাপ, শান্ত প্রকৃতির, কিন্তু রেগে গেলে তাঁর কোনরকম জ্ঞানগম্যি থাকত না। তখন তাঁকে কেউ সামলাতে পারত না, এমনকি জ্যাঠামশাই পর্যন্ত না।

একমাত্র আমার মা পারতেন। তাঁর একটা অদ্ভুত ব্যক্তিত্ব ছিল যার সামনে সবাইকে নম্র হতে হত। বছর চারেক আগে তাঁর মৃত্যু হয়। তারপর থেকে বাবা একেবারে পাল্টে যান। যেভাবেই হোক, তাঁর ধারণা হয়েছিল যে মার মৃত্যুর জন্যে তিনিই দায়ী। তাছাড়া, মা চলে যাওয়ায় ওই বিশাল সংসারেও তিনি নিজেকে নিঃসঙ্গ মনে করতে থাকেন। ফলে, ক্রমশ তিনি নিজেকে সমস্ত কাজকর্ম থেকে গুটিয়ে নেন, বাড়ি থেকে বের হওয়া বন্ধ করে দেন এবং সকলের সঙ্গে কথা বলাও প্রায় বন্ধ করে দেন। আমার স্ত্রীকে নাকি একবার বলেছিলেন যে এই ভাবে তিনি প্রায়শ্চিত্ত করছেন। এরপর থেকে আস্তে আস্তে তাঁর মধ্যে মাথাখারাপের লক্ষণ দেখা দিতে থাকে। তখন আমরা কয়েকজন মানসিক রোগের ডাক্তারকে দেখাই এবং পরে তাঁদেরই একজনের রেকমেণ্ডেশনে বাবাকে নীলকান্তপুরে ভর্তি করে দিয়ে আসি। উনি ওখানে ছিলেন বছর খানেক। তারপর ডাক্তার বোস ওঁকে সুস্থ বলে সার্টিফিকেট দেওয়ায় আমরা ওঁকে বাড়িতে ফেরৎ নিয়ে আসি।

'বাড়িতে আসার পর তিনি কিন্তু ভালই ছিলেন। অসংলগ্ন কথা বা চালচলন একেবারেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এমনকি তিনি কাজকর্মও করতে শুরু করেছিলেন। হঠাৎ ওঁর একবার পেটের অসুখ করল। আমরা ডাক্তার ডাকলুম। বললেন, হোমিওপ্যাথি করবেন, অ্যালোপ্যাথি ওষুধ ওঁর বড্ড কড়া লাগে। এটা আমাদের একটু আশ্চর্য লাগল, কারণ অসুস্থ হবার আগে পর্যন্ত উনি হোমিও-প্যাথি দুচক্ষে দেখতে পারতেন না, হোমিওপ্যাথদের ঠগ জোচ্চোর ইত্যাদি বলে গালাগাল করতেন। তবু, ব্যাপারটা আমরা খুব একটা সীরিয়াসলি নিই নি, কারণ বয়েস হলে অনেক লোকেরই অনেক রকম ধারণা পাল্টে যায়। তখন আমরা আমাদের পাড়ার সবচেয়ে নামকরা হোমিওপ্যাথকে নিয়ে এলুম। বাবা তাঁকে দেখাতে অস্বীকার করলেন। বললেন, ওঁর চেনা একজন ডাক্তার আছেন, তাঁকেই চান

দেখাবেন। ডাক্তারের নাম রজার ওয়ালটন, অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান, বসেন পার্ক সার্কাসে। এটাও আমাদের খুব অদ্ভুত লাগল। ব্যবসা সূত্রে আমাদের মাঝে মাঝে কলকাতায় আসতে হয় বটে, কিন্তু ওঁর অসুখেরও অনেক আগে থেকেই এদিকে আসা বন্ধ ছিল। তাহলে এই অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান হোমিওপ্যাথের সঙ্গে ওঁর পরিচয়ই বা হল কখন আর আস্থা গড়ে ওঠবারই বা সময় হল কখন? যা হোক, তবু আমরা তাঁকে বাধা দিই নি, তার একটা কারণ ছিল বাধা দিলে না আবার হিতে বিপরীত হয়।

'এই ডাক্তারের কাছে উনি বার পাঁচ-ছয় গিয়েছেন। তারপর হঠাৎ একদিন উনি আমাদের অর্থাৎ ওঁর ছেলেমেয়েদের, ডেকে পাঠালেন। বললেন, আমি উইল করতে চাই, তোমরা ডাক্তার প্রামাণিক, আমাদের ফ্যামিলি ফিজিসিয়ান আর অ্যাডভোকেট নিতাই মল্লিককে খবর দাও। এঁরা দুজনেই আমাদের বাড়ির খুব কাছেই থাকেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই এঁরা দুজনেই এসে উপস্থিত হলেন। বাবা তখন এঁদের সামনে একটা ফুলস্ক্যাপ কাগজে স্বহস্তে একটা উইল লিখলেন। তারপর সেটা নিতাইকাকার হাতে দিয়ে বললেন, পড়ো, পড়ে সাক্ষীর জায়গায় সই করো। নিতাইকাকা উইলটা পড়লেন, পড়ে ভয়ানক গম্ভীর হয়ে গেলেন। তারপর সেটা ডাক্তারকাকার হাতে দিয়ে বললেন, তুমি অন্যায় করছ শম্ভু, ভয়ানক অন্যায় করছ। ডাক্তারকাকাও সেই কথাই বললেন। তখন জানা গেল, বাবা তাঁর ব্যাঙ্কে গচ্ছিত সমস্ত টাকা, সব শেয়ার আর আচিপুরের দু' বিঘে ধানজমি নীলকান্তপুরের হাসপাতালকে লিখে দিয়েছেন। সেটা যদি এমনি করতেন তাহলে মানবিকতার খাতিরে সেটা হয়তো মেনে নেওয়া যেত। কিন্তু, সেই সঙ্গে এরকম কাজ করার কারণ হিসেবে তিনি তাঁর ছেলেমেয়েদের দায়ী করেছেন। বলেছেন, তিনি নাকি কখনোই পাগল ছিলেন না। সম্পত্তির লোভে আমরা তাঁকে পাগল বানিয়েছি, অতএব তার শাস্তি স্বরূপ তিনি

তাঁর স্বোপার্জিত সমস্ত সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করেছেন আমাদের। ওঁর প্রকৃত বন্ধু নাকি নীলকান্তপুরের ডাক্তার বোসেরা।

'নিতাইকাকা কিন্তু সাক্ষীর জায়গায় তক্ষুণি সই করলেন না। বললেন, আমি এক্ষুণি এই কাগজে সই করছি না। আগে সমস্ত ব্যাপারটা আমাকে খতিয়ে দেখতে হবে। তুমি যা দান করতে চাইছ, সেটা করবার সত্যি সত্যি তোমার কোন অধিকার আছে কিনা সেটা বিচার করে তারপর যা করবার করা যাবে। আমি আইনের লোক হয়ে এমন একটা দলিলে সই করতে পারি না যেটা আদালতে গ্রাহ্য নাও হতে পারে।

'বাবা অনেক পেড়াপেড়ি করলেন, কিন্তু নিতাইকাকা টললেন না। ডাক্তারকাকাও ওঁকেই সমর্থন করলেন। তারপর কাগজটা নিয়ে দুজনে উঠে পড়লেন। সেদিন রাত্রি থেকেই বাবা অসুস্থ হয়ে পড়েন। আর সুস্থ হন নি। ওঁর মৃত্যুর পর নিতাইকাকা আমাদের বলেছিলেন যে কেউ ওঁকে এই উইল করবার জন্যে ব্রেন ওয়াশ করেছিল। আমাদের নামে ওই সব খারাপ কথা লেখবার একটা কারণ হচ্ছে যে আমরা মামলা করতে গেলে আদালতের সহানুভূতি বা অনুকম্পা আমাদের বিরুদ্ধে যাওয়ারই সম্ভাবনা বেশি হত। কিন্তু, রহস্য হল যে এরকম ব্রেন ওয়াশ করল কে?

'এছাড়া, আর একটা রহস্য হল, উনি হোমিওপ্যাথিক ওষুধ খেতেন গোপনে। এক একবারে পাঁচ-ছ' শিশি ওষুধ আনতেন, প্রত্যেকটি শিশি শেষ হওয়া মাত্র ভেঙে আস্তাকুঁড়ে ফেলে দিতেন। এটা যে কেন করতেন, তার কারণ তখনও বুঝি নি, আজও জানি না।

'এখন, ব্যাপার হচ্ছে, এই রহস্যগুলোর কোনটাই খুব ভয়ঙ্কর রকমের কিছু নয়। সবগুলো মিলিয়ে দেখলে মনে হয় কোথায় যেন একটা গণ্ডগোল আছে। হয়তো, বাবার মৃত্যুটা যতটা স্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছে, ততটা সম্ভবত নয়।'

বিবেকানন্দ চুপ করলেন। দময়ন্তী গভীর মনোযোগ দিয়ে ওঁর প্রতিটি কথা শুনছিল এখন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'রজার ওয়ালটনকে আপনি দেখেছেন?'

'আমি দেখি নি। আমাদের ড্রাইভার রতন দেখেছে। সে বলেছে, সেই সাহেব ডাক্তার নাকি বেঁটেখাটো, চোখে নীল কাঁচের চশমা, মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, সব সময় স্যুট বুট পরে থাকেন। বয়েস চল্লিশের ওপরে।'

আপনি দেখেন নি কেন? ওঁকে সঙ্গে করে নিয়ে যান নি কখনও?'

'না। উনি সাধারণত সপ্তাহের মাঝে কোন দিন দুপুরবেলা যেতেন। তখন আমাদের সকলেরই কাজকর্ম থাকে। আর রতন আমাদের বহুদিনের লোক, ছোটবেলা থেকে আমাদের পরিবারে মানুষ, সে আমাদেরই একজন বলতে পারেন। কাজেই, ওর সঙ্গে যাওয়ায় কারুরই কোন অসুবিধে বা আপত্তির কোন কারণ থাকতে পারে না।'

হেমন্ত উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, 'বেঁটে, ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, স্যুটেড-বুটেড—আগে বলেন নি তো?'

'আপনি তো আমার কাছে সাহেব ডাক্তারের চেহারার বর্ণনা চান নি।'

'সে কথা ঠিক। কিন্তু আপনি তো ডাক্তার অরিজিৎ বোসকে দেখেছেন। তাঁর চেহারার সঙ্গে এই বর্ণনার কি অস্বাভাবিক মিল নয়?'

'হ্যাঁ, মিল আছে ঠিকই। কিন্তু ডাক্তার অরিজিৎ বোসকে রতনও দু-একবার দেখেছে। সাহেব ডাক্তার আর অরিজিৎ বোস এক লোক হলে ও ঠিক বুঝতে পারত।'

'ছাই পারত। টাক মাথায় উইগ পরলে আর চোখে নীল কাঁচের চশমা লাগালে একটা মানুষের চেহারা আমূল পাল্টে যেতে·

পারে, সে কথা জানেন ?'

দময়ন্তী প্রশ্ন করল, 'সাহেব ডাক্তারের ঠিকানা জানেন ?'

বিবেকানন্দ বললেন, 'বাড়ির ঠিকানা তো জানি না। চেম্বারের ঠিকানা জানি। চোদ্দ নম্বর রহিম ওসমান লেন।'

'আচ্ছা, যে হোমিওপ্যাথিক ওষুধ আপনার বাবা খেতেন, সেগুলো কখনও দেখেছেন ?'

'দেখেছি। ছোট ছোট শিশি ভর্তি জলের মত ওষুধ। মনে হয় মাদার টিংচার হবে।'

'আপনার বাবা বাড়ি ফিরে আসার পর নীলকান্তপুর থেকে কেউ দেখা করতে এসেছে কখনও ?'

'না, কখনও নয়।'

'এমন কোন লোক এসেছে, যাকে আপনারা কেউ চিনতেন না ?'

'সেটা তো বলা কঠিন। উনি বাইরের ঘরে থাকলে অনেক লোকই আসত ওঁর সঙ্গে দেখা করতে। তাদের কেউ চেনা, কেউ বা নয়। তাছাড়া, সব সময় তো ওঁর সঙ্গে লোক থাকত না।'

'উনি মর্নিং ওয়াক করতেন ?'

'করতেন। সেটা ওঁর থেরাপির একটা অঙ্গ ছিল। খুব ভোরে উঠে বেরিয়ে যেতেন। ঘণ্টা দেড়েক বাদে ফিরে আসতেন।'

'সঙ্গে কেউ যেত না ?'

'প্রথম প্রথম যেত। পরে, উনি একাই যেতেন। অত ভোরে কেউ উঠতে চাইত না। উনিও একা যাওয়াই পছন্দ করতেন।'

'উনি কি হাসপাতালে যাওয়ার আগেও মর্নিং ওয়াক করতেন ?'

'করতেন।'

'এ উইল লেখার অব্যবহিত আগে কি আপনাদের সঙ্গে ওঁর কোনরকম ঝগড়া হয়েছিল ?'

'হয়েছিল। আমার ছোট ভাইয়ের স্ত্রীকে খুব বকাবকি করে-

ছিলেন তার আগের দিন সন্ধ্যেবেলায়। ছোট ভাই তার প্রতিবাদ করে। বাবা তাকে রাগের মাথায় কতগুলো এমন কথা বলেন, যেগুলো বলা তাঁর উচিত হয় নি। তখন আমি এবং আমাদের ছোট বোন তার প্রতিবাদ করি। তখন তিনি রাগে দিশেহারা হয়ে আমাদের এই বলে শাসান যে আমাদের সকলকে উনি এমন শাস্তি দেবেন যা নাকি আমরা কোনদিনও ভুলতে পারব না।'

'তাহলে তো ওঁর উইল করা এবং তাতে আপনাদের বঞ্চিত করা খুব একটা রহস্যময় ব্যাপার বলে তো মনে হয় না। ওঁর দিক থেকে ব্যাপারটা যুক্তিপূর্ণ বলা চলে, তাই না ?'

'না, ঠিক তা বলা চলে না। আগেই বলেছি, রেগে গেলে ওঁর কোন জ্ঞান থাকত না। কাজেই, এরকম ঝগড়া ঘন ঘন না হলেও মাঝে-মধ্যে হতই। সেদিন এমন কিছু হয় নি যাতে ওই উইল লেখা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। তবু সেটা যদি মেনে নেওয়া যায়, তাহলেও প্রশ্ন থেকে যায় যে উইলের বয়ানটা উনি এমন ভাবে লিখলেন কি করে যাতে সেই উইল আদালতে কনটেস্ট করা কঠিন হয়। উনি আইন যে ভাল জানতেন তা বলা যায় না আর এমন কিছু লেখা-পড়াও শেখেন নি যে নিজে নিজেই অমন ভাষায় একটা উইল লিখে ফেলবেন।'

'কতদূর লেখাপড়া করেছিলেন ?'

'ম্যাট্রিক পাশ করেন নি। খুব সম্ভব ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়েছিলেন।'

'আপনারা ভাইবোন ক'জন ? তাঁরা কে কি করেন ?'

'পাঁচজন। তিন ভাই, দু' বোন। এক বোনের বিয়ে হয়ে গেছে। সে শ্যামপুকুরে থাকে। ছোট বোনের বিয়ে বাকি। আমি বড়। পারিবারিক ব্যবসা দেখি ; মেজ ভাই আর্মিতে আছে—অফিসার। ছোট ভাই দীননাথ কলেজে পড়াত। ছেড়ে দিয়ে আমার সঙ্গে কাজ শুরু করতে যাচ্ছে।'

বিবেকানন্দ চলে গেলে হেমন্ত বিজয়গর্বে শিবেনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'স্যার, এই রঞ্জার ওয়ালটন আর অরিজিৎ বোস যে একই ব্যক্তি, সে বিষয়ে আর আপনার কোন সন্দেহ আছে ?'

শিবেন ভাবলেশহীন মুখে সিগারেট টানতে টানতে বলল, 'আছে, প্রচুর সন্দেহ আছে। আগে আইডেণ্টিফাই করাও, তারপর নিঃসন্দেহ হওয়া যাবে।'

দময়ন্তী এই বাক্যালাপে বাধা দিয়ে বলল, 'হেমন্তবাবু, আপনার অন্য ছুটো বাড়িতে ইনভেস্টিগেশনের ফলাফল তো আমাকে জানালেন না ?'

হেমন্ত আবার ব্যাগ খুললেন। বললেন, 'হ্যাঁ, এই যে। রেজাল্ট খুব ইণ্টারেস্টিং। প্রথমে ধরুন, নির্ঝরিণী দেবী। ইনিও এক সাহেব হোমিওপ্যাথের কাছে যেতেন। পার্ক সার্কাসে। ডাক্তারের নাম অবশ্য ওঁর ভাগনীর মনে নেই। গাড়িতে যেতেন। ড্রাইভার বলল, রাস্তার নাম রহিম ওসমান লেন। ওঁকে যে কে এই ডাক্তারের নাম রেকমেণ্ড করেছিল তা কেউ জানে না। উইল করবার আগের দিন রাত্রে ভাগনী আর তার হাজব্যাণ্ডের সঙ্গে ওঁর তুমুল ঝগড়া হয়েছিল ঝি চাকর আর ড্রাইভারের সামনে। উইলে সই আছে সলিসিটার হৃদয়রঞ্জন গাঙ্গুলী আর ডাক্তার প্রতাপ ভাদুড়ীর। আপনি তো জানেন, তুজনেই খুব বিখ্যাত লোক, অত্যন্ত ব্যস্ত। এঁদের সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা করেছিলুম, কিন্তু একদিনের নোটিসে দেখা করা সম্ভব হয় নি। যদি বলেন তো কাল একবার চেষ্টা করে দেখতে পারি।

'এরপর ভোলানাথ চক্রবর্তী। ইনি ওঁর ভাগনের সঙ্গে ডাক্তারের কাছে যেতেন। একই ডাক্তার, একই ঠিকানা। ডাক্তার রুগী দেখতেন একা, তখন কাছে কেউ থাকত না। এঁর একটা ইনফর-মেশন বেশ অদ্ভুত। ডাক্তারের চেম্বারে ওঁরা যখন যেতেন, তখন

সেখানে একমাত্র একজন বেয়ারা গোছের লোক ছাড়া অন্য কোন রুগী কখনও দেখা যেত না। এর কারণ হিসেবে ভোলানাথ অবশ্য বলতেন যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে রুগীরা আসে, সাহেব ডাক্তার তো, কাউকে অপেক্ষা করতে হয় না।'

দময়ন্তী হাসল। বলল, 'বেশ, এই ডাক্তারের ব্যাপারটা মোটামুটি বোঝা যাচ্ছে। কেবল এই রজার ওয়ালটনটি কে সেটা জানা প্রয়োজন। সে ব্যাপারে কি কোন খোঁজখবর নিয়েছেন?'

'লোক পাঠিয়েছি আজ। রিপোর্ট কাল পাওয়া যাবে।'

'উইলে কার কার সই আছে?'

'ভোলানাথের উকিল সহদেব রায় আর ডাক্তার বিমল দাশগুপ্তের। সহদেব রায়ের সঙ্গে দেখা করেছি। উনি বললেন, 'এরকম উইল করে ভোলাবাবু উচিত কাজই করেছেন। দেখলুম, ওঁর দুজন সংগ্রহের ওপরেই ভদ্রলোক মহা খাপ্পা। বিশেষত ভাগনেটির ওপর। বললেন, সে নাকি একটা ক্রিমিন্যাল, সোশ্যাল প্যারাসাইট, আরও কত কি। ওকে যা দিয়েছেন, তাও দেওয়া উচিত হয় নি।'

'ভাগনে কি করে?'

'কিছুই করে না। বড়লোক মামা থাকলে করবার দরকারই বা কি?'

'তাহলেও একটু ডিটেলস জেনে বলবেন? ভোলানাথের মামাতো ভাই আর নির্ঝরিণীর ভাগনীজামাই সম্পর্কেও একটু খোঁজখবর চাই।'

হেমন্ত প্রশ্রয়ের হাসি হাসলেন। বললেন, 'যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই—সেইরকম ব্যাপার? ঠিক আছে, বলছেন যখন খোঁজখবর নেওয়া যাবে। কাল বাদে পরশু আসব। তার পরদিন ছুটি আছে। একটু সন্ধ্যে করেই আসব।'

দময়ন্তী মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

শিবেন ধরাচুড়ো পরেই ঘরে ঢুকল। বলল, 'অফিস থেকে

সোজা আসছি, বাড়ি যাই নি। হেমন্তও এখুনি আসবে। আর রমলার আমার ওপর অর্ডার আছে আজ রাত্রে আপনাদের আমাদের বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার। রাত্রের খাওয়াটা আজ ওখানেই।'

দময়ন্তী সহাস্যে বলল, 'আমি জানি। রমলা দুপুরবেলা ফোন করেছিল।'

শিবেন সমরেশকে বলল, 'তুই আবার অফিস থেকে ফিরে একগাদা জলখাবার খেয়ে রাখিস নি তো? তোর জন্যে রমলা স্পেশাল মাংসের বন্দোবস্ত করেছে। না খেলে তোর কপালে দুঃখ আছে।'

সমরেশ বলল, 'স্পেশাল মাংস? সর্বনাশ! ভাগ্যিস কাল অফিস নেই।'

বলতে বলতেই হেমন্ত এসে উপস্থিত হলেন। ধপাস করে সোফায় বসে খাতা খুলে ফেললেন। বললেন, 'আপনি যা যা জানতে চেয়েছিলেন, তার প্রায় সমস্ত ইনফরমেশনই জোগাড় করে এনেছি। কোনটা দিয়ে শুরু করব, বলুন?'

দময়ন্তী বলল, 'ডাক্তার রজার ওয়ালটন, আর কে?'

'ডাক্তার রজার ওয়ালটন ভাগলবা। তাঁর কোন পাত্তাই নেই, চেম্বারে তালা ঝুলছে। বাড়িওলার কাছে এখনও দু' মাসের ভাড়া জমা আছে, তারপর সে নোটিশ দেবে, বলেছে। কিন্তু দেবে কাকে? রজার সাহেব তাকে নিজের যে ঠিকানা দিয়েছিলেন, সেটা একেবারেই ভুয়ো। ওরকম কোন ঠিকানা কলকাতা শহরে নেই।'

'বাড়িওলার নাম কি? কোথায় থাকে?'

'নাম আবদুল লতিফ নুরুদ্দিন, ওই চোদ্দ নম্বর রহিম ওসমান লেনেই থাকেন। তিনতলায়। ডাক্তারের চেম্বার দোতলায়। একতলায় অনেকগুলো দোকান।'

'দোতলাটা কি পুরোটাই ডাক্তার ভাড়া নিয়েছিলেন?'

'না, আধখানা। সেদিকে দুটো ঘর। অন্যদিকে একটা আলাদা

আছে।'

দময়ন্তী প্রশ্ন করল, ওই ডাক্তার সম্পর্কে বাড়িওলা কি বলল?'

'বলল যে বছর তিনেক আগে এক ভদ্রলোক ওর কাছে এসে ফ্ল্যাটটা ভাড়া নেন। এক দালাল ওঁকে নিয়ে এসেছিল। তখন ওকে বলা হয়েছিল যে এই ডাক্তার বিলেত থেকে পাশ টাশ করে কলকাতায় ফিরে এসে চেম্বার খুলে বসতে চান। সপ্তাহে দু'চারদিন বসবেন। এক বছরের ভাড়া অগ্রিম দেন। ব্যস, এই পর্যন্ত। ডাক্তারকে বাড়িওলা দু-চারবার দেখেছে, সামান্য দু'একটা কথা হয়েছে, তার বেশি কিছু নয়।'

'বেশ, এবার ভোলানাথ আর নির্ঝরিণীর আত্মীয়দের কথা বলুন।'

'প্রথমে বলছি নির্ঝরিণীর ভাগনী আর স্বামীটির কথা। ভাগনীর নাম মঞ্জুলা, খুব চাপা স্বভাবের, কথা কম বলেন, কিন্তু চোখের দৃষ্টি দেখলে বুকের রক্ত শুকিয়ে যায়। আমার তো মনে হয়েছে, নিঃশব্দে হেন কর্ম নেই যা ওই মহিলা করতে পারেন না। খুনখারাবি পর্যন্ত। বয়েস তিরিশের ওপর, কিন্তু কমবয়সী বলে মনে হয়। সোজা কথায়, আমি কখনো গায়ে পড়ে ওই মহিলার সঙ্গে কাজিয়া করতে যাব না, এই বলে দিলুম।'

'লেখাপড়া? কোন কাজকর্ম করতেন বা করেন?'

'বি-এ পাশ। কাজকর্ম কিছু করেন না। স্বামী আর মামী, এই নিয়েই আছেন।'

হেমন্তর রসিকতায় কেউ হাসল না। দময়ন্তী বলল, 'এবার স্বামীটির কথা বলুন।'

'হ্যাঁ, স্বামীর নাম পঙ্কজ রায়চৌধুরী, কিন্তু খুব একটা সার্থকনামা বলা চলে না। বরং উল্টোটাই বলা যায়। পূর্ববঙ্গের কোন জমিদার বংশে জন্ম। এখন মোটামুটি মামীশাশুড়ির অন্নদাস। লেখাপড়া শেখেন নি। নানারকম ব্যবসা করতে গিয়ে ক্রমাগত লসই

খেয়েছেন। আপাতত পুরোন গাড়ি কেনাবেচার ব্যবসা করছেন, তবে সেটাও টলটলায়মান। নানারকম নেশা আছে বলে মনে হল। নানারকম রোগও নিশ্চয়ই আছে। ফলে, চল্লিশ বছর বয়েসে দেখলে মনে হয় যেন পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছেন।

'এরপর আসছি ভোলানাথের মামাতো ভাইয়ের কথায়। এঁর নাম সোমনাথ ভট্টাচার্য। বয়েস তিরিশের একটু ওপরে হবে। নবকার্তিকের মত চেহারা। এককালে পাড়ায় মস্তান বলে বেশ সুনাম বা দুর্নাম ছিল, কয়েকবার হাজতবাসও করেছেন। শুনেছি ইদানীং মতিগতি একটু ফিরেছে। কাজেকর্মে মন হয়েছে, চালচলন কিছু সভ্যভব্য হয়েছে।'

'কি কাজ করেন ইনি?'

'ওষুধের ব্যবসা করেন। কিছুদিন দাদার দোকানে বসেছিলেন, সেখান থেকেই বোধ হয় আইডিয়া পান। তারপর এখন কয়েকটা ছোট-বড় কোম্পানীর এজেন্ট। তারাতলা অঞ্চলে একটা গোডাউনও ভাড়া নিয়েছেন। মোটের ওপর নেহাৎ মন্দ নেই। তবে শুনেছি দাদার মতই চণ্ডাল রাগ, ক্ষেপে গেলে মানুষ থাকেন না।'

'ভদ্রলোকের গাড়ি আছে?'

'আছে। একটা পুরোন অ্যাম্বাসাডর। তবে বেশ ভাল কণ্ডিশন। এই গাড়ি নিয়েই ডাক্তারের কাছে বড়মামাকে নিয়ে যেতেন ওঁদের ভাগনে।'

'এরপর ভাগনের কথা বলুন।'

'ভাগনেটি তার ছোটমামার মতই পাড়ার মস্তান ছিল, কিন্তু তার থেকে আর কোনরকম পদোন্নতি হয় নি, এখনও তাই রয়ে গেছে। শ্যামল রায়কে পাড়ার সবাই যথাসাধ্য এড়িয়ে চলে। এঁর বেশ কয়েকবার হাজতবাসের অভিজ্ঞতা আছে, মামার জোরে ছাড়া পেয়ে এসেছেন এতদিন। কাজকর্ম কিছুই করে না। মাঝখানে সিনেমায় নেমেছিল, সুবিধে হয় নি।'

'বয়েস কত এর? চেহারা?'

'এরও বয়েস তিরিশের কাছাকাছি। সোমনাথের চেয়ে সামান্য ছোট হবে। চেহারা সোমনাথের মত অত সুন্দর না হলেও কাছাকাছি।'

'একবার হৃদয়রঞ্জন গাঙ্গুলী আর ডাক্তার প্রতাপ ভাদুড়ীর সঙ্গে কথা বলবেন? ওঁরা কি বলেন জানতে পারলে ভাল হত।'

'ঠিক আছে। তাই হবে। তবে দু-একদিন দেরি হতে পারে।'

গাড়িতে উঠে শিবেন বলল, 'যাওয়ার পথে একবার চোদ্দ নম্বর রহিম ওসমান লেনটা ঘুরে যাব নাকি?'

দময়ন্তী সহাস্যে বলল, 'তাহলে তো খুব ভালই হয়।'

'তা তো বুঝতেই পারছি। হেমন্তর দেখা যে আপনার খুব একটা পছন্দ হয় নি তাতে তো কোন সন্দেহই নেই।'

'না, না, তা নয়। হেমন্তবাবুর কাজ তো কিছু খারাপ নয়। তবে কি জানেন, যে যুগে রাজারা কান দিয়ে দেখতেন, সে যুগেও তাঁরা কিন্তু মাঝে মাঝেই ছদ্মবেশে বেরিয়ে পড়তেন স্বচক্ষে রাজ্যের অবস্থা দেখবার জন্যে।'

'হুঁ, তা তো বটেই। কিন্তু, কি জানেন? এত রাতে ওখানে কোন লোকজন পাওয়া যাবে কিনা বা বাড়ির দরজা খোলা পাওয়া যাবে কিনা, সে ব্যাপারে আমার সন্দেহ আছে।'

সমরেশ বলল, 'এত রাত মানে? সবে তো সাড়ে ন'টা। এটা কি একটা রাত হল?'

শিবেন বলল, 'তোর কাছে হয়তো হল না। কিন্তু অনেকের কাছেই এটা অনেক রাত।'

কিন্তু গাড়ি যখন রহিম ওসমান লেনে পৌঁছলো, তখন দেখা গেল যে শিবেনের সন্দেহ নিতান্তই অমূলক। রাস্তাটা লেন বটে, কিন্তু মোটেই কোন সরু এঁদো গলি নয়। যথেষ্ট চওড়া। অনেক

দোকান, তাদের বেশির ভাগই বন্ধ। কিন্তু পানের দোকান, চায়ের দোকান আর রেস্টুরেন্টগুলো খোলা, রাস্তায় অনেক লোক আর প্রচুর শব্দ যার বেশির ভাগই আসছে একটা ফুটপাথের ক্যাসেটের দোকানের তারস্বর স্পীকার থেকে।

চোদ্দ নম্বর বাড়িটা তিনতলা। মাঝখানে সিঁড়ি, দুপাশে ফ্ল্যাট। একতলার একদিকে একটা দর্জির দোকান, অন্যদিকে একটা পাম্পসেট এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতির শোরুম। দুটোই বন্ধ। দোতলার পুরোটাই অন্ধকার। তিনতলায় আলো জ্বলছে। একতলার সিঁড়ির দরজাটা খোলা।

শিবেন বাড়ির সামনে গাড়ি রাখল।

দময়ন্তী জিজ্ঞেস করল, 'বাড়ির ভেতরে এখন ঢোকাটা বোধ হয় উচিত হবে না, না?'

শিবেন মাথা নাড়ল। বলল, 'না। উচিত হবে না। তারওপর, আবার য়ুনিফর্ম পরে আছি। এটার আবার একেকজনের ওপর একেকজনের এফেক্ট হয়, জানেন তো?'

দময়ন্তী হাসল। বলল, 'তা আর জানি না? তারওপর, হেমন্তবাবু কালই এসে জিজ্ঞাসাবাদ করে গেছেন। কাজেই, আজকে বোধ হয় আমাদের ফিরে যাওয়াটাই শ্রেয় হবে। তবে, জায়গাটা কেমন সেটা জানবার ইচ্ছে ছিল, সেটা জানা গেল।'

সমরেশ জিজ্ঞেস করল, 'জায়গাটা কেমন, মানে?'

'মানে নির্জন বা অন্যরকম, এই আর কি।'

এই কথার মধ্যে একজন প্রৌঢ় মুসলমান ভদ্রলোক আস্তে আস্তে গাড়িটার দিকে এগিয়ে এলেন। ভদ্রলোক বেঁটেখাটো, দোহারা চেহারা, মাথাজোড়া টাক, মুখে কাঁচাপাকা চাপ দাড়ি, পরণে গেরুয়া খদ্দরের পাঞ্জাবি আর ঢোলা পাজামা।

নিচু হয়ে শিবেনকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কাউকে খুঁজছেন কি? ওঃ, আপনি দেখছি পুলিশ।'

শিবেন বলল, 'হ্যাঁ, আমি পুলিশই বটে। আচ্ছা, ওই বাড়িতে বাড়িওলা যিনি থাকেন, তাঁকে আপনি চেনেন? তাঁর নাম বোধ হয় আবদুল লতিফ নুরুদ্দিন।'

ভদ্রলোক মাথা নাড়লেন, 'চিনি। আমিই আবদুল লতিফ। কী ব্যাপার বলুন তো? আপনারাও কি ওই ওয়ালটনের সম্পর্কে খোঁজ খবর করতে এসেছেন নাকি? কি করেছে কি লোকটা?'

আবদুল লতিফ হয়তো আরও প্রশ্ন করতেন, কিন্তু তার আগেই গাড়ির তিনজন আরোহী বেরিয়ে এসে তাঁকে নমস্কার করায় তা আর পারলেন না। দময়ন্তীর পরিচয় পেয়ে তিনি যে ভয়ানক আশ্চর্য হয়ে গেছেন তা তাঁর মুখের অবস্থা দেখেই পরিষ্কার বোঝা গেল। মিনমিন করে বললেন, 'চলুন, বাড়ির ভেতরে যাই।'

দময়ন্তী বলল, 'না, না, এখন আপনাকে আর বিরক্ত করব না শুধু যদি দয়া করে ডাক্তার ওয়ালটনের সম্পর্কে কিছু বলেন।'

আবদুল লতিফ বললেন, 'কি আর বলব? ওকে আমি দেখেছি বোধ হয় সাত-আট বারের বেশি নয়। রোজ তো আসত না, মাঝে মাঝে আসত। রুগী প্রায় ছিলই না। হয়তো অন্য কোথাও সে লোকটার চেম্বার ছিল। তবে আমার এখানে চেম্বারে ভিড় টিড় কখনো দেখি নি। ওর একটা বেয়ারা ছিল, ববি রোজারিও, নূরপুরে বাড়ি, সে আমাকে মাঝে মাঝে ভাড়া দিয়ে যেত।'

'আপনি কি কখনো ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলেছেন?'

'বলেছি। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে নামতে বা এই ফুটপাথে।'

'কোন অস্বাভাবিক কিছু কখনো লক্ষ্য করেছেন কি? চেহারায় বা চালচলনে বা কথাবার্তায়?'

'নাঃ, কিচ্ছু না। তবে সাধারণ অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের তুলনায় লোকটা বেশ ভদ্র আর মার্জিত ছিল। অবশ্য, তা তো হবেই—শত হলেও ডাক্তার তো।'

'শুনেছি লোকটা খুব বেঁটে ছিল। তাই কি?'

'না, না, মোটেই বেঁটে ছিল না। এই সমরেশবাবুর তুলনায় হয়তো বেঁটে, আমাদের তুলনায় একেবারেই নয়। কে বলেছে আপনাদের?'

'ওর রুগী শম্ভুচন্দ্র ধাড়ার ড্রাইভার।'

'ও: রতন? ও তো বলবেই। তাকে দেখেন নি বুঝি? তাল-গাছের মত লম্বা।'

'রতনকে আপনি চেনেন?'

'চিনি না? শম্ভুবাবুকে নিয়ে ডাক্তারের চেম্বারে ঢুকিয়ে দিয়ে আমার কাছে এসে বসত আর দুনিয়ার আষাঢ়ে গপ্পো জুড়ে দিত। আচ্ছা, এই ডাক্তারটা কি করেছে? খুনটুন করেছে নাকি?'

'সেইটে তো সঠিক বোঝা যাচ্ছে না। আপনার কি ধারণা, লোকটা খুন করতে পারে?'

'পারে। লোকটাকে আমার ভাল লাগত না। খুব হাসিখুশি ছিল ঠিকই, কিন্তু হাসিটা পরিষ্কার ছিল না। আসলে কি জানেন, ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি আর চোখে কালো চশমা দেখলেই যেন কেমন কেমন মনে হয়।

খাওয়াদাওয়ার পর শিবেনের বসার ঘরে কথা হচ্ছিল। শিবেন বলল, 'একটা জিনিস বোঝা গেল যে ডাক্তার ওয়ালটন সমরেশের চেয়ে খাটো, আবদুল লতিফের চেয়ে লম্বা। অর্থাৎ পাঁচ চার থেকে পাঁচ এগারোর মধ্যে। কিন্তু পাঁচ আট থেকে পাঁচ এগারো বাদ দেওয়া যেতে পারে, কারণ রতন যতই তাল গাছের মত লম্বা লোক না কেন, এরকম হাইটের লোকেদের সে কখনোই বেঁটে বলবে না। আমার ধারণা রজার সাহেবের উচ্চতা পাঁচ চার থেকে পাঁচের মধ্যে। বড়জোর মেরে কেটে সাড়ে পাঁচ।'

সমরেশ বলল, 'ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, কালো চশমা, অপরিষ্কার হাসি, সব সময় স্যুটবুট পরা। নির্ঘাৎ ছদ্মবেশ। তুমি কি বল?'

দময়ন্তী অন্যমনস্ক ভাবে বলল, 'হতে পারে। তবে আমি কিন্তু সে কথা ভাবছি না। আমার আশ্চর্য লাগছে যে রহিম ওসমান লেন বেশ একটা জনবহুল জায়গা আর ডাক্তার ওয়ালটন আবদুল লতিফ সাহেবের সঙ্গে সিঁড়িতে বা ফুটপাথে দেখা হলে হেসে হেসে কথা বলেছেন।'

শিবেন আর সমরেশ মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। তারপর শিবেন বলল, 'আর কি কি ব্যাপারে আপনার আশ্চর্য লাগছে ?'

দময়ন্তী মৃদু হাসল। বলল, 'লক্ষ্য করে দেখুন, যে দুজন তাঁদের সম্পত্তি নীলকান্তপুরকে দান করে গেছেন এবং আর একজন যিনি তা করতে যাচ্ছিলেন, তাঁদের কেউই কিন্তু তাঁদের আশ্রিতদের ঘরছাড়া করেন নি যদিও তাঁদের ওপর রাগের বশেই এঁদের উইল করা।

'ভোলানাথ, নির্ঝরিণী বা শম্ভুচন্দ্র—এঁদের কারুর সঙ্গেই বাড়ি ফিরে আসার পর নীলকান্তপুরের বিশেষ যোগাযোগ ছিল না। যেটুকু ছিল, সেটা তাঁদের আত্মীয়দের সামনেই ছিল, কোন গোপনীয়তা ছিল না। অথচ, কেউ এঁদের ডাক্তার ওয়ালটনের নাম রেকমেণ্ড করেছিল। কিভাবে করেছিল ?'

শিবেন জিজ্ঞেস করল, 'আপনার কি ধারণা যে এই ওয়ালটনই এঁদের আত্মীয়দের বিরুদ্ধে কুচিন্তা, উইল করায় কুযুক্তি আর বিষাক্ত ওষুধ সাপ্লাই করত ?'

'হ্যাঁ, আমার ধারণা অনেকটা সেরকমই বটে। কিন্তু কে এই রজার ওয়ালটন ? কে হতে পারে ? আচ্ছা, নূরপুরে ববি রোজারিওর সন্ধান চালানো যায় ?'

'যায়। কালই লোক পাঠাচ্ছি। লোকাল থানায়ও খবর নিচ্ছি। যদিও সুবিধে বিশেষ হবে বলে মনে হয় না।'

'আমারও মনে হয় না। একবার আত্মীয়দের সঙ্গে দেখা করা যাবে ?'

'যাবে। চলুন, কাল ভোলানাথের বাড়ি যাওয়া যাক। রোববার

আছে, ভাইটিকে হয়তো পাওয়া যাবে। ভাগনের অবশ্য বাঁধা রোববার তাঁহা অন্যান্য দিন। সকালবেলাই যাওয়া যাবে।'

'বেশ, তাই চলুন।'

শিবেন মাথা চুলকে বলল, 'আর একটা কথা বলব ?'

'বলুন।'

'খুব লম্বা কোন মেয়েকে ছেলেদের পোশাক পরালে তাকে তখন কিন্তু বেঁটে পুরুষমানুষ বলে মনে হয়।'

দময়ন্তী হেসে উঠল। বলল, 'হ্যাঁ, তাই হয় বটে।'

শ্যামবাজারে ভোলানাথ চক্রবর্তীর বাড়ি। মাঝখানে উঠোন ঘিরে চারদিকে অসংখ্য ঘর নিয়ে তিনতলা বাড়ি। একতলাটা গোডাউন, উঠোন জুড়ে প্যাকিং বাক্সের সমারোহ। দোতলাটা সম্পূর্ণ আর তিনতলায় আংশিক ভাড়া। বাকি অংশটায় থাকতেন ভোলানাথ। সেখানে পাঁচটা ঘর। একটা বসবার, বাকি চারটে শোবার।

বসবার ঘরটা প্রকাণ্ড, স্যাঁতসেঁতে আর একটু অন্ধকার। একদিকে মাত্র দুটো জানলা এতবড় ঘরের পক্ষে যথেষ্ট আলো-হাওয়া ঢোকাতে পারে না। মেঝেয় অতি প্রাচীন একটা কার্পেট, তার ডিজাইন আজ কারুর বোঝা দুঃসাধ্য, কতকাল যে পরিষ্কার হয় না কে জানে। দেওয়ালে কতগুলো অতি প্রাচীন ছবি। তাদের অবস্থাও ওই কার্পেটেরই মত, কার বা কিসের ছবি বোঝবার উপায় নেই। ঘরের একপাশে একটা অতি প্রাচীন অতিকায় সোফাসেট আর মার্বলটপ সেন্টার টেবিল, অন্যপাশে একটা আইভরি ইনলেড টেবিল ঘিরে পাঁচটা উঁচু ব্যাকরেস্টওলা কারুকার্য করা চেয়ার।

অতিথি তিনজন এই চেয়ারেই বসেছিল, সাহস করে ওই সোফায় আর বসে উঠতে পারে নি। বাকি দুটো চেয়ার দখল করে বসেছিল ভোলানাথের মামাতো ভাই সোমনাথ আর ভাগনে শ্যামল। এদের দুজনেরই পরনে সাদা পাঞ্জাবি আর পাজামা।

হেমন্ত ঠিকই বলেছিলেন, দুজনেই অত্যন্ত সুদর্শন, তবে শ্যামল উদ্ধত, দুর্বিনীত আর সোমনাথ দৃশ্যত শান্ত, ঠাণ্ডা মাথার লোক।

শ্যামল বলছিল, 'কেন আপনারা বারবার আমাদের বিরক্ত করছেন, বলুন তো? বড়মামা মারা গেছে অফিসে, ডাক্তার দাশগুপ্ত যতই ফালতু ডাক্তার হোক না কেন, কোনরকম গোলমাল থাকলে ঠিক ধরতে পারত। কিন্তু সেও ডেথ সার্টিফিকেট দিয়েছে চুপচাপ।'

সোমনাথ বলল, 'তুই চুপ কর শ্যামল। আচ্ছা, ব্যাপারটা কি বলবেন? ছোড়দা মারা গেছে অনেকদিন হল। তারপর থেকে অনেকবার আপনারা এসেছেন, আমাদের সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়েছেন কিন্তু খোলসা করে একবারও বলছেন না যে কেন এসব করছেন। কখনও বলছেন, ছোড়দার মৃত্যু নাকি স্বাভাবিক নয়, মানে কেউ তাকে খুন করেছে। হাস্যকর কথা। ডাক্তার বলেছে স্বাভাবিক মৃত্যু, মৃতদেহ দাহ করা হয়ে গেছে, এখন এসব কথা বলার কোন মানে হয়? আবার কখনও বলছেন, ডাক্তার মিসেস বোসের মার্ডারের সঙ্গে ছোড়দার মৃত্যুর সম্পর্ক আছে! সেটা আরও হাস্যকর কথা, কারণ ছোড়দা মারা গেছে ওই মার্ডারের বহু আগে। তাহলে সেই মার্ডারের সঙ্গে তার সম্পর্ক থাকে কিভাবে?'

শিবেন বলল, 'দেখুন, আপনার আমাদের ওপর অসন্তুষ্ট হওয়া ন্যায় নয়। আসলে কি জানেন, অনেকগুলো রহস্য জট পাকিয়ে রয়েছে। আপনাদের একটু সাহায্য পেলে সেই জট ছাড়াতে আমাদের একটু সুবিধে হয়।'

'আর কি ভাবে আপনাদের সাহায্য করব বলতে পারেন? আপনাদের সব প্রশ্নের উত্তর তো আমরা দিয়ে দিয়েছি! আরও কিছু বাকি আছে?'

'সামান্য কিছু বাকি আছে।' বলল দময়ন্তী, 'আপনাদের কয়েকটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন করলে কোন আপত্তি থাকবে কি?'

'নিশ্চয়ই থাকবে। নীলকান্তপুর না ধাপধাড়া গোবিন্দপুর

কোথায় এক মহিলা ডাক্তার খুন হলেন, আর তাঁর মেন্টাল হোমের এক মৃত রুগীর আত্মীয় হয়ে আমাকে পার্সোনাল প্রশ্নের জবাব দিতে হবে, এটা খুব বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না ?'

দময়ন্তী হাসল। বলল, 'হুঁ', তা যে হচ্ছে না, তা নয়। ঠিক আছে। আমাদের ফিরে যাওয়াটাই বোধ হয় এখন বাঞ্ছনীয়। কেবল, যাওয়ার আগে একটা প্রশ্ন করতে চাই। ইচ্ছে হলে উত্তর দেবেন, না হলে দেবেন না।'

সোমনাথ গম্ভীর মুখে বলল, 'প্রশ্ন আপনি নিশ্চয়ই করবেন এবং উত্তরও আমাকে দিতেই হবে। উত্তর দিতে রিফিউজ করলে হয়তো আমাকেই খুনী বলে সন্দেহ করতে শুরু করবেন।'

দময়ন্তী হাসতে হাসতেই মাথা নাড়ল। বলল, না, না, ব্যাপারটা অতদূর গড়াবে না। যাই হোক, আমার প্রশ্নটা হল, একতলায় একটা গোডাউন থাকতেও আপনি তারাতলায় আর একটা গোডাউন ভাড়া নিয়েছেন কেন ?'

উত্তর দিল শ্যামল। বলল, 'এ বাড়ির গোডাউনগুলো বড়মামার ছিল। ছোটমামা যখন ব্যবসা শুরু করে, বড়মামা তখন ওকে ওটা ব্যবহার করতে অ্যালাউ-ই করল না। তাই তো…

গাড়িতে উঠে শিবেন বলল, 'এখানকার কাজ তো বেশ তাড়াতাড়িই হয়ে গেল। যাবেন নাকি বিদ্যেসাগর রোডে এখনই ? বেশি দূরে তো নয়। যেতে বড়জোর দশ মিনিট লাগবে।'

দময়ন্তী সম্মতি জানাল।

বিদ্যাসাগর রোড বেলগাছিয়ায়। বেশ চওড়া রাস্তা, দুপাশের বাড়িগুলো অনেক জমি নিয়ে তৈরি। একমাত্র ঢোকার মুখে একটা প্রকাণ্ড ফ্ল্যাটবাড়ি ছাড়া বাকি সবগুলোই বেশ সুদৃশ্য।

রাণী নির্ঝরিণীর বাড়িটা দোতলা, সামনে বাগান, পেছনেও অনেকটা জমি আছে। গেটের থামে শ্বেতপাথরের ফলকে লেখা

আছে 'এস্টেট অফ মহারাজা অফ হীরাগঞ্জ'।

'হীরাগঞ্জটা আবার কোথায় ?' সমরেশ জিজ্ঞেস করল।

শিবেন গাড়ির দরজা লক করতে করতে বলল, ইস্ট পাকিস্তানে কোথাও ছিল। খুব সম্ভব রাজসাহীতে।'

নুড়ি পাথর ছড়ানো রাস্তা দিয়ে কড়মড় আওয়াজ করতে করতে তিনজনে ভেতরে ঢুকল। শব্দ শুনে একতলার বারান্দায় যিনি বেরিয়ে এলেন, তিনি অভ্যাগতদের দেখে খুব একটা পুলকিত হয়েছেন বলে মনে হল না। ভদ্রলোক হাড়-জিরজিরে রোগা, গাল-ভাঙা, চোখ গর্তে বসা, চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে, অনেকটা ছাগলের মত, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, পরণে একটা আধময়লা গেঞ্জি আর গোলাপী রঙের স্লীপিং পাজামা। দময়ন্তীর সর্বাঙ্গে একটা অশ্লীল দৃষ্টি বুলিয়ে মুখ বেঁকিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'কে আপনারা ? কী চান ?'

শিবেন সকলের পরিচয় দিল। তাতে ভদ্রলোকের মুখের বিরক্তি আরও ঘনীভূত হল। বললেন, 'মেয়েছেলে গোয়েন্দা ? সঙ্গে পুলিশ ! তা, আমার সঙ্গে কি ? এই সাতসকালে ?'

শিবেন বলল, 'আমরা আপনার মামীশাশুড়ির মৃত্যুর ব্যাপারে কিছু খোঁজখবর নিতে এসেছি পঙ্কজবাবু।'

'আবার কিসের খোঁজখবর ? হয়ে গেছে তো একপ্রস্থ। যত্তো ঝামেলা। মশাই, আমার মামীশাশুড়ি অনেকদিন হল সগ্‌গে গেছেন। নিজেও বেঁচেছেন, আমাদেরও বাঁচিয়েছেন। আবার তাঁকে নিয়ে টানাটানির কি দরকার ?'

'কে হায় হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালবাসে ?' জনান্তিকে বলল সমরেশ।

কথাটা কিন্তু কানে গেল ভদ্রলোকের। বললেন, 'ঠিক বলেছেন। বাঃ, দাদা। আপনার তো দেখছি দিব্যি কবিতা টবিতা আসে, অ্যাঁ ! পুলিশের হৃদয়ে কাব্যি ? ভাবাই যায় না।' বলে একগাদা হলদে এবড়োখেবড়ো দাঁত বের করে হাসলেন।

সমরেশ বলল, 'আমি মশায় পুলিশ টুলিশ নই। আমি হচ্ছি এই মহিলার দরোয়ান।'

'দরওয়ান? বলেন কি? ভাগ্যবান লোক মশাই আপনি, খাসা চাকরিটা জোগাড় করেছেন। যদি কখনও ছাড়ার কথা ভাবেন তো আমাকে খবর দেবেন, আমি হচ্ছি একজন ক্যাণ্ডিডেট।' বলে পুনরায় হলদে দন্তবিকাশ করলেন।

দময়ন্তী এই বাক্যালাপে বাধা দিল। বলল, 'আমরা কি ভেতরে গিয়ে কথাবার্তা চালাতে পারি?'

বিনয়ে অবনত হয়ে পঙ্কজ বললেন, 'বিলক্ষণ! ভেতরে আসবেন বৈকি। মহিলাদের পঙ্কজ রায়চৌধুরী কক্ষণো বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখে না। তার ওপর সঙ্গে পুলিশ। ধুলো পায়ে বিদেয় করলে যে কী আতান্তরে পড়ব তা কি আর আমি জানি না ভেবেছেন?'

শিবেন আরক্ত মুখে কিছু বলতে যাচ্ছিল, বাধা দিল দময়ন্তী। নিঃশব্দে তিনজন পঙ্কজের পেছনে পেছনে বাড়ির ভেতরে ঢুকল। ড্রইংরুমটা অনেকটা বাংলা সিনেমায় যেরকম দেখা যায়, সেইরকম। একটা চওড়া সিঁড়ি, তার গোড়ায় সোফাসেট পাতা, সিঁড়ির রেলিংয়ের পাশে একটা স্ট্যাণ্ডার্ড ল্যাম্প, মাথার ওপরে একটা দর্শনীয় ঝাড়লণ্ঠন। সোফাসেটের মাঝখানে একটা সেণ্টার টেবিলের ওপর একটা বিলিতি হুইস্কির বোতল আর একটা গেলাস শোভা পাচ্ছে। গেলাসে তখনও কিছু তরল পদার্থ বিদ্যমান।

পঙ্কজ অতিথিদের সোফায় বসিয়ে পুনশ্চ হলদে দাঁত বের করে বললেন, 'হেঁ হেঁ, মানে, সকালবেলাতেই মদ্যপান করছিলুম, সে কথা যেন ভেবে বসবেন না। আসলে, কাল রাতে একটু বেশি হয়ে গিয়েছিল কিনা, তাই তার খোঁয়াড়ি ভাঙছিলুম আর কি।' বলে একটা চেয়ার টেনে একপাশে বসলেন। তারপর অলস ভঙ্গিতে একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন, 'বলুন, কীভাবে আমি আপনাদের সাহায্য করতে পারি।'

দময়ন্তী বলল, 'আমরা আপনাকে এবং আপনার স্ত্রীকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই। তার উত্তর পেলে উপকৃত হব।'

পঙ্কজ নাটকীয় ভাবে মুখে বিষণ্ণ ভাব এনে বললেন, 'অবশ্য, অবশ্য। তবে প্রশ্নগুলো কি আমাদের একসঙ্গে করবেন? আমাকে আলাদা আড়ালে করলে হত না?'

দময়ন্তী নির্বিকার মুখে বলল, 'হ্যাঁ, আপনাকে আলাদাই প্রশ্ন করা হবে। আমরা আড়ালে কোথায় যেতে পারি, বলুন, সেখানেই যাওয়া যাবে। আমাদের প্রশ্নগুলো আপনার স্ত্রীর না শোনাই বাঞ্ছনীয়।'

এইবার পঙ্কজের মুখে অকৃত্রিম উদ্বেগের ছায়া পড়ল। বললেন, 'কেন? আমার মামীশাশুড়ির মৃত্যুর সঙ্গে আমার কিসের সম্পর্ক, অ্যাঁ, যে সে সম্বন্ধে কথা আমার স্ত্রী শুনতে পাবে না? এ ব্যাপারে আমাকে ফাঁসানোর ধান্দা? বটে?'

'ফাঁসানো মানে? কী ভাবে ফাঁসানো?'

পঙ্কজ ব্যাকুল ভাবে এদিক ওদিক তাকালেন। 'না, মানে, ফাঁসানো মানে...'

বাধা এল সিঁড়ির ওপর থেকে। একটা নারীকণ্ঠ হিসহিস করে উঠল, 'চুপ কর, গাধা কোথাকার। মদ খেলে মাথা ঠিক রাখতে পারো না তো খাও কেন? একদম মুখ না খুলে চুপ করে বসে থাকো।'

সেই কথার ছোবলে পঙ্কজের সমস্ত শরীরটা যেন কুঁকড়ে গেল। নারীকণ্ঠের অধিকারিণীটি এবার তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এলেন। ইনি অবশ্যই মঞ্জুলা রায়চৌধুরী, নির্ঝরিণীর ভাগনী। আঁটসাঁট শরীর, গৌরবর্ণা, সুন্দরী। নিচে নামার আগে একটু প্রসাধনও করে নিয়েছেন মনে হচ্ছে। কিন্তু চাপা পাতলা ঠোঁটে এবং ছোট ছোট চোখে এমন একটা ঠাণ্ডা কাঠিন্য যে মনে হয় না যে কেউ কখনো সাহস করে এর সঙ্গে ঠাট্টা ইয়ার্কি করবার চেষ্টা করতে

পেরেছে।

মঞ্জুলা দময়ন্তীর সামনে দাঁড়িয়ে একটু অবজ্ঞার ভঙ্গিতে নিচু গলায় বললেন, 'আপনার নাম আমি শুনেছি। আপনি যা জিজ্ঞেস করার আমাকে করতে পারেন। আমি মঞ্জুলা রায়চৌধুরী, হীরাগঞ্জ এস্টেটের আমিই উত্তরাধিকারিণী।'

দময়ন্তী মৃদু হেসে মাথা নাড়ল। বলল, 'ধন্যবাদ। আপনার মামীমার মৃত্যু যে স্বাভাবিক নয়, তাঁকে যে খুন করা হয়েছে, সেকথা কি আপনার জানা আছে?'

পুলিশ সেই রকমই বলেছে বটে। প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত, আমি জানি না।'

'আপনার মামীমা পার্ক সার্কাসে এক হোমিওপ্যাথের কাছে যেতেন। কে তাঁকে তাঁর নাম রেকমেণ্ড করেছিল?'

'আমি জানি না।'

'সেটা খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার। রানী নির্ঝরিণীকে আপনারা দেখাশুনো করতেন, নিশ্চয়ই একজন না একজন সব সময়েই তাঁর কাছে থাকতেন। অথচ কে তাঁকে একজন কলকাতায় সদ্য-আসা ডাক্তারের নাম জানালো, সেটা আপনারা জানেন না?'

'মামীমার কাছে সব সময়েই আমি বা আমার স্বামী বসে থাকতুম, আপনার এ ধারণা ভুল। মামীমার একজন নাইট নার্স আর একজন আয়া ছিল। আমাদের পক্ষে চব্বিশ ঘণ্টা তাঁর কাছে বসে থাকা সম্ভব ছিল না।'

'তা তো বটেই। আচ্ছা, এই নার্স বা আয়া আপনি কোত্থেকে পেয়েছিলেন? প্রজ্ঞা মনোবিকলন দিয়েছিল কি?'

'না। আয়াটিকে পেয়েছিলুম আমাদের পাড়ার এক নার্সিং হোম থেকে।'

'কি নাম সেই নার্সিং হোমের? ঠিকানা জানেন?

'জানি। এই রাস্তার মুখে একটা বড় ফ্ল্যাটবাড়ি আছে, তার

বাসবদত্তা। তার দোতলায় একটা নার্সিং হোম আছে, নাম ডঃ তালুকদার'স ক্লিনিক অ্যাণ্ড নার্সিং হোম।'

'বেশ। আর নার্স? তাকে কোথায় পেয়েছিলেন?'

একটু চিন্তা করলেন মঞ্জুলা। তারপর বললেন, 'আমার ঠিক মনে নেই। অনেকদিন আগেকার কথা। আমাদের কোন বন্ধু বোধ হয় দিয়েছিলেন।'

'আপনাদের কি অনেক বন্ধু?'

'আছেন কয়েকজন।'

'তাঁদের মধ্যে কে হতে পারেন? মনে করতে পারছেন না?'

'না।'

'আপনি কি শম্ভুচন্দ্র ধাড়া বা ভোলানাথ চক্রবর্তীকে চিনতেন?'

'না।'

'আপনাদের বাড়িতে যে আয়া কাজ করতেন, তাঁর নাম কি?'

যদ্দুর মনে পড়ে লীলা হালদার।'

আপনাদের ড্রাইভার যে আপনার মামীমাকে পার্ক সার্কাসে নিয়ে যেত, তার সঙ্গে একটু কথা বলা যাবে?'

'না, তাকে আমরা বিদেয় করে দিয়েছি।'

'তার ঠিকানা জানেন?

'না।'

'আপনার মামীমা যে উইল করে গেছেন, আদালতে তার বিরুদ্ধে কোনরকম মামলা করবেন না?'

'না, করে কোন লাভ নেই। উনি আটঘাট বেঁধেই উইল করেছেন। পায়ে পা দিয়ে উইল করার ঠিক আগের দিন প্রচণ্ড ঝগড়া করেছেন। উকিল আর ডাক্তার দিয়ে সাক্ষীর সই করিয়েছেন। যা গেছে, তা তা গেছেই। মামলা করতে গেলে যা আছে, সেটুকুও যাবে।'

'আপনার কি মনে হয় যে এই উইল করার পেছনে কোন

ষড়যন্ত্র কাজ করছে ?'

'না। আমার তা মনে হয় না। উনি যা করেছেন তা স্বাভাবিক করেছেন। অন্য কেউ ষড়যন্ত্র করে করিয়েছে, তা হতে পারে না।'

'আপনি কি আপনার মামীমাকে খুব শ্রদ্ধা বা ভক্তি করতেন ?'

প্রশ্নটা শুনে পঙ্কজ গলার মধ্যে হেঁচকির মত একটা শব্দ করলেন, মঞ্জুলা কোন কথাই বললেন না।

অতঃপর ডঃ তালুকদার'স ক্লিনিক অ্যাণ্ড নার্সিং হোমে শ্রীমতী লীলাবতী হালদার। মোটাসোটা কালোকোলো মহিলা, বয়েস তিরিশ থেকে পঞ্চাশ যা খুশি হতে পারে। তার অনর্গল বাক্য-স্রোতের ভেতর থেকে যে কটি তথ্য বের করা গেল, তা হচ্ছে—এক, পঙ্কজ রায়চৌধুরী একটি অত্যন্ত পাজী বদমাশ লোক। দুই, তাঁর স্ত্রী মঞ্জুলা একটি অত্যন্ত পাজী বদমাস মহিলা, তিন, ওঁদের ড্রাইভার হরিপদ একটি অত্যন্ত পাজী বদমাস লোক এবং চার, রানী নির্ঝরিণী একটি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর চিন্তার বাইরে পাজী বদমাশ মহিলা। এই সব ভয়ানক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের বাইরে আর কিছুই লীলাবতীর কাছ থেকে জানা গেল না। এমন কি নাইট নার্স সম্পর্কেও নয়।

বাসবদত্তা থেকে বেরিয়ে শিবেন গাড়ির চাবিটা সমরেশের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, 'তুই চালা। বৌদি, আপনি সামনে বসুন। আমি পেছনের সীটে বসে একটু চিন্তা করি।'

'তুই চিন্তা করবি ?' বলে সমরেশ হ্যা হ্যা করে হাসতে লাগল।

শিবেন চোখ পাকিয়ে বলল, 'চুপ কর, পাজী বদমাশ কোথাকার।'

দময়ন্তী সহাস্যে বলল, 'কি চিন্তা করছেন, বলুন।'

'দেখুন, দুটো কথা আমার কাছে আজকের অভিজ্ঞতা থেকে স্পষ্ট হল। প্রথমত, যাঁরা মারা গেছেন, তাঁদের কেউই তাঁদের আত্মীয়দের কাছে খুব একটা শ্রদ্ধা বা ভক্তিভাজন ছিলেন না।

শম্ভুচন্দ্র ছাড়া বাকি দুজন বাইরের লোকের কুপরামর্শ ছাড়াই আলাদা আলাদা ভাবে তাঁদের আত্মীয়দের হাতে নিহত হতে পারতেন। যদিও, নিঃসন্দেহে এঁদের তিনজনের মৃত্যুর মধ্যে একটা যোগসূত্র আছে এবং সেই যোগসূত্র নীলকান্তপুরে সৃষ্ট হয়ে ডাক্তার রজার ওয়ালটনের ভেতর দিয়ে এসেছে। অথচ, ডাক্তার ওয়ালটনের সঙ্গে নীলকান্তপুরের কি সম্পর্ক সেটা এখনও সঠিক বোঝা যাচ্ছে না। দ্বিতীয়ত, এই তিনজনকেই ডাক্তার ওয়ালটনের নাম রেকমেণ্ড করার সুযোগ কেউ ইচ্ছে করলেই পেতে পারত। শম্ভুচন্দ্র মর্নিং ওয়াক করতেন, নির্ঝরিণীর নাইটনার্স ছিল, ভোলানাথের বাড়িভর্তি ভাড়াটে, একতলায় গোডাউন, লোকজনের আসা-যাওয়ার অন্ত নেই। কিন্তু সেই সুযোগগুলোর সদ্ব্যবহার করল কে? ডাক্তার অরিজিৎ বোস? বীথিকা? দুজনে একসঙ্গে? না, অন্য কেউ? এই তিনজনের মধ্যে আমি কমন ফ্যাক্টর এঁদেরই দেখতে পাচ্ছি— অরিজিৎ, বীথিকা আর রহস্যময় রজার ওয়ালটন।'

'নীলকান্তপুরকে দেখতে পাচ্ছেন না?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।' বলতে বলতে শিবেন চুপ ক[illegible] গেল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'শম্ভুচন্দ্রের মর্নিং ওয়াকের কথা ভাবছেন, তাই না?'

দময়ন্তী নিচু গলায় বলল, 'হ্যাঁ। আর রহিম ওসমান লেনের ভিড়ের কথাও ভাবছি।'

এরপর সারা রাস্তা আর কেউ কোন কথা বলল না।

'আজ বিকেলে কি করছেন?' জিজ্ঞেস করল শিবেন।

গাড়ি থেকে নামতে নামতে দময়ন্তী বলল, 'আপনি কি করছেন? যদি অসুবিধে না হয় তো যাবেন নাকি একবার নীলকান্তপুরে? ট্রেনে যাব, গাড়ি চালানোর কোন দরকার নেই।'

শিবেন হাসল। বলল, 'ট্রেনে যাওয়ার দরকার নেই, গাড়িতেই

যাব। গাড়ি চালাতে আমার কোন কষ্ট হয় না, ভালই লাগে। আর, রমলাকেও নিয়ে আসব।'

দময়ন্তী আর সমরেশ একসঙ্গে বলে উঠল, 'নিশ্চয়ই। সে তো খুব ভাল কথা।'

বিকেল বেলা শিবেন আর রমলা এসে দেখল দময়ন্তী চিন্তিত মুখে বসে আছে। সমরেশ বলল, 'বিকাশবাবু এসেছিলেন। তোরা আসার একটু আগে গেলেন।'

শিবেন বলল, 'বিকাশবাবু আবার কে?'

'মনে নেই তোর? সেই যে ডাক্তার অরিজিৎ বোসের ভগ্নিপতি, আসানসোলে থাকেন।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বিকাশ ঘোষ। তা, তিনি কি মনে করে? কি ব্যাপার বৌদি? গোপনীয় কিছু নয় তো?'

দময়ন্তী মাথা নাড়ল। বলল, 'আপনার কাছে নয়, তবে আপনার ডিপার্টমেন্টের কাছে গোপনীয়। ভদ্রলোক পুলিশকে কতগুলো কথা বলেন নি। সেগুলো আমাকে বলতে এসেছিলেন।'

'পুলিশকে বলেন নি কেন?'

'পারিবারিক কেচ্ছা। সব কথা কি পুলিশকে বলা যায়?'

'কথাগুলো কি?'

'প্রথমত, বীথিকার চরিত্র সত্যিই ভাল ছিল না। প্রথম দিন আপনি আমাদের বলেছিলেন যে বীথিকা নিমফোম্যানিয়াক ছিল, বিকাশবাবুও সেই কথাই বললেন। অন্নদা মিত্তির আশা করেছিলেন যে বিয়ের পর স্বভাব শুধরোবে, কিন্তু তা হয় নি। বিয়ের পরেও নানারকম কুকীর্তি করেছে। অরিজিৎ নাকি দু-একবার বাধা দিতে গিয়েছিলেন, কিন্তু তাতে উল্টো ফল হয়েছে। বীথিকা লজ্জিত তো হয়ই নি, উল্টে ওঁকে অপমান করেছে। প্রজ্ঞা কেন্দ্রের টাকাটা দিয়েছিলেন অন্নদা মিত্র, কাজেই সেই জোরটা তার ছিল।'

'বিকাশবাবু এসব কথা জানলেন কি করে?'

'সে ব্যাপারটা ইণ্টারেস্টিং। আজ থেকে মাস আষ্টেক আগে অরিজিৎ বিকাশবাবুকে গোপনে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। তাঁর ইচ্ছে ছিল বিকাশবাবুকে প্রজ্ঞার একটা চাকরি দেওয়া। সেই সময় বিকাশবাবু কয়েকবার নীলকান্তপুরে গিয়েছিলেন। সেখানেই এইসব কথা জানতে পারেন।'

'কে বলেছিল এসব কথা? ডাক্তার অরিজিৎ বোস?'

'না। প্রজ্ঞা কেন্দ্রের স্টাফ নার্স। তাঁর আর অন্য কয়েকজনের নাম আমি লিখে নিয়েছি। আজ তাঁদের সঙ্গে কথা বলা যাবে।'

'অরিজিৎ নিজের ভগ্নিপতিকে গোপনে ডেকে পাঠিয়েছিলেন কেন? প্রকাশ্যে ডাকতে কোন বাধা ছিল?'

'ছিল বোধ হয়। বিকাশবাবু তা জানতে পারেন নি।'

'চাকরিটা হয় নি?'

'না। বিকাশবাবুর ধারণা, বীথিকা বাধা দিয়েছিল।'

'যাদের নাম বিকাশবাবু করেছেন, তারা কারা?'

'ডাক্তার মিসেস স্বপ্না চৌধুরী, প্রজ্ঞা ল্যাবরেটরির সুপারিনটেণ্ডেণ্ট, মদনমোহন কাঞ্জিলাল, প্রজ্ঞার হেড অফিসের বড়বাবু, মিসেস রাধিকা মৌলিক, স্টাফ নার্স আর দরোয়ান বৃজনন্দন শুক্লা।

'ও ব্বাবা, এ যে অনেক লোক। সময় লাগবে তো অনেক।'

'প্রত্যেকের জন্যে দু মিনিট, তাহলে হবে?'

•

গড়িয়া থেকে যে রাস্তাটা নীলকান্তপুরে গেছে, তার ওপরেই প্রজ্ঞা মনোবিকলন কেন্দ্র, নীলকান্তপুরের আধমাইলটাক আগেই। কেন্দ্রের চারদিকে প্রায় দশ ফুট উঁচু কাঁটাতার লাগানো ইঁটের পাঁচিল। রাস্তার ওপরে যে টিনের পাত লাগানো আট ফুট চওড়া গেট আছে, তার ওপর দিয়ে কেবল দুটো বাড়ির ছাদটুকু ছাড়া

জায়গাটার আর কিছুই দেখা যায় না। গেটের দুপাশে থামের মাথায় দুটো মস্ত আলো আর তাদের ওপর ইংরেজিতে আর বাংলায় লাল রঙের অক্ষরে প্রজ্ঞা মনোবিকলন কেন্দ্রের নাম লেখা।

শিবেনের ফিয়াট গেটের সামনে এসে দাঁড়াল। সমরেশ বলল, 'ঢুকতে দেবে তো রে ?'

শিবেন বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, দেবে। আসার আগে ফোন করে দিয়েছি।'

রমলা ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, পাগলরা কি ভেতরে এমনি ঘুরে বেড়ায় ? মানে, ছাড়া ?'

সমরেশ বলল, 'তাতে তোমার কি ? ওঁরা তো আর তোমাকে কিছু বলতে যাচ্ছে না। জানো না, পাগলরা পাগলদের কিছু বলে না ?'

ঠিক তক্ষুণি শিবেন হর্ন বাজালো বলে রমলা কি বলল তা আর শোনা গেল না। গেটটা অবশ্য তৎক্ষণাৎ খুলে গেল। খাকি য়ুনিফর্ম পরা ফর্সা মোটাসোটা একজন দরোয়ান বাইরে বেরিয়ে এসে হাত নেড়ে গাড়ি ভেতরে ঢোকার ইশারা করল।

শিবেন আস্তে আস্তে গাড়ি গেটের ভেতরে ঢোকাল। দেখা গেল, গেটের বাঁদিকে সাদা রঙ করা একটা লম্বাটে দোতলা বাড়ি। এক-তলার সামনে ঢাকা বারান্দা আর পর পর সবুজ পর্দা ঝোলান দরজা, কোনটার মাথার ওপরে লেখা রিসেপশন, কোনটার ওপরে আউট পেশেন্টস ডিপার্টমেন্ট, কোনটা অফিস, কোনটা ডিসপেন্সারি, ইত্যাদি। গেটের ডানদিকে একটা সুন্দর বাগান; নানারঙের মৌসুমী ফুলের বাহার, সেখানে, মাঝখানে একটা পাথরের ফোয়ারাও আছে। তার পেছনে হলুদ রঙের একটা লম্বা তিনতলা বাড়ি, তার মাঝখানে বেশ বড় একটা গাড়িবারান্দাওলা ঢোকার দরজা, তার দুপাশে আর ওপরে সার সার গ্রীল লাগান জানলা। গাড়িবারান্দার ওপর দিয়ে মাধবীলতার ঝাড় তুলে দেওয়া হয়েছে। আর গেটের

সামনে একটা খেলার মাঠ, তার চারপাশে নানারকম দোলনা, স্লিপ ইত্যাদি শোভা পাচ্ছে, এবং মাঝখানে পাশাপাশি দুটো ব্যাডমিণ্টন কোর্ট। এই মাঠের পেছনে আর একটা সাদা দোতলা বাড়ি। এই বাড়িটা অন্য দুটোবাড়ির চেয়ে স্বতন্ত্র। কারণ অন্য দুটো আধুনিক, ওটা প্রাচীন, যদিও অত্যন্ত ভাল অবস্থায় রাখা আছে। খিলেন করা দরজা জানলা, কারুকার্য করা থাম, কাঠের ঝিলমিল বাড়িটাকে একটা গাম্ভীর্য দিয়েছে যা বাকি দুটো বাড়িতে অনুপস্থিত।

শিবেন গাড়িটা বাঁদিকের বাড়িটার সামনে দাঁড় করালো। বারান্দায় দুজন ভদ্রলোক দাঁড়িয়েছিলেন। একজন খুব লম্বা, মাথায় কাঁচাপাকা চুল, মুখে তদ্রূপ চাপ দাড়ি, চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা, পরণে ট্রাউজার্স আর শার্ট। অন্যজন মাঝারি, অত্যন্ত রোগা, টাকমাথা, পরণে খদ্দরের ধুতি আর পাঞ্জাবি। দুজনে তাড়াতাড়ি নেমে এলেন অতিথিদের অভ্যর্থনা করবার জন্যে।

চাপদাড়ি বললেন, 'নমস্কার। আমার নাম মদনমোহন কাঞ্জিলাল, আমি এখানকার অফিস-ইন-চার্জ। আর এঁর নাম রজতকান্তি শীল, এখানকার গার্ডেন সুপারভাইজার।'

শিবেন প্রতি-নমস্কার করে সকলের পরিচয় দিল।

মদনমোহন দময়ন্তীকে বললেন, আপনার কথা আমি শুনেছি। কিন্তু, আপনাকে এমপ্লয় করল কে? বড় ডাক্তারবাবু কি? আমি কিন্তু কোনরকম ইন্সট্রাকশন পাই নি।'

জবাবটা দিল শিবেন। বলল, 'দেখুন, ওঁকে কেউই এমপ্লয় করে নি। আমাদের বিশেষ অনুরোধে উনি এই কেসটা দেখতে রাজী হয়েছেন। বলতে পারেন যে উনি আমাদের কনসাল্‌ট্যাণ্ট।'

মদনমোহন চিন্তিত মুখে বললেন, 'তাহলে ওঁর ফি পেমেণ্ট করবে কে? গভর্নমেণ্ট না প্রজ্ঞা মনোবিকলন?'

শিবেন মৃদু হেসে বলল, সে ব্যাপারে আপনার চিন্তার কোন কারণ নেই। ফি যে-ই দিক, প্রজ্ঞাকে দিতে হবে না।'

মদনমোহনের মুখের মেঘ কিছুটা কেটে গেল। বললেন, 'তাহলে তো ভালই। কি জানেন, আমি তো স্পেসিফিক অর্ডার ছাড়া কোন টাকাপয়সা ডিসবার্স করতে পারি না। বুঝতেই পারছেন, চাকরি করতে হয়। তা যাকগে সেকথা। এখন বলুন ম্যাডাম, আমরা আপনাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি।'

দময়ন্তী বলল, 'আমি জায়গাটা একটু ঘুরে দেখতে চাই, বিশেষ করে ডক্টর বোসের বাড়িটা। আর, কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলতে চাই। এই এঁরা।' বলে কয়েকটা নাম লেখা একটা কাগজ মদনমোহনের হাতে দিল।

কাগজটায় চোখ বুলিয়ে মদনমোহন বললেন, 'আজ তো ছুটির দিন। ডক্টর স্বপ্না চৌধুরী আর মিসেস মৌলিক তাঁদের কোয়ার্টার্সে আছেন কিনা কে জানে। যান তো রজতবাবু, একবার দেখে আসুন এঁরা আছেন কিনা। থাকলে একবার এখানে আসতে বলুন। আর, ওহে বৃজনন্দন, একবার এদিকে এসো তো। ইনি তোমার সঙ্গে একটু কথা বলবেন।'

দময়ন্তী রজতকে বলল, 'আপনি যাঁদের ডাকতে যাচ্ছেন, তাঁদের বলবেন যে আমি দু মিনিটের বেশি কারুর কাছ থেকে নেব না।' তারপর মদনমোহনকে বলল, 'বৃজনন্দন আসতে আসতে আপনাকে দু-চারটে প্রশ্ন করে নিই, কেমন?'

মদনমোহন তার চাপদাড়িতে হাত বুলিয়ে বললেন, 'বেশ, করুন।'

মদনমোহনের কাছে জানা গেল যে প্রজ্ঞার প্রায় সৃষ্টি থেকেই তিনি এখানে আছেন। এর আগে ছিলেন অন্নদা মিত্রের শ্যামপুকুরের ছাপাখানায়। সেখানেই ছোট থেকে বড় হয়েছেন। লেখাপড়ায় ম্যাট্রিক পাশ, কিন্তু অন্নদাবাবু ওঁকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন এবং বিশ্বাস করতেন। প্রজ্ঞায় অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আর অ্যাকাউন্টস

দেখায় তার অন্নদাবাবুর রেকমেণ্ডেশনেই বড় ডাক্তারবাবু ওঁকে দিয়েছিলেন। বীথিকাকে উনি জন্মাতে দেখেছেন। ভাল মেয়ে ছিল, তবে খামখেয়ালী—বড়লোকের মেয়েরা যেমন হয় আর কি। আর খুব বদরাগী। তবে আনন্দ ফুর্তি করতে ভালবাসত। বড় ডাক্তারবাবু অবশ্য সেটা পছন্দ করতেন না, তাই বলে দুজনের মধ্যে কক্ষণো ঝগড়াঝাঁটি হত না। বড় ডাক্তারবাবু আবার একটু গম্ভীর প্রকৃতির ছিলেন কিনা। হ্যাঁ, বীথিকার কিছু কিছু ছেলে-বন্ধু ছিল, তারা কিন্তু মোটেই সুবিধের লোক ছিল না। না, মদনমোহন তাদের নাম-ধাম জানেন না, জানার চেষ্টাও করেন নি। তবে বীথিকাকে এ ব্যাপারে সাবধান করার কথা তিনি কখনো ভাবেন নি। তিনি সামান্য কর্মচারী, এসব তাঁর এক্তিয়ারের বাইরে। আর, বিকাশ ঘোষ বলে কাউকে তিনি চেনেন না।

মিসেস রাধিকা মৌলিক লম্বা-চওড়া মাঝবয়সী মহিলা। তাঁর কথাবার্তা অত্যন্ত প্রাঞ্জল। তিনি বললেন যে বীথিকা একটি নষ্ট মেয়েমানুষ ছিল। বড় ডাক্তারবাবুর মত দেবতুল্য লোককে দিনের পর দিন কী অপমানটাই না করেছে। সে অপমান অন্য কেউ হলে সহ্য করত না। না, না, তার মানে এই নয় যে বড় ডাক্তারবাবু খুনী। অমন কাজ উনি কখনোই করতে পারেন না। কখনোই নয়। এই সম্পত্তির মালিক ছিল বীথিকা, তাই অত দাপট আর দেমাক দেখাতে পারত। হ্যাঁ, ছেলে-বন্ধু ছিল বৈকি। না থাকলে নষ্টামি করবে কি করে। যত সব হাড়হাভাতে শয়তান। একটা যেত আর একটা আসত। কে জানে তাদের নামধাম কি? তাদের দিকে তাকাতে প্রবৃত্তি হত না। না, বিকাশ ঘোষ বলে কাউকে তিনি চেনেন না। ভোলানাথ চক্রবর্তীকে মনে নেই। রানী নির্ঝরিণীকে মনে আছে। রুগীদের সম্পর্কে ভাল খারাপ কিছু বলতে নেই। শম্ভুচন্দ্র ধাড়াকেও মনে পড়ে না। কতরকম রুগী যে উনি দেখেছেন

ওঁর তিন বছরের চাকরিতে।

বৃজনন্দন শুক্লার বাড়ি উত্তরপ্রদেশে। গত পাঁচবছর সে এখানে আছে। মালকিন ভাল লোক ছিলেন। যেদিনই অনেক রাত করে ফিরতেন, সেদিন অনেক টাকা দিতেন গেট খুলে দেবার জন্যে। গাড়ি নিজেই চালাতেন। কখনো কখনো খুব সকালেও বেরিয়ে যেতেন। কত সকালে? ছ'টা সাতটা হবে। সঙ্গে লোক থাকত কখনো, কখনো একা। কে লোক তা অবশ্য সে দেখে নি। না, তাদের চেনবার কোন প্রশ্নই ওঠে না। বৃজনন্দনের সাধারণত রাত্রিবেলা আর ছুটির দিন ডিউটি পড়ে। দিনের ডিউটি দেয় অন্য লোক।

ডক্টর স্বপ্না চৌধুরীকে বেশ কালোই বলা যায়, কিন্তু হাবভাবে আর কথাবার্তায় একেবারে পাক্কা মেমসাহেব। বয়েস ত্রিশের ওপারেই হবে, কিন্তু সেটা কম দেখানোর একটা আগ্রহ এবং চেষ্টা লক্ষ্য না করে পারা যায় না। ডক্টর চৌধুরী বললেন যে বীথি ওয়াজ এ ভেরি নাইস গার্ল। হ্যাপি গো লাকি। জীবনটা উপভোগ করতে ভালবাসত। সে জন্যে অনেকে ওর সম্পর্কে খারাপ কথা বলত। বাট শী কুড্‌ন্ট কেয়ার লেস। অ্যাণ্ড হোয়াই শুড শী? হার হাজব্যাণ্ড ওয়াজ এ গ্রাম্পি রামগড়ুরের ছানা। এ গুড ম্যান, ইয়েস। কিন্তু বেশি ভাল আবার ভাল নয়। দুজনের ছিল দু-রকমের চরিত্র। তাই বলে একটা চরিত্র ভাল আর অন্যটা খারাপ, এরকমের কথা যারা বলে তারা ঠিক করে না। ডঃ চৌধুরী কলকাতা থেকে ডাক্তারী পাশ করে বিলেতে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে বেশ কয়েকটা ডিগ্রী নিয়ে এসেছেন। এখানকার রিসার্চ ডিপার্টমেন্টটা উনি চালান। এই ডিপার্টমেন্টটাই ছিল বীথিকার আণ্ডারে। বীথিকা পাগলের ডাক্তার ছিল না, ছিল প্যাথলজিস্ট। তাছাড়া রিসার্চে

ওর একটা শেয়ার ছিল। সেই কারণে, একটা ওয়েল ইকুইপড ল্যাবরেটরি এখানে গড়ে তুলেছিল। নানারকম ড্রাগস নিয়ে এখানে কাজকর্ম হয়। কয়েকজন রিসার্চ স্কলার আছেন। প্রত্যেকেই কোয়ালিফায়েড ডাক্তার। তাঁরা এখানে থাকেন না, কলকাতা থেকে যাতায়াত করেন। হ্যাঁ, নানারকম বিষ নিয়েও কাজকর্ম হয়। না, পটাসিয়াম সায়ানাইড নিয়ে কখনো কাজ হয় নি। না, রুগীদের ওপর কখনো এক্সপেরিমেন্ট চালানো হয় না। আর সবশেষে ডঃ চৌধুরী জানালেন যে ডঃ অরিজিৎ বোস ওয়াজ পারফেক্টলি কেপেবল অফ কিলিং হিজ ওয়াইফ অর এনিবডি এলস ফর দ্যাট ম্যাটার। ওঁর মধ্যে একটা স্ট্রীক অফ সেডিজিম ছিল। অবশ্য, তার কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ তিনি পান নি, তবে এটা তাঁর বদ্ধমূল ধারণা। হ্যাঁ, বিকাশ ঘোষ বলে একজনের সঙ্গে এখানে পরিচিত হয়েছিলেন। সুবিধের লোক নয়। বীথিকা তাকে দেখে বেশ আপসেট হয়ে পড়েছিল। শী কাইণ্ড অফ থ্রু হিম আউট অফ দিস প্লেস।

ডঃ চৌধুরীর সঙ্গে বাক্যালাপ শেষ হবার পর দময়ন্তী বীথিকার শোবার ঘরটা দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করল। মদনমোহন পকেট থেকে একগোছা চাবি বের করে বললেন, 'আমার কি সঙ্গে যাবার দরকার আছে?'

দময়ন্তী বলল, 'নিশ্চয়ই। আপনি না গেলে কি করে হবে?'

মদনমোহন ম্লান হেসে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'এই কাজটা করতে আমার একদম ভাল লাগে না, জানেন? ওই ঘরটায় যতবার যাই, সেই ভয়ঙ্কর দিনটার কথা মনে পড়ে। ভাল লাগে না।' বলে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দা পেরিয়ে রাস্তায় নামলেন। সামনে আঙুল বাড়িয়ে বললেন, 'ওই যে খেলার মাঠের ওপারে বাড়িটা দেখছেন, ওটাই বীথিকার বাড়ি ছিল।'

রমলা জিজ্ঞেস করল, 'সমস্ত বাড়িটা নিয়েই থাকতেন ? ওটা তো মস্ত বাড়ি।'

'না। সমস্ত বাড়িটা নিয়ে থাকতেন না। একতলায় আছে স্পেশাল ওয়ার্ড। ডাক্তার বোসেরা থাকতেন দোতলায়।'

দময়ন্তী জিজ্ঞেস করল, 'স্পেশাল ওয়ার্ড মানে ?'

'সাধারণ ওয়ার্ডের থেকে আলাদা, এই আর কি। থাকার বন্দোবস্ত, খাওয়াদাওয়া ইত্যাদি একটু ভাল। পারসোনালাইজড সার্ভিস।'

'এখানে থাকতে গেলে কি বেশি পয়সা দিতে হয় ?'

'হয়, তবে সব ক্ষেত্রে নয়। এ ব্যাপারটা ডাক্তার বোসের মর্জির ওপর নির্ভর করে।'

'এই ওয়ার্ডটা কি প্রজ্ঞার গোড়া থেকেই ছিল ?'

'না আগে ওখানে লাইব্রেরী ছিল। পরে লাইব্রেরীটা উঠে আসে আমার অফিসের দোতলায়।'

'এই ওয়ার্ডটা তৈরি করার কোন বিশেষ কারণ ছিল কি ?'

'ছিল। অনেক রুগী জেনারেল ওয়ার্ডে থাকতে চাইতেন না। অনেকের স্পেশাল ট্রিটমেণ্টের দরকার হত। কোন কোন রুগী আইসোলেশন পছন্দ করতেন। এই সব কারণে।'

'কতদিন চালু হয়েছে এই ওয়ার্ডটা ?'

'বছর তিনেক হবে।'

কথা বলতে বলতে খেলার মাঠ পার হয়ে সকলে বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। মদনমোহন বললেন, 'প্রজ্ঞা এই বাড়িতেই প্রথম খোলা হয়েছিল। পুরোন বাড়ি, সারিয়ে টারিয়ে অনেক ধুমধাম করে উদ্বোধন করা হয়েছিল। অন্নদাবাবু আর তাঁর দুই ছেলে এসেছিলেন, কলকাতা থেকে নাম করা গাইয়েরা এসেছিলেন। কত আনন্দ উদ্দীপনার মধ্যে সব শুরু হয়েছিল। তখন কে জানত যে আজ তার এই অবস্থা হবে। বড় ডাক্তারবাবুর অনেক সাধ ছিল,

উনি আস্তে আস্তে সেগুলো চালু করছিলেন। সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি বসিয়েছেন, রুগীদের বিজ্ঞানসম্মত রিক্রিয়েশনের ব্যবস্থা করেছেন, জেনারেল ওয়ার্ডে আজ চল্লিশ জন রুগীর চিকিৎসা হচ্ছে। সব হয়তো নষ্ট হয়ে যাবে।' বলে দীর্ঘশ্বাস ফেলে প্রকাণ্ড দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলেন।

ঢুকেই একটা হলঘর। লাল কার্পেটে মোড়া, একপাশে একটা আধুনিক সোফাসেট, অন্যপাশে একটা লম্বাটে টেবিল, রিসেপশনিস্টের জন্য। দেওয়ালে দুটো বড় অয়েলপেন্টিং, একটা যীশুর জন্মের, অন্যটা লুম্বিনিতে বুদ্ধের জন্মের। বেশ একটা শান্ত, স্নিগ্ধ পরিবেশ। ঘরটার তিনদিকে তিনটে দরজা। দুটোর ওপর লেখা 'স্পেশাল ওয়ার্ড', অন্যটার ওপর লেখা 'প্রাইভেট'।

মদনমোহন চাবি দিয়ে প্রাইভেট দরজাটি খুললেন। ভেতরে দোতলায় ওঠার সিঁড়ি। দোতলায় দুদিকে দুটো ফ্ল্যাট। একটার দরজায় অরিজিৎ আর বীথিকার নেমপ্লেট, অন্যটায় কিছু নেই।

মদনমোহন অরিজিতের ফ্ল্যাটের দরজা খুলতে খুলতে বললেন, 'বড় ডাক্তারবাবু এইদিকে থাকতেন। ওই ফ্ল্যাটটা গেস্টদের জন্যে।'

দময়ন্তী প্রশ্ন করল, 'গেস্ট কি রকম? এখানে কি ধরণের গেস্ট থাকতেন?'

'অনেকেই থাকতেন। বড় ডাক্তারবাবু বা বীথিকার বন্ধুবান্ধবেরা মাঝে মধ্যে এসে থাকতেন। কখনো কখনো বিদেশী স্পেশালিস্টরাও আসতেন। কখনো কখনো রুগীদের কোন আত্মীয়ও থেকে যেতেন ইমার্জেন্সীর সময়।'

'আচ্ছা, নিচে স্পেশাল ওয়ার্ডে এখন ক'জন রুগী আছেন?'

'এখন একজনও নেই। তবে জেনারেল ওয়ার্ডের একজন আসতে চাইছেন। বড় ডাক্তারবাবু নেই, কাজেই কেউ ডিসিশন নিতে পারছেন না।' বলে মদনমোহন একটা দরজা খুলে ধরে বললেন, 'আসুন। এটা বীথিকার শোবার ঘর ছিল।'

ঘরটা বেশ বড়। একপাশে একটা জোড়াখাট, তার ওপর মখমল দেওয়া চকমকে বেডকভার পাতা। অন্যপাশে প্রকাণ্ড বড় ড্রেসিং টেবিল আর তার অতিকায় আয়না। ড্রেসিং টেবিলের ওপর অসংখ্য প্রসাধনের জিনিসপত্র সাজানো। একদিকে দুটো ওয়ার্ডরোব, বেশ বড়। সে গুলোর পাশে বাথরুমে যাওয়ার দরজা। খাটের পাশে দুটো চেয়ার আর একটা ছোট টেবিল।

দময়ন্তী ঘুরে ঘুরে সব দেখল। বাথরুমের দরজা খুলে ভেতরে উঁকি দিল। ওয়ার্ডরোব দুটো খুলে দেখল। তারপর মদনমোহনকে প্রশ্ন করল, 'দুটো ওয়ার্ডরোবই তো দেখছি বীথিকার। অরিজিৎ-বাবুর জামাকাপড় কোথায় থাকত?'

মদনমোহন কিঞ্চিৎ বিপন্ন কণ্ঠে বললেন, 'ইয়ে, মানে, ওঁর ওয়ার্ডরোবটা আছে ওই কোণের ঘরটায়।'

'সেটা একবার দেখে আসি?'

'চলুন।' বলে মদনমোহন সবাইকে নিয়ে দীর্ঘ করিডরের অন্য প্রান্তে একটা ঘরে নিয়ে গেলেন।

এই ঘরটা আগেরটার তুলনায় অনেক ছোট। একটা সিঙ্গল খাট, একটা আলমারি, একটা টেবিল আর গোটাদুয়েক চেয়ার ছাড়া আর কোন আসবাবপত্র নেই। দময়ন্তী এই আলমারিটাও খুলে দেখল। তারপর মদনমোহনকে বলল, 'চলুন, আমার দেখা হয়ে গেছে।'

গাড়িতে উঠে দময়ন্তী শিবেনকে জিজ্ঞেস করল, 'ড্রেসিং টেবিলে বীথিকার সব রকমের প্রসাধনের জিনিস দেখলুম, দেখলুম না কেবল লিপস্টিক। সেগুলো কি আপনারা নিয়ে গেছেন?'

শিবেন বলল, 'হ্যাঁ। ফরেনসিকে দেওয়া হয়েছিল।'

'কটা লিপস্টিক ছিল?'

'একগাদা। ত্রিশ-চল্লিশটা তো হবেই।'

'হুঁ, তাই হবে। বীথিকার সব কিছুই দেখছি অতিরিক্ত বেশি। অসংখ্য শাড়ি, অসংখ্য জুতো, অজস্র ব্যাগ। অদ্ভুত!' বলে কিছুক্ষণ জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল। তারপর প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা, শিবেনবাবু, প্রথমে বোধ হয় রানী নির্ঝরিণী মারা যান, তাই না? তারপর ভোলানাথ, সবশেষে শম্ভুচন্দ্র?'

'হ্যাঁ, তাই বটে। এই মারা যাওয়ার পারম্পর্যটা কি খুব দরকারি?'

'হ্যাঁ। খুব দরকারি।'

'আপনি কি করে বুঝলেন?'

'এই, সকলের কথাবার্তায়। আচ্ছা, একটা ব্যাপার লক্ষ্য করলেন যে বিকাশ ঘোষকে মদনমোহন চিনতে পারলেন না, কিন্তু ডক্টর স্বপ্না চৌধুরী পারলেন?'

'হ্যাঁ। স্বপ্না চৌধুরী দেখলুম তাঁর মালকিনের অত্যন্ত গুণমুগ্ধ।'

'এবং খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু। হয়তো একই কলেজ থেকে পাশ করেছেন, সামান্য দু-এক বছরের জুনিয়ার। আগামী রবিবার আমরা আবার এঁর বাড়িতে যাব। ইতিমধ্যে এঁর সম্পর্কে কিছু খোঁজখবর নিলে ভাল হয়।'

'ব্যাপারটা আপনার কাছে পরিষ্কার হয়ে এসেছে মনে হচ্ছে?'

'হ্যাঁ, প্রায়। তবে প্রমাণ চাই, শিবেনবাবু। নিশ্ছিদ্র প্রমাণ না হলে এই নিরেট শয়তানীর দেওয়ালটা ভাঙা যাবে না।'

পরের মঙ্গলবার সন্ধ্যেবেলা শিবেন এল। বলল, 'ডাক্তার স্বপ্না চৌধুরী সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়েছি। খুব ইন্টারেস্টিং কিছু নয়, তবে নেহাৎ ফেলনাও নয়।'

দময়ন্তী আর সমরেশ একসঙ্গে জিজ্ঞেস করল, 'কিরকম?'

'ডাক্তার চৌধুরী আর বীথিকা এক ক্লাসে পড়তেন। বীথিকা একবছর ফেল করেছিল। ডাক্তার চৌধুরী বিয়ের আগে ছিলেন

সান্যাল, ডাক্তার হিরন্ময় সান্যালের মেয়ে। বুঝতেই পারছেন, স্বপ্না আর বীথিকা, দুজনেই মস্ত পয়সাওলা পরিবারের মেয়ে। স্বপ্নার দুবার বিয়ে হয়েছিল, দুবারই বিচ্ছেদ হয়েছে। বিলেত থেকে ফেরার পর ভাইদের সঙ্গে গোলমাল বেঁধেছিল। তখন বীথিকা ওঁকে নীলকান্তপুরে নিয়ে যায়। এই পর্যন্ত। এবার বলুন, এর থেকে কি বুঝলেন?'

'বিশেষ কিছু নয়। কেবল এইটুকু মনে হচ্ছে যে স্বপ্না বীথিকার অনেক গোপন কথা জানতেন যা সম্ভবত আর কেউ জানত না।'

'আচ্ছা বীথিকার ভাইদের সঙ্গে কথা বলতে চান না?'

'না। আপনারা যা জেরা করেছেন, তাই যথেষ্ট। ওদের কাছ থেকে আর বিশেষ কিছু জানা যাবে বলে মনে হয় না। ওরা ওদের ভগ্নিপতিকে শ্রদ্ধা করত, ভালবাসত আর বীথিকা ওদের বোন। এ অবস্থায় ওরা দুজনকেই আড়াল করে কথা বলবে। সেটাই স্বাভাবিক। আচ্ছা, নূরপুরে ববি রোজারিওর কোন খোঁজ পাওয়া গেল?'

'নাঃ। ভুয়ো নাম বা ভুয়ো ঠিকানা।'

দময়ন্তী বলল, 'হুঁ, আমিও তাই অনুমান করেছিলুম।'

'আপনার আর কিছু জানবার নেই?'

'আছে। রানী নির্ঝরিণী, ভোলানাথ আর শম্ভুচন্দ্রের মৃত্যুর সঠিক কারণগুলো বলবেন?'

'নির্ঝরিণী মারা যান গত বছরের আগের বছর জানুয়ারী মাসে। ভোলানাথ মারা যান গত বছর ফেব্রুয়ারী মাসে আর শম্ভুচন্দ্র গেছেন গত বছর ডিসেম্বরে, বীথিকা মারা যাওয়ার মাসখানেক আগে।'

'আর গত বছরের আগস্ট মাস থেকে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে নেওয়া হয়, তাই না?'

'হ্যাঁ, তাই।'

দময়ন্তী আর কোন প্রশ্ন করল না। চুপ করে বিষণ্ণ মুখে বসে রইল অনেকক্ষণ। তারপর বলল, 'বড় নোংরা ব্যাপার। নোংরা ষড়যন্ত্র। কিন্তু প্রমাণ কোথায়? সারকামস্ট্যানশিয়াল এভিডেন্সও নেই। একমাত্র উপায় সম্মুখ যুদ্ধ।'

সমরেশ পুলকিত মুখে বলল, 'উত্তম প্রস্তাব। কিন্তু কার সঙ্গে?'

দময়ন্তী শিবেনকে বলল, 'কাল সন্ধ্যেবেলা বিবেকানন্দের ছোট ভাইকে ধরে আনতে পারেন? যদি আসতে না চায়, অ্যারেস্ট করে নিয়ে আসবেন। ওয়ারেন্ট নিয়ে যাবেন।'

শিবেন ভেতরে ভেতরে উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। বলল, তাই হবে।'

বিবেকানন্দ ধাড়ার ছোটভাই বিশ্বানন্দ ডিগডিগে রোগা, গর্তে বসা চোখ, ভাঙা গাল, ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ—এক কথায় যাকে বলে চোয়াড়ে চেহারা। বয়েস তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশের মধ্যে। ঘরে ঢুকেই খোলা গলায় চিৎকার জুড়ে দিলেন, 'আমাকে এখানে জোর করে ধরে আনার অর্থ কি? এ কি মগের মুলুক? দেশে আইনকানুন নেই? দাদা এক্ষুণি উকিল নিয়ে এসে পড়বে, তখন মজা টের পাবেন আপনারা।'

দময়ন্তী অবিচলিত গলায় বলল, 'নিশ্চয়ই, তবে আপনি কতটা মজা টের পাবেন সেটা নির্ভর করছে আপনি কতটা আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে চান তার ওপরে। একটি হত্যাকাণ্ডে কোনরকম ভাবে লিপ্ত থাকার কি শাস্তি, আপনি তা জানেন?'

'কি? কি? কোন হত্যাকাণ্ড? আ-আমি কোন হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত নই।'

'আলবৎ লিপ্ত। কে আপনাকে দশ হাজার টাকা দিয়েছিল? যা দিয়ে আপনি কলেজের তহবিল থেকে সরানো টাকা পূরিয়ে দিয়েছিলেন? সে টাকা তো আপনি ঘোড়ার খুরে উড়িয়েছিলেন।'

'কে? কে? এসব কথা কে বলেছে আপনাকে? বাজে কথা। যে বলেছে সে মিথ্যে কথা বলেছে। পারবেন আদালতে এসব কথা প্রমাণ করতে?'

'নিশ্চয়ই পারব। আমার কাছে এমন সাক্ষ্য প্রমাণ আছে যা দিয়ে আপনি যে সেই টাকার বিনিময়ে আপনার বাবাকে ডাক্তার রজার ওয়ালটনের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং সেই ডাক্তারের দেওয়া ওষুধ খেয়েই আপনার বাবার মৃত্যু হয়েছিল, তাও আমি প্রমাণ করতে পারব। দীনদাথ কলেজের প্রিন্সিপ্যাল দয়া করে আপনার চুরি ক্ষমা করেছিলেন, কিন্তু দেশের আইন আপনার এই নরহত্যায়, বিশেষ করে পিতৃহত্যায়, সাহায্য করতে ক্ষমা করবে না।'

'বা-বাজে কথা সব। আমি আমার বাবাকে মারি নি। বাবা জণ্ডিসে মারা গিয়েছিলেন।'

'হ্যাঁ, কিন্তু ডাক্তার রজার ওয়ালটনের দেওয়া জণ্ডিসের জীবাণু-মিশ্রিত ওষুধ খেয়েই যে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল—'

দময়ন্তী কথাটা শেষ করতে পারল না। বিশ্বানন্দ আর্তনাদ করে উঠলেন, 'রজার ওয়ালটন কি ওষুধ দেবে তা আমি কি করে জানব?'

'আলবৎ জানতেন। নইলে রজার ওয়ালটনের নাম প্রস্তাব করেছিলেন কেন? সেই লোকটার সঙ্গে কি করে পরিচয় হয়েছিল আপনার?'

'আমার কোন পরিচয় ছিল না। চিনতুমই না ওকে।'

'কে তাহলে ওর নাম-ঠিকানা দিয়েছিল আপনাকে?'

'মিস্টার কামতাপ্রসাদ শর্মা বলে এক অবাঙালী ভদ্রলোক। রেসের মাঠে পরিচয় হয়েছিল।'

'সে আপনাকে কেবল বলেছিল যে আপনার বাবাকে রজার ওয়ালটনের নাম করতে আর তার কাছে একদিন নিয়ে যেতে, আর তাহলেই আপনার গচ্চা যাওয়া টাকাটা সে পুরোটা দিয়ে দেবে, তাই না?'

'হ্যাঁ, অনেকটা তাই বটে। আমি কেবল কথায় কথায় তাকে বলেছিলুম যে বাবা হোমিওপ্যাথি করাতে চান, কিন্তু কোন ডাক্তার পছন্দ হচ্ছে না।'

'আপনাকে যখন কামতাপ্রসাদ টাকা দিতে গেল, আপনার মনে হল না যে এর পেছনে কোন নোংরা ব্যাপার থাকতে পারে?'

'শর্মাজী আমাকে বলেছিলেন যে রজার ওয়ালটন খুব ভাল ডাক্তার, কিন্তু পসার জমাতে পারছেন না। তাই কেউ রুগী নিয়ে গেলে উনি খুশি হয়ে তাকে কিছু দিয়ে থাকেন। তাছাড়া, তখন আমার টাকার ভীষণ দরকার ছিল।'

'তা তো বুঝতেই পারছি। তাই বলে, কিছু দেওয়া মানে দশ হাজার টাকা?'

'রেসের মাঠে আপনি গেছেন কোনদিন? গেলে বুঝবেন যে ওটা ওখানে এমন একটা বিরাট বড় অঙ্কের কোন ব্যাপার নয়।'

'ওই কামতাপ্রসাদের ঠিকানা আপনি জানেন?'

'নাঃ? রেসের মাঠে কত লোকের সঙ্গে আলাপ হয়, সকলের ঠিকানা কি মনে রাখা সম্ভব? তবে শুনেছি ভদ্রলোক বম্বেতে থাকেন, বোধ হয় সেখানেই ফিরে গেছেন।'

ঠিক এই সময় বিবেকানন্দ সঙ্গে সম্ভবত তাঁর উকিলকে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। দময়ন্তী তাঁদের স্বাগত জানিয়ে বলল, 'আপনার ভাইকে নিয়ে যেতে পারেন বিবেকানন্দবাবু। আমাদের আলোচনা যা হবার তা হয়ে গেছে। তবে আপনাকে কয়েকটা কথা বলার ছিল। সেগুলো দয়া করে শুনে যাবেন।'

'তুমি এই বিশ্বানন্দ বেটাচ্ছেলেকে সন্দেহ করলে কি ভাবে?' সমরেশ জিজ্ঞেস করল।

শিবেন হাত নেড়ে বলল, 'সন্দেহ করাটাই তো স্বাভাবিক। আমাদেরও করা উচিত ছিল। কিন্তু বিশ্বানন্দ ধাড়ার কথাটা একবারও

খেয়াল হল না! আশ্চর্য! তবে, এই লোকটার এত খবর আপনি পেলেন কোত্থেকে?'

'দীননাথ কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল ডক্টর অজিত চট্টোপাধ্যায় আমার প্রফেসর ছিলেন। তাঁকে একটা ফোন করে সব খবর জোগাড় করেছি। তবে, কেউ চেনা না থাকলে আপনাকে বলতুম খোঁজখবর করবার জন্যে। বুঝতেই পারছেন, ভেতরে লোক না থাকলে ষড়যন্ত্রটা বানচাল হয়ে যেতে পারত। রিমোট কন্ট্রোলের একটা সীমা আছে তো।'

শিবেন মাথা নেড়ে বলল, 'তা তো বটেই।'

'মোটেই তা তো বটেই না।' সমরেশ হাত-পা ছুঁড়ে বলল, 'তা তো বটেই মানে কি? আমি জানতে চাই বিশ্বানন্দ ধাড়াকে কেন এবং কি প্রকারে তোমার সন্দেহ হইল? তার অপর দুই ভ্রাতাকে কেন হইল না?'

দময়ন্তী বলল, 'বড়ভাই নিজেই তাঁর বাবার মৃত্যুর পেছনে কোন রহস্য আছে, এ ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করলেন। মেজভাই মিলিটারি, বাড়িতে আসেন না। ছোটভাই প্রফেসারি ছেড়ে দাদার ব্যবসায় যোগ দিচ্ছেন। এঁদের মধ্যে ছোটভাইটিকেই সন্দেহ হবে না তো কার ওপরে হবে? যদি আমার সন্দেহ অমূলক প্রমাণিত হত, তখন জাঠতুতো ভাইদের সম্পর্কে খোঁজ নিতুম। তবে আমি প্রায় নিশ্চিত ছিলুম যে আমার ভুল হয় নি।'

'কিন্তু, ভাইদের মধ্যেই একজন কেন? রজার ওয়ালটনের নাম তো যে কেউ সাজেস্ট করতে পারত? শম্ভুচন্দ্র তো দরজা বন্ধ করে বসে থাকতেন না। তাঁর কাছে অনেক লোক দেখা করতে আসত। তাদের মধ্যে যে কেউ তা করতে পারত।'

'তা যে করতে পারত না, তা নয়। কিন্তু সেটা একটু কঠিন ব্যাপার হত।'

'কেন?'

'তাহলে ষড়যন্ত্রটা সম্বন্ধে একটু বলা দরকার। যারা ষড়যন্ত্র করেছিল, তারা দেখেছিল যে বড়লোক খিটখিটে উন্মাদ বৃদ্ধ লোকেদের আত্মীয়স্বজন তাঁদের দীর্ঘজীবনের চেয়ে মৃত্যু কামনাই বেশি করে থাকে। সরাসরি খুন হয়তো করতে চায় না বা পারে না, কিন্তু তাঁদের বিরুদ্ধে খুব ছোটখাটো অন্যায় কাজ করতে বড় একটা আপত্তিও করে না। এক্ষেত্রে দেখ, তারা কি করছে? তাদের আত্মীয়দের এক হোমিওপ্যাথের কাছে নিয়ে যাচ্ছে। তাতে তাদের বিবেকদংশন হবার কোন কথাই নয়। কিন্তু, যে উপায়ে তাদের সেই কাজটা করানো হচ্ছে, তাতে তাদের মনে একটা সন্দেহ বা সংশয় হবার কথা। তারা কেবল সেই জায়গাটায় চোখ বন্ধ করে থাকছে। ধর, আজ যদি তোমাকে কেউ বলে যে তোমার স্ত্রীর টেবিলে এই ফুলের তোড়াটা রেখে এস, তার জন্যে তোমাকে দশ হাজার টাকা দেব তাহলে প্রথমেই তোমার সন্দেহ হওয়া উচিত যে এর মধ্যে নিশ্চয়ই কোন ভয়ঙ্কর গণ্ডগোল আছে। সেই সন্দেহটাই এঁরা চেপে রেখেছেন।'

'তার মানে, পঙ্কজ রায়চৌধুরী যে হঠাৎ তেরিয়া হয়ে বলে-ছিলেন, আমাকে ফাঁসানোর চেষ্টা, সেটা এই অপরাধবোধেরই বহিঃপ্রকাশ?'

'ঠিক তাই। পঙ্কজ পোঁচি মাতাল। মামীশাশুড়ির তহবিল থেকে মদের টাকা খুব সহজে বেরোত বলে মনে হয় না। আজ যদি ছপ্পর ফুঁড়ে সেই টাকা আসে, তাহলে একজন হোমিওপ্যাথের কাছে তাঁকে নিয়ে যেতে আপত্তির তো কোন কারণ নেই।'

শিবেন বলল, 'দুজনেই সমান। সন্দেহ করতে গেলে দুজনকেই একসঙ্গে এবং আলাদা আলাদা ভাবে করা উচিত। তাই না, বৌদি?'

দময়ন্তী মাথা নাড়ল। বলল, 'হ্যাঁ, তাই।'

সমরেশ মাথা চুলকে বলল, 'কিন্তু নিকট আত্মীয়দেরই জড়াতে

হবে কেন ? বাইরের লোকও তো লাগান যেত।'

'তা যেত। কিন্তু ষড়যন্ত্রটায় টাইমিং এবং পারম্পর্য, দুটোই খুব জরুরী ছিল। কাছের লোক না হলে, এটা ভেস্তে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল খুব বেশি।'

'তাহলে এই তিনটে হত্যাকাণ্ড এবং বীথিকার মৃত্যুর সঙ্গে সম্পর্কটা কোথায় ?'

'সেইটে জানতে গেলে, আরও সাক্ষ্য প্রমাণ দরকার। স্রেফ অনুমানের ওপর নির্ভর করলে চলবে না। শিবেনবাবু, কাল একবার পঙ্কজ রায়চৌধুরীকে বাজিয়ে আসবেন ?'

'আসব। আপনার যাবার দরকার নেই, ব্যাপারটা আমি বুঝে গেছি। কেবল, সমরেশের শেষ প্রশ্নটার উত্তর কিন্তু এখনও বুঝে উঠতে পারি নি। আর, আমার এখনও বিশ্বাস যে বীথিকা এবং রজার ওয়ালটন একই ব্যক্তি।'

দময়ন্তী মৃদু হাসল। বলল, 'হতে পারে। আর হ্যাঁ, একটা কথা। বিবেকানন্দ, বিশ্বানন্দ, পঙ্কজ, সোমনাথ আর শ্যামল, এদের প্রত্যেকের একটা করে ফটো জোগাড় করতে পারেন ?'

'পারি। কাল না পেলেও পরশু পাবেন।'

শিবেন এল একটু রাতের দিকে। বলল, 'সেই একই ব্যক্তি। শ্রীযুক্ত কামতাপ্রসাদ শর্মা। বিশ্বানন্দের বেলায় রেসের মাঠে, পঙ্কজের বেলায় শুঁড়িখানায়। কিপটে মাগী যা হাত-খরচা দিত, তাতে বাংলা খেয়ে খেয়ে পেটে চড়া পড়ে গেসল মশায়, কেউ যদি স্কচ খাওয়ায়, খাঁটি স্কচ, স্কটল্যাণ্ডে তৈরি, তাহলে তার অনুরোধ না রাখা কি ভদ্দরলোকের কাজ ? আর, সামান্য অনুরোধ—এক বেচারি ডাক্তার বিলেত থেকে ফিরে পসার জমাতে পারছে না, তার কাছে রুগী পাঠানো। এর মধ্যে অন্যায়টা কি আছে ?'

দময়ন্তী হাসতে হাসতে বলল, 'আমি এরকমই সন্দেহ করে

ছিলুম। ফটো এনেছেন?'

'ধাড়া ব্রাদার্স আর পঙ্কজের ছবি এনেছি। সোমনাথ আর শ্যামলের ছবি পাবেন কাল। এখন রেডি নেই।'

'সোমনাথ আর শ্যামল কি বলল?'

'আপনি তো ওদের জেরা করতে বলেন নি, তাই কিছু জিজ্ঞেস করি নি। তবে, ফটো চাওয়ায় খুব ক্ষেপে গেছে। বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে দু-চার কথা শুনিয়ে দিল। কাল বিকেলে গিয়ে নিয়ে আসতে বলেছে।'

সোমনাথ ভট্টাচার্য আর শ্যামল রায়, দুজনেই সন্ধ্যের একটু আগেই এসে উপস্থিত। সমরেশ ঠিক তক্ষুণি অফিস থেকে ফিরেছে। আপ্যায়ন করে দুজনকে বসবার ঘরে বসাল। একটু আলাপচারি করবার চেষ্টা করল, কিন্তু তেমন সাড়া পাওয়া গেল না। দময়ন্তী যখন ঘরে ঢুকল, তখন তিনজনেই গম্ভীর মুখে নীরবে বসে আছে।

সোমনাথ সরাসরি প্রশ্ন করল, 'আমাদের ছবি চেয়েছেন কেন?'

দময়ন্তী বলল, 'আপনাকে সে কৈফিয়ৎ দিতে আমি বাধ্য নই। আপনার ইচ্ছে হলে দেবেন, না হলে দেবেন না।'

সোমনাথের মুখ টকটকে লাল হয়ে উঠল। সমরেশের মনে হল, ঠিকই বলেছিলেন হেমন্ত সরকার, চণ্ডাল রাগ।

অনেক কষ্টে আত্মসংবরণ করল সোমনাথ। বলল, 'কৈফিয়ৎ চাইছি না। জানতে চাইছি কি আমাদের অপরাধ যে আপনাকে আমাদের ছবি দিতে হবে?'

দময়ন্তী বাঁকা হেসে বলল, 'কে বলেছে আপনাকে যে কেবল অপরাধীদেরই ছবি সংগ্রহ করি আমি? দেওয়ালে ওই যে ছবি ঝুলছে, ওঁকে চেনেন? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।'

'বাজে বকবেন না।' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল সোমনাথ, 'আপনার কি ধারণা আমরা ছোড়দাকে খুন করেছি? ডাক্তার দাশগুপ্তের

সার্টিফিকেট ভুয়ো ?'

দময়ন্তী পূর্ববৎ বলল, 'আপনার এসব প্রশ্নের জবাব দিতেও আমি বাধ্য নই। তবে হ্যাঁ, আপনারা যদি নিজেদের উপকার চান, তাহলে আমার একটা প্রশ্নের জবাব দিতে পারেন।'

'কি প্রশ্ন ?'

'ডাক্তার রজার ওয়ালটনের নাম আপনাদের কে দিয়েছিল ?'

সোমনাথ এই প্রশ্নের জবাব দিতে যেতেই শ্যামল তাকে বাধা দিতে গেল। কিন্তু সোমনাথ হাত নেড়ে বলল, 'তুই চুপ করে বসে থাক। সোমনাথ ভট্টাচার্য কাউকে ভয় পায় না। হ্যাঁ, ডাক্তার রজার ওয়ালটনের নাম দিয়েছিলেন একজন অবাঙালী ভদ্রলোক।'

'তার সঙ্গে কোথায় আলাপ হয়েছিল আপনার ?'

'তারাতলায়। আমার গোডাউনের পাশে একটা ফ্যাক্টরি আছে। উনি সেখানে আসতেন। ওখানেই আলাপ।'

'উনি কত টাকা দিয়েয়িলেন আপনাকে ?'

'এক পয়সাও না।'

দময়ন্তী ধমকে উঠল, 'মিথ্যে কথা।'

হঠাৎ শ্যামল রায় উঠে দাঁড়াল। বলল, 'মুখ সামলে কথা বলবেন বলে দিচ্ছি। মেয়েছেলে বলে রেয়াৎ করব ভাববেন না। আমি শ্যামল রায় ক্ষেপে গেলে জানোয়ার।'

'ক্ষেপে না গেলে কোন ইতর বিশেষ হয় বলে তো মনে হয় না।' অবিচলিত গলায় বলল দময়ন্তী।

'যা বলেছেন।' পেছন থেকে বলল শিবেন। একটু আগে এসে ঢুকেছে। 'চুপ করে বস তো হে ছোকরা। এটা তোমার পাড়ার গলি নয়। বেশি গোলমাল করলে এক্ষুণি চালান করে দেব। আর, এবার একেবারে লালবাজার।'

সোমনাথ নিচু গলায় বলল, 'বসে পড় শ্যামল, ঝামেলা করিস নি। এই নিন, ছবি চেয়েছিলেন, দিয়ে গেলুম। আর কিছু করতে

হবে কি ?'

দময়ন্তী মাথা নাড়ল। বলল, 'না, আপাতত এতেই হবে। কেবল, আমার প্রশ্নের জবাব এখনও পাই নি। কত টাকা দিয়েছিলেন কামতাপ্রসাদ ?'

'সে সময়ে বাজারে আমার একটা লোন ছিল, সেটা শোধ করে দিয়েছিলেন। আমাকে না জানিয়েই করেছিলেন।'

'কত টাকা ?'

সোমনাথের মুখ আবার লাল হয়ে উঠল। উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আপনার এ প্রশ্নের জবাব দিতে আমি বাধ্য নই। আয় শ্যামল।'

কথা হচ্ছিল পরদিন সন্ধ্যেবেলা।

দময়ন্তী বলল, 'দারুণ দেখতে কিন্তু মামা-ভাগনেকে।'

শিবেন হাসল। বলল, 'যা বলেছেন। ফিল্মস্টার ফিল্মস্টার চেহারা। ভাগনেটি কেন যে সিনেমায় সুবিধে করতে পারল না, কে জানে।'

এই আলোচনা আর এগোতে পারল না। দরজায় বেল বেজে উঠল। সমরেশ দরজা খুলে দিতে যিনি ঘরে ঢুকলেন, তিনি শ্রীমতী মঞ্জুলা রায়চৌধুরী, এয়ারেস টু দি এস্টেট অফ দি লেট মহারাণী নির্ঝরিণী দেবী অফ হীরাগঞ্জ।

ঘরে ঢুকেই মঞ্জুলা দময়ন্তীকে বললেন, 'আপনার সঙ্গে আমার একটা বিশেষ জরুরী কথা আছে।'

দময়ন্তী বলল, 'বলুন।'

'এদের সামনেই বলব ?' বলে বাকি দুজনের মুখের দিকে দেখে বললেন, 'আচ্ছা, বলছি; গতকাল আপনি এই এঁকে আমার স্বামীর কাছে পাঠিয়েছিলেন। আমার স্বামী মাতাল, ওঁর বুদ্ধিশুদ্ধির ঠিক নেই। উনি এঁকে যা বলেছেন, সব বাজে কথা, মিথ্যে কথা। ওঁকে কেউ ওই অ্যাংলো ডাক্তারের কথা বলে নি। আমার

মামীমাকে কে এর খবর দিয়েছিল, তা আমাদের জানা নেই।'

দময়ন্তী একটু চুপ করে থেকে বলল, 'ভয় দেখানো ফোনটা কবে পেয়েছেন? কাল রাত্রেই না আজ?'

মঞ্জুসা বিস্ফারিত চোখে বললেন, 'কে? কি? কিসের ফোন?'

'কামতাপ্রসাদ সম্পর্কে কোন কথা বললে কাকে খুন করা হবে? আপনার স্বামীকে না আপনাদের দুজনকেই?'

মঞ্জুসা কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে চুপ করে রইলেন। তারপর শিউরে উঠে প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন, 'আ-আ-আমি জানি না। আমি কিচ্ছু জানি না।' বলে ঊর্ধ্বশ্বাসে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

সমরেশ বলল, 'হীরাগঞ্জের এরারেস খুব ভয় পেয়েছেন দেখছি।'

দময়ন্তী চিন্তিত মুখে বলল, 'হুঁ। আর ক্ষেপে গেলে জানোয়ার শ্যামল রায়ও পেয়েছে।'

শিবেন বলল, 'তাই দেখলুম বটে। এই কামতাপ্রসাদটাই বা কে? দু-দুটো গাঁইগোত্রহীন লোক—রজার ওয়ালটন আর কামতা-প্রসাদ শর্মা। আরও বাড়বে না কি?'

দময়ন্তী গম্ভীর মুখে মাথা নাড়ল। বলল, 'সে সম্ভাবনা তো দেখছি না।'

'এখন তাহলে কি কর্তব্য?'

'কাল সকালেই একবার ডাক্তার মিসেস স্বপ্না চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করতে হবে। নয়তো দেরি হয়ে যেতে পারে।'

'কত সকালে?'

'যত সকালে সম্ভব। ধরুন সাড়ে ছ'টায় এখান থেকে রওনা হব।'

'তাই হবে। সঙ্গে লোকজন নেব?'

'হ্যাঁ। প্লেন ড্রেসে। পারলে আজ রাত্রেই কোঠা যেন ঘিরে ফেলা হয়। কারা ঢুকছে বা বেরুচ্ছে, সেদিকে যেন নজর রাখে। আর প্রয়োজন হলে যেন এগিয়ে আসতে পারে। কাল সকালে

হতে পারে।'

শিবেন শান্ত গলায় বলল, 'বেশ, সব ব্যবস্থা করা যাবে।'

শিবেনের ফিয়াট যখন প্রজ্ঞার সামনে পৌঁছল, তখন প্রায় সাড়ে সাতটা বাজে। আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেছে, বড় রাস্তায় লোকজনের চলাচল ভাল রকম শুরু হয়ে গেছে। প্রজ্ঞার গেটের উল্টোদিকে একটা প্রাইভেট বাস দাঁড়িয়ে আছে। বোধ হয় সেটার চাকা পাংচার হয়ে গেছে, সারানোর কাজ চলছে। গেটের পাশ গাছের তলায় চারজন দেহাতি লোক পুঁটুলি মাথায় অঘোরে ঘুমোচ্ছে। তারা ওই বাসের যাত্রীও হতে পারে, আবার সাধারণ পথিকও হতে পারে।

শিবেন এদের দেখিয়ে বলল, 'এরা আমাদের লোক। বাসের ভেতরে কয়েকজন আছে। প্রজ্ঞার পেছনের ক্ষেতের ভেতরেও আছে। মোটামুটি চারদিকেই ঘেরা আছে। কজনকে সামলাতে হবে মনে করেন?'

দময়ন্তী অন্যমনস্ক ভাবে বলল, 'একজনকেই। সেই নাটের গুরু!'

শিবেন একটু হতাশ হল বলে মনে হল। তারপর হর্ন বাজাল। গেট খুলে দিল বৃজনন্দন। গাড়ির ভেতরে য়ুনিফর্ম পরা শিবেনকে দেখে সসম্ভ্রমে সরে দাঁড়াল।

শিবেন গাড়ি ভেতরে ঢুকিয়ে প্রশ্ন করল, 'ডাক্তার স্বপ্না চৌধুরীর কোয়ার্টার্স কোনটা?'

বৃজনন্দন নীরবে ডানদিকের বড় বাড়িটার দিকে আঙুল দেখাল। শিবেন গাড়িটা সেইদিকে ঘুরিয়ে গাড়িবারান্দার নিচে এনে দাঁড় করালো। একজন নার্স তখন সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছিলেন। শিবেন তাকে স্বপ্না চৌধুরীর কোয়ার্টার্সের কথা জিজ্ঞেস করায় তিনি তিনতলার ছাদে চলে যেতে বললেন। সেখানে পেছন দিকে ছুটো

ফ্ল্যাট আছে। তারই একটা ডাক্তার চৌধুরীর।

তিনজনে সিঁড়ি বেয়ে ছাদে উঠল। বাঁদিকের ফ্ল্যাটের দরজায় বড় বড় করে লেখা 'ডঃ এস চৌধুরী'। শিবেন বেল বাজাল।

দরজাটা খুলতে একটু দেরি হল। ডঃ চৌধুরী একটা হালকা সবুজের ওপর গাঢ় সবুজ রঙের বড় বড় ছোপ দেওয়া পা পর্যন্ত লম্বা ড্রেসিং গাউনের কোমরের দড়ি বাঁধতে বাঁধতে দরজা খুলে দিলেন। ভদ্রমহিলার চোখ দুটো ফোলা ফোলা, অল্প লাল, মনে হল সারা রাত ঘুমোন নি। অতিথিদের দেখে মুখে হাসি টেনে বললেন, 'একি, আপনারা এত সকালে?' কিন্তু কথার সুরে খুব একটা বিস্ময় ফুটে উঠল না। তারপর একটু থেমে বললেন, 'আসুন, ভেতরে আসুন।'

বসবার ঘরটা খুব একটা বড় নয়। একগাদা আসবাবপত্রে ভর্তি। একটা সোফাসেট, গোটা পাঁচেক চেয়ার, একটা ইজিচেয়ার, দুটো বড় বড় বইয়ের আলমারি, একটা শো-কেস, একটা রেফ্রিজারেটার, কি নেই। ভদ্রমহিলা সবাইকে সোফায় বসিয়ে নিজে একটা চেয়ার টেনে বসলেন। তারপর খুব নিচু গলায় প্রশ্ন করলেন, 'আমি কি আপনাদের কোন সাহায্য করতে পারি?'

দময়ন্তী মাথা নাড়ল। বলল, পারেন। ডক্টর বীথিকা বোসের হত্যাকারী যে কে তা এই মুহূর্তে নিশ্চয়ই আপনার জানা আছে। তার পরিচয় প্রকাশ করতে আমাদের সাহায্য করলেই আমরা কৃতজ্ঞ হব।'

স্বপ্না সামান্য ইতস্তত করে বললেন, 'আপনি কি বলছেন আমি বুঝতে পারছি না। আমি তো আপনাদের আগেই বলেছি যে বীথিকার মার্ডারার তার হাজব্যাণ্ড অরিজিৎ।'

'আপনি যখন একথা আমাদের বলেছিলেন আপনি তখন খুব সম্ভব সে কথাই বিশ্বাস করতেন। কিন্তু এখনও তা করেন কি? বোধ হয় না। অতএব, আমাদের কাছে সত্য প্রকাশ করে বলুন।

তাতে আপনারও উপকার হবে, কারণ হত্যাকারীকে আশ্রয় দেওয়া বা তার পরিচয় গোপন রাখার চেষ্টা করাও আইনের চোখে গুরুতর অপরাধ। তাছাড়া, কৃতজ্ঞতা বোধ বলেও একটা জিনিস আছে। আপনি ভুলে যাবেন না যে বীথিকা আপনার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল, আপনার বিপদের দিনে আপনাকে আশ্রয় দিয়েছিল, সাহায্য করেছিল।'

স্বপ্না কম্পিত কণ্ঠে বললেন, 'অরিজিৎ মার্ডারার নয়, একথা মনে করবার কোন কারণ আছে কি? স্ত্রীর ঘরে ঢুকে তার লিপস্টিকে বিষ মাখিয়ে রেখে আসার সুযোগ তারই সবচেয়ে বেশি ছিল, তাই না?'

দময়ন্তী মাথা নাড়ল। বলল, 'না, তা নয়। এবং আপনিও সে কথা জানেন। অরিজিৎ সম্ভবত অনেকদিনই তার স্ত্রীর ঘরে ঢোকেন নি। আমরা তাঁদের আলাদা ঘর দেখে এসেছি।'

'তাহলে বীথিকাকে কে মেরেছে? আপনি কি বলতে চান?'

'আমি বলতে চাই বীথিকাকে মেরেছে তার প্রেমিক এবং শয্যা-সঙ্গীদের একজন। তিনি যে কে তা আপনি জানেন। আপনিই সম্ভবত তাকে বীথিকার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। বীথিকার মৃত্যুর সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ না থাকলেও, তার মৃত্যুর বেশ কিছুটা দায়িত্ব কিন্তু আপনার ওপর বর্তায়।'

স্বপ্না প্রবল বেগে মাথা নেড়ে প্রায় চিৎকার করে উঠলেন, 'না, না, না! আমি এ ব্যাপারে কিচ্ছু জানি না। আমাদের অনেক কমন ফ্রেণ্ড ছিল। তাদের কে কি করেছে, তার জন্যে আমি কেন দায়ী হব?'

'দায়ী হবেন, কারণ আপনি তার পরিচয় জেনেও তাকে আড়াল করে রাখতে চাইছেন।'

'বিশ্বাস করুন—' কাতর গলায় বললেন স্বপ্না, 'আমি ইচ্ছে করে কাউকে আড়াল করতে চাইছি না।'

'খুব সম্ভব আপনার কথাই সত্যি। সোমনাথ কি আপনাকে খুন করে ফেলার ভয় দেখিয়েছে?'

স্বপ্না বিস্ফারিত চোখে দময়ন্তীর দিকে তাকালেন। সে চোখে অবিমিশ্র আতঙ্ক। কিন্তু কোন কথা বললেন না।

শিবেন তখন উঠে দাঁড়াল। বলল, 'ডক্টর চৌধুরী, আমাকে একবার আপনার ফ্ল্যাটটা সার্চ করে দেখতে হবে। যদি ওয়ারেন্ট দেখতে চান, তাও দেখাতে পারি।'

স্বপ্না কোন কথা বলার আগেই হঠাৎ নিচে একটা গাড়ি স্টার্ট দেবার শব্দ পাওয়া গেল। ফিয়াট গাড়ি।

শিবেন চমকে উঠে বলল, 'আমার গাড়ি। এ ফ্ল্যাট থেকে বেরুবার অন্য রাস্তা ছিল?' বলে এই প্রশ্নের উত্তরের অপেক্ষা না করে বিদ্যুদ্বেগে ঘর থেকে বেরিয়ে ছাদে চলে গেল। বাকি তিনজন তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল পেছনে পেছনে।

ওপর থেকে দেখা গেল শিবেনের গাড়ি বেশ জোরে চলেছে গেটের দিকে। বৃজনন্দন গেটটা খুলে দিয়েছে। গাড়িটা বেরিয়ে যাওয়ার বেশি দেরি নেই। শিবেন তখন কোমর থেকে পিস্তল বের করে শূন্যে দুবার গুলি ছুঁড়ল। সঙ্গে সঙ্গে গেটের ওপারে নানারকম কার্যকলাপ শুরু হয়ে গেল। গাছের নিচে যারা ঘুমোচ্ছিল, তারা তড়াক করে লাফিয়ে উঠে গেটের সামনে চলে এল। কিন্তু শিবেনের গাড়িটা আসতে দেখে একটু ইতস্তত করে পাশে সরে দাঁড়াল। তখন শিবেন আবার দুবার গুলি ছুঁড়ল। তখন বাসের লোকেদের একজন ওপরে তাকিয়ে শিবেনের য়ুনিফর্ম পরিহিত মূর্তি দেখতে পেয়ে চিৎকার করে কি একটা বলল সামনে থাকা সঙ্গীদের। কিন্তু তখন তাদের কিছু করবার নেই। গাড়িটা তাদের ভেতর দিয়ে বেরিয়ে এসে তখন প্রায় বড় রাস্তায় উঠে পড়েছে। তার ঠিক সামনে তখন বাসটা।

হঠাৎ বাসের ভেতর থেকে একঝলক গুলি ছুটে এল। ফিয়াটের

মাতালের মত টলে উঠে একপাশে বেঁকে সামনে মুখ থুবড়ে পড়ল।

শিবেন কাতরে উঠে বলল, 'গেল, আমার নতুন গাড়িটা গেল!'

ইতিমধ্যে শিবেনের লোকেরা গাড়িটা ঘিরে ফেলেছে। দুজন ড্রাইভারের দিকের দরজা খুলে একজনকে টেনে বের করল। তার শার্টে রক্তের ছোপ আর দেখে মনে হল হয় অজ্ঞান নয়তো মরে গেছে। অন্য দিকের দরজা খুলে আর একজনকে বের করা হল। তার ঘাড়টা একদিকে এমন ভাবে বেঁকে গেছে যে সন্দেহ থাকে না যে তার শরীরে আর প্রাণ নেই।

সমরেশ বলল, 'দুজন ছিল দেখছি। ডানদিকেরটা তো সোমনাথ, মরে নি বোধ হয়, তবে জোর চোট পেয়েছে। অন্যটা কে? শ্যামল?'

'না।' বললেন স্বপ্না, 'ওটা একটা অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান গুণ্ডা, নাম রজার ওয়ালটন।'

সমরেশের অর্কিড রোডের ফ্ল্যাটের বসবার ঘরে কথা হচ্ছিল। দময়ন্তী বলছিল, 'বীথিকার খুন হওয়ার ব্যাপারে প্রথমেই যে ব্যাপারটা অদ্ভুত লাগে সেটা হচ্ছে খুন করার পদ্ধতিটা। লিপস্টিকে তার স্বামী বিষ মিশিয়ে রেখেছিল বলে পুলিশ ধরে নিয়েছিল। তার মানে এটা হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে খুন করা নয়। বেশ ধীরে ধীরে করা যেন হত্যাকারীর কাছে সময়ের কোন মূল্যই নেই। অর্থাৎ, হত্যাকারী বীথিকাকে মেরে ফেলতে চায়, কিন্তু সে যখন খুশি মরুক, তাতে তার কিছু যায় আসে না। সে লিপস্টিকে বিষ মাখিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছে। তাও যদি বীথিকার একটা কি দুটো লিপস্টিক থাকত। হত্যাকারী জানে যে তার অগুন্তি লিপস্টিক; তাদের সবগুলোই সে ব্যবহার করে এবং তার মত খামখেয়ালী মেয়ে কখন কোনটা করে সে ব্যাপারে নিশ্চয়ই কারুর সঙ্গে পরামর্শ করে না। তার মানে, এটা ভেবে চিন্তে খুন করা। তাই যদি হবে, যদি

তার পতিদেবতাই তাকে খুন করে থাকবে, তাহলে সে লিপস্টিকটা পুলিশ আসার আগেই সরিয়ে ফেলল না কেন? বড় ডাক্তারবাবু খুব ভাল করেই জানতেন যে মৃতদেহের পাশে পড়ে থাকা একটা লিপস্টিক তুলে নিয়ে তিনি যদি ড্রেসিং টেবিলের ওপর অসংখ্য লিপস্টিকের সঙ্গে রেখে দিতেন, তাহলে কেউ কোন প্রশ্নই করত না। আর পুলিশও কোনদিন ধরতে পারত না যে বীথিকার ঠোঁটে লেগে থাকা পটাসিয়াম সায়ানাইড এসেছে লিপস্টিক থেকে। আসলে, এই সমস্ত ঘটনাটা একটা জিনিসই প্রমাণ করে যে হত্যাকারী চেয়েছিল যখন বীথিকা মারা যাবে তখন সে যেন অনেক দূরে থাকে। এই লোক তার স্বামী হতে পারে না। তাহলে সে কে?

'শিবেনবাবু প্রথমেই বলেছিলেন যে বীথিকার স্বভাবচরিত্র ভাল ছিল না, সে নিমফোম্যানিয়াক ছিল। তাহলে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে তার কোন প্রেমিকই তার খুনের জন্যে দায়ী। সে কে হতে পারে?

'এখানে এসে বাঁশবনে ডোম কানা। বীথিকার ভালবাসার লোকের অভাব ছিল না। কাকে ছেড়ে কাকে ধরা যাবে? তাছাড়া, তাদের সকলের পরিচয় কে জানে? জানতে পারে দুজন, বৃজনন্দন আর মদনমোহন কাপ্পিলাল। কিন্তু দুজনের কেউই এ ব্যাপারে কিছু জানাবে না, কারণ এরা দুজনেই তাদের অন্নদাত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞ। এরা দুজনেই বীথিকার চরিত্রের খারাপ দিকটার প্রতি চোখ বন্ধ করে রেখেছেন।'

হেমন্ত সরকার বললেন, 'কিন্তু ডাক্তার অরিজিৎ বোসকে সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ ছিল।'

'নিশ্চয়ই ছিল। ভদ্রলোক একদিকে পাকা সাহেব, অন্য দিকে টাকার জন্যে নিজের বিবেক জলাঞ্জলি দিতে একেবারেই অপারগ নন। টাকার জন্যে যিনি নিজের আত্মীয়স্বজন, এমনকি নিজের বাবাকেও ত্যাগ করতে পারেন, তিনি যে স্ত্রী লক্ষ লক্ষ টাকা

ওড়াচ্ছেন তাঁকে খুন করতে পারেন না? অবশ্যই পারেন। কিন্তু বীথিকাকে সরিয়ে দেবার উদ্দেশ্য যদি তার হাত থেকে উদ্ধার পাওয়া হয়, তাহলে তাঁর কি উচিত ছিল না হত্যার চিহ্নগুলো সরিয়ে দিয়ে নিজের ওপর থেকে সব সন্দেহ উঠিয়ে নেওয়া? তা যদি তিনি না করেন, তাহলে বলতে হবে হয় তিনি ভয়ানক বোকা, নয়তো এমন সুপার চালু যে পুলিশ আমি যেভাবে চিন্তা করছি ঠিক সেই ভাবে চিন্তা করবে এটা ধরে নিয়েছেন। ডাক্তার অরিজিৎ বোসের পক্ষে এই দুরকমের কোনটাই হয়তো ঠিক স্বাভাবিক নয়। এ ছাড়াও ধরে নিতে হয় যে তিনি ছিলেন সুপার অভিনেতা। অন্নদাবাবু আর তাঁর দুই ছেলে বীথিকার স্বভাবচরিত্র কেমন তা খুব ভাল করেই জানতেন। তাঁদের পক্ষে বীথিকার স্বামীর মনে তার প্রতি কোন গভীর প্রেম থাকবে এটা আশা করা অসম্ভব। তাঁদের অরিজিৎকে একটু সন্দেহের দৃষ্টিতেই দেখা স্বাভাবিক। তা সত্ত্বেও রাজমোহন আর রাজকুমারের তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা প্রমাণ করে যে তারা অরিজিতের ভেতরে তাদের বোনের প্রতি কোনরকম জিঘাংসায় কণামাত্র চিহ্নও দেখতে পায় নি কোনদিন।

'এটা আরও প্রমাণ করে যে বীথিকার ব্যাঙ্ক থেকে তুলে নেওয়া টাকার প্রাপক তারা নয়। তাহলে অন্য এক ব্যক্তির উপস্থিতি প্রমাণিত হয়। অর্থাৎ, শিবেনবাবুর যে সন্দেহ যে বীথিকার জীবনের অন্ধকারময় দিকটাই তার মৃত্যুর কারণ, সেটাই সঠিক।'

হেমন্ত বললেন, 'এমন তো হতে পারে যে ওই টাকাগুলোর জন্যে দুই শালা আর ভগ্নিপতি মিলে এই কাণ্ডটা করেছে?'

'না, তা হতে পারে না। কারণ, সেক্ষেত্রে খুনটা তাড়াতাড়ি সারতে হত। অনন্ত কাল বসে থাকার মত সময় দেওয়া যেত না। যদি বীথিকার অজান্তে টাকাটা ওঠানো হয়ে থাকত, তাহলে সেটা ধরা পড়ে যাওয়ার আগেই কাজটা সেরে ফেলা দরকার ছিল।'

'বেশ, এবার তাহলে আমরা আসছি ভোলানাথ, শম্ভুচন্দ্র আর

নির্ঝরিণীর ব্যাপারটায়। এঁরা কিভাবে মারা গিয়েছেন সেটা আমরা সবাই জানি। এঁরা একসময় মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে নীলকান্তপুরে চিকিৎসার জন্যে গিয়েছিলেন। সেই সময় দুটো অবসেশন বা স্থির বিশ্বাস এঁদের সুস্থ হয়ে আসা মনের মধ্যে ঢোকানো দেওয়া হয়েছিল। এক, এঁদের আত্মীয়রা এঁদের শত্রুপক্ষ এবং দুই, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা অ্যালোপ্যাথির চেয়ে ভাল। এ দু'টোর কোনটাই খুব কঠিন কর্ম ছিল না। এঁদের নিকটাত্মীয়রা যে কী পদার্থ তা তো আমরা দেখেছি। আর মানসিক চিকিৎসায় কিছু ওষুধ বা শক থেরাপি জাতীয় কিছু ব্যবস্থা আছে যা রুগীদের মনে ভীতির সঞ্চার করে। অতঃপর এঁদের আত্মীয়দের দুর্বলতাগুলো দেখে নিয়ে সেটা কাজে লাগিয়ে এঁদের এক বিশেষ হোমিওপ্যাথের কাছে পাঠানোর বন্দোবস্ত করা হয়। এই হোমিওপ্যাথ তাঁদের কিভাবে উইল করতে হবে, কি কি ব্যবস্থা নিতে হবে, ইত্যাদি ভাল করে বুঝিয়ে দিয়ে তাঁদের হাতে হেপাটাইটিসের জীবাণুযুক্ত বিষের শিশি তুলে দেয়।

'এঁরা তিনজনে পরস্পরের পরিচিত ছিলেন না, তিনজন প্রজ্ঞাকে প্রচুর টাকা দান করে গেছেন—যেটা অনেকেই দিয়ে থাকেন, তিনজনই পরিণত বয়সে হেপাটাটিইসে মারা গেছেন যেটা নিতান্ত একটা স্বাভাবিক ঘটনা। অথচ এই ঘটনাগুলোর মধ্যে যে একটা গোলমাল আছে এবং তাদের যোগসূত্র যে নীলকান্তপুর—পুলিশ এটা আবিষ্কার করাতেই এই নিষ্ঠুর ষড়যন্ত্রটা ফাঁস করে দেওয়া সম্ভব হল।' বলে দময়ন্তী সপ্রশংস দৃষ্টিতে হেমন্ত সরকারের দিকে তাকাল। হেমন্ত একটা গ্রাম্ভারি হাসি হাসলেন বটে, কিন্তু কোন কথা বললেন না।

দময়ন্তী বলে চলল, 'এখন প্রশ্ন দুটো। এক, কে এই রুগীদের মনে অবসেশন ঢুকিয়েছেন, বীথিকা না অরিজিৎ? দুই, কে এই রজার ওয়ালটন? বীথিকা, অরিজিৎ না সম্পূর্ণ অন্য কোন লোক?

প্রথমে এক নম্বর প্রশ্নটা দেখা যাক। অরিজিতের টাকার প্রতি প্রলোভনের কথা আমরা জানি। বরং, বীথিকার কথাই জানি না। সে বড়লোকের মেয়ে, তার লোভ না থাকারই কথা। কাজেই, সন্দেহটা স্বভবাতই অরিজিতের ওপরেই পড়ে। এখন, এই ডোনেশন আর ডোনারের মৃত্যু—এ ব্যাপারটার শুরু গত বছরের আগের বছর জানুয়ারী মাসে। অর্থাৎ বছর আড়াই আগে। আমরা দেখলুম, ডাক্তার মিত্রদের বাড়ির একতলায় স্পেশাল ওয়ার্ড উঠে আসে বছর তিনেক আগে। অর্থাৎ, এই সময় থেকেই ষড়যন্ত্রের সূত্রপাত। এই ওয়ার্ড ধনী রুগীদের জন্যে। খোঁজ নিলে দেখবেন, এই তিনজনই ওই ওয়ার্ডে ছিলেন। এটা কিন্তু একটা সম্ভাবনার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করায়। তা হচ্ছে, স্পেশাল ওয়ার্ড বাড়ির নিচে উঠে আসার আগে পর্যন্ত, বীথিকার সঙ্গে রুগীদের দূরত্ব ছিল অনেক বেশি। সে পাগলের ডাক্তার ছিল না, সে চালাত ল্যাবরেটরি। মাঝে মাঝে ঘুরে দেখত হয়তো। অথচ অরিজিতের সঙ্গে রুগীদের আগেও যে সম্পর্ক ছিল, তখনও তাই রইল। উনি যদি রুগীদের মগজ ধোলাই করতে চাইতেন, সেটা অনেক আগেই করতে পারতেন। স্পেশাল ওয়ার্ড নিজের কোয়ার্টারের একতলায় উঠে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করার দরকার ছিল না। তাহলে, এই সম্ভাবনাটা জোরদার হয় যে মগজ ধোলাই-এর ব্যাপারটা বীথিকার কীর্তি, অরিজিতের নয়।

'এবার দ্বিতীয় প্রশ্ন, কে এই রজার ওয়ালটন? এই প্রশ্নের জবাব আছে রহিম ওসমান লেনে। জনাকীর্ণ এই রাস্তা যেখানে অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানরা মোটেই অপরিচিত বা অপ্রতুল নয়। সেখানে অরিজিতের মত গম্ভীর প্রকৃতির ব্যস্ত ডাক্তার মাথায় পরচুলো পরে আর চোখে কালো চশমা পরে আবদুল লতিফ নুরুদ্দিনের সঙ্গে একগাল হেসে কথা বলবেন আর তাঁর মনে কোন সন্দেহ জাগবে না, এটা কখনও সম্ভব? অরিজিতের সমস্ত পরিচিতরাই, মানে যাঁরা তাঁকে ছোটবেলা থেকে দেখছেন বা যাঁরা তাঁকে কর্মক্ষেত্রে দেখেছেন,

তাঁরা সকলেই একটা কথা বলেছেন যে তিনি গম্ভীর প্রকৃতির, হাসি ঠাট্টার মধ্যে থাকেন না আর স্বপ্নার ভাষায় তিনি শ্রীমন্ত রামগড়ুরের ছানা সদৃশ লোক—তাঁর পক্ষে এ হেন অভিনয় কখনও সম্ভব হতে পারে না। আর লম্বা বীথিকা পরচুলো পরে নকল গোঁফ-দাড়ি লাগিয়ে বেঁটে অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সাজতে পারে, কিন্তু তার পক্ষেও দিনের পর দিন মুরুদ্দিনকে ফাঁকি দেওয়া সম্ভব হত কি? তার ওপর ববি রোজারিওকেও মনে রাখতে হবে। সে কিন্তু নীলকান্তপুর বা অন্নদাচরণ মিত্রের পরিবেশের সঙ্গে মেলে না। অতএব, প্রবলতম সম্ভাবনা হচ্ছে যে রজার ওয়ালটন রজার ওয়ালটনই। অর্থাৎ, একজন শতকরা একশো ভাগ অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান যিনি কলকাতার আণ্ডারঅয়ার্ল্ড বা অপরাধ জগতের বাসিন্দা।

'তাহলে বোঝা যাচ্ছে, রজার ওয়ালটনকে কেউ এই কাজে লাগিয়েছিল। বীথিকা একা লাগিয়ে থাকতে পারে বা সে তার প্রেমিকের সঙ্গে একসঙ্গে এই কাজ করে থাকতে পারে। বীথিকার নানারকমের লোকের সঙ্গে হৃদ্যতা ছিল, তাদের কেউ অপরাধ জগতের সঙ্গে পরিচিত থাকতে পারে। অর্থাৎ, একটা ব্যাপারে সন্দেহ থাকে না যে এই ষড়যন্ত্রে যে বীথিকার সঙ্গী ছিল তার একটা ক্রিমিন্যাল রেকর্ড ছিল বা আছে। সে কে হতে পারে?

'এইখানেই আমার সন্দেহ হল সোমনাথের ওপর। তার তিনটে কারণ আছে। প্রথম কারণ, আমি আপনাদের আগেই বলেছিলুম যে এই ষড়যন্ত্রটা একটা নিরেট শয়তানী। সাধারণ মস্তিস্ক থেকে এ হেন প্যাঁচালো অথচ ক্ষুরধার বুদ্ধি বেরোয় না। এ বুদ্ধি একজন স্বাভাবিক অপরাধীর। আমরা এই ঘটনাগুলোর সঙ্গে যুক্ত যত লোকের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি, তার মধ্যে এ হেন ব্যক্তি আছেন দুজন, সোমনাথ আর শ্যামল। বাকিরা কেউ মাতাল, কেউ বেপরোয়া, কিন্তু ক্রিমিন্যাল নয়।

দ্বিতীয় কারণ, সোমনাথ আর শ্যামল, দুজনেই অসাধারণ

সুদর্শন। শিবেনবাবু একেবারে প্রথম দিন আমাদের বলেছিলেন যে বীথিকা নিমফোম্যানিয়্যাক ছিল তো বটেই, তারওপর হ্যাণ্ডসাম পুরুষ দেখলে তাদের পেছনে লাগতে দেরি করত না। সে কথাটা আমার মনে ছিল।

'তৃতীয় কারণ, সোমনাথ ওষুধের ব্যবসা করত এবং সেই সূত্রে তার নীলকান্তপুরে যাতায়াত ছিল, কেবল রুগীর আত্মীয় হিসেবে নয়। সে যদি কেবল রুগীর আত্মীয় হিসেবে ভিজিটিং আওয়ারে যেত, তাহলে তার বীথিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা তো দূরের কথা, পরিচিত হবারই সম্ভাবনা অনেক কম থাকত। স্বপ্নার সঙ্গে কথা বলে আমার দৃঢ় ধারণা হয়েছিল যে ল্যাবরেটরির ওষুধের সাপ্লায়ার হিসেবে সোমনাথের সঙ্গে তার পরিচয় হয়, হয়তো ঘনিষ্ঠতাও হয় এবং সেই তাকে তার বন্ধুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। আজ বোঝা গেছে যে আমার ধারণাটা ঠিকই ছিল।'

সমরেশ এইখানে বাধা দিল। বলল, 'কিন্তু সোমনাথই কেন? এ তো বীথিকার অন্য যে কোন প্রেমিক, আর অপরাধপ্রবণতা থাকা সম্ভব, এই ষড়যন্ত্র করতে পারত।'

'তা যে পারত না, তা নয়। কিন্তু এই মৃত্যুর ঘটনাগুলো এতই ঘড়ির কাঁটার মত অবধারিত ভাবে ঘটেছে যে এতে ভেতরের লোক যুক্ত নেই এটা ভাবা অত্যন্ত কঠিন। তারা স্বেচ্ছায় থাকতে পারে অথবা তাদের কেউ ব্যবহার করেছে, তাও হতে পারে। এটা যদি মেনে নেওয়া যায়, তাহলে সোমনাথের ওপরেই সবচেয়ে বেশি সন্দেহ হয়।

এছাড়া, আরও দুটো বিষয় আছে। প্রথম, যাঁরা উইল করেছেন, তাঁরা কিন্তু তাঁদের আশ্রিতরা, যাদের ওপর তাঁদের প্রচণ্ড রাগ, তাদের সম্পূর্ণ বঞ্চিত করেন নি। অস্থাবর সম্পত্তি হয়তো দান করেছেন, কিন্তু কাউকে ভিটেমাটি ছাড়া করেন নি। এটা তাঁরা মগজ ধোলাইয়ের ফলেই করেছেন, আপন বুদ্ধিতে করলে ব্যাপারটা

অন্যরকম হত। এতে প্রমাণ হচ্ছে যে যারা মগজ ধোলাই করেছে, হয় তারা এই রুগীদের আত্মীয়, নয়তো রুগীর আত্মীয়রা গোলমাল করলে তাদের আসল পরিচয় ফাঁস হয়ে যাবার সম্ভাবনা এড়াতে সচেষ্ট। এ ব্যাপারে পরে বলছি।

'দ্বিতীয়, প্রথমে মারা গেছেন নির্ঝরিণী, সেটা স্টেট কেস বলে ধরে নিতে পারি। তারপর গেছেন ভোলানাথ, এটাই মূল লক্ষ্য। অতঃপর শম্ভুচন্দ্র, এটা দুটো সাফল্যের পর তৃতীয় প্রচেষ্টা। এটা যদি ঠিক হয়, তাহলে সোমনাথ শ্যামল কম্বিনেশনকে কিছুতেই বাদ দেওয়া যায় না

'এইবার সম্মুখ যুদ্ধ। বিশ্বানন্দকে ডেকে এনে কড়কানো হল। তার পরদিনই ধরা হল পঙ্কজকে। অথচ, সোমনাথকে কিছু বলা হল না, কেবল ছবি চাওয়া হল। এটা ইচ্ছে করেই করেছিলুম যাতে সোমনাথের টনক নড়ে। তাই হল পরদিন সোমনাথ শ্যামল দুজনেই এসে হাজির হল। এসে এমন ভান করল যেন তাদের কেউ ভয় দেখিয়েছে। এই ভানটার প্রয়োজন ছিল। কারণ, তার পরেই ফোনে ভয় দেখানো হল মঞ্জুলাকে এবং বিশ্বানন্দকেও। এঁরা ফটো দেখে চিনে ফেলতে পারেন তাই এই সাবধানতা।'

শিবেন জিজ্ঞেস করল, 'সোমনাথই কি কামতাপ্রসাদ?'

'না। খুব সম্ভবত, শ্যামল। সে এখন স্বীকার করবে বলে আমার ধারণা। সে সিনেমায় অভিনয় করত, মেকআপ নিতে অভ্যস্ত ছিল। তাছাড়া অনেকগুলো টাকা ক্যাশে হাতবদল হচ্ছে, সেটা একেবারে নিজের লোক ছাড়া অন্য কাউকে দিয়ে করানো যুক্তিযুক্ত নয়।'

'তার মানে, আপনার ছবি চাইবার আসল উদ্দেশ্য ছিল সোমনাথকে জানিয়ে দেওয়া যে কামতাপ্রসাদের ব্যাপারটা ধরা পড়ে গেছে?'

'হ্যাঁ, তাই। সে তখন মঞ্জুলা আর বিশ্বানন্দকে ফোন করে

জানতে পারে যে আমরা অনেকদূর এগিয়ে গেছি। এবং মামা-ভাগনের সঙ্গে সজোরে ধমকে কথা বলায় তার মনে কোন সংশয় রইল না যে আমাদের সমস্ত সন্দেহ তারই ওপরে।

'মঞ্জুলার সঙ্গে কথা বলে আমার মনে হল যে খুব তাড়াতাড়ি ব্যাপারটা শেষ করে আনার সময় হয়েছে। বিশ্বানন্দ আর মঞ্জুলা ভীরু মেরুদণ্ডহীন। তারা ভয় পেলে মুখ খুলবে না। কিন্তু, আরও একজন আছে যে মুখ খুলতে পারে যদি সে জানতে পারে যে তার প্রাণের বন্ধুকে খুন করেছে সোমনাথ। সে স্বপ্না চৌধুরী, তার ঘাড়ে গিয়ে পড়ে পিঠে বন্দুক না ঠেকালে তাকে ভয় দেখানো কঠিন।'

সমরেশ বলল, 'বেশ, এ পর্যন্ত দিব্যি বোঝা গেল। কিন্তু আমার আসল প্রশ্নটার জবাব এখনও পেলুম না। বীথিকাকে মারার দরকারটা কি ছিল? বেশ তো চলছিল। দিব্যি বড়লোক রুগীদের হাপিস করে দিয়ে তাদের টাকা ঘরে তোলা হচ্ছিল। এক হতে পারে, বীথিকা অরিজিৎকে ডিভোর্স করে সোমনাথের ঘাড়ে চড়ার তালে ছিল। তাহলে অবশ্য তাকেও হাপিস করে দেওয়াটা অস্বাভাবিক নয়।'

দময়ন্তী মাথা নাড়ল। বলল, 'না, ব্যাপারটা তা নয়। বীথিকার মৃত্যুর জন্যে প্রত্যক্ষ ভাবে দায়ী হচ্ছেন তার ননদাই শ্রীবিকাশচন্দ্র ঘোষ।'

সবাই সমস্বরে বলল, 'তার মানে?'

'তার মানে বুঝতে হলে, আমাদের একটু পিছিয়ে যেতে হবে। এই ষড়যন্ত্রটা আদৌ শুরু হল কিভাবে, সেটা অনুমান করা দরকার। সোমনাথ ভোলানাথের আশ্রিত এবং তাঁর খিটখিটে মেজাজের জন্যে পদে পদে অপমানিত ছিল। ভোলানাথকে চিরতরে সরিয়ে দেবার ইচ্ছে নিশ্চয়ই তার অনেকদিনের। কিন্তু সে জানত যে ভোলানাথ ঘুঘু লোক, তাঁর উইলে যে কাকে কি দেওয়া আছে তা জানা দুঃসাধ্য। যখন বীথিকার সঙ্গে তার অবৈধ সম্পর্ক স্থাপিত হল,

তখন দেখা গেল যে এরকম একটা ষড়যন্ত্র করা সম্ভব হলে সে তিনটে উদ্দেশ্য সফল করতে পারে—এক, ভোলানাথের স্থাবর সম্পত্তি দখল করতে পারে ; দুই, তার অস্থাবর সম্পত্তি নিজের হস্তগত করতে পারে ; তিন, ভোলানাথকে সরিয়ে দিতে পারে।'

সমরেশ বলল, 'এত ঝামেলা করার কি দরকার ছিল ? মগজ ধোলাইয়ের ব্যাপার তো ? ভোলানাথকে দিয়ে সব সম্পত্তি সোমনাথকে লিখিয়ে নিয়ে তাঁকে চন্দ্রবিন্দু করে দিলেই ঝামেলা মিটে যেত।'

'না, একেবারেই মিটত না। উকিল মহাদেব রায় আর ডাক্তার বিমল দাশগুপ্তের কথাগুলো ভেবে দেখ। তাঁদের মক্কেল যে উইল করেছেন, তাতে কিন্তু তাঁদের মনে কোন সন্দেহই জাগে নি, তুমি যেরকম বলছ সেরকম হলে ব্যাপারটা অন্য রকম হত। আর যদি কোন কারণে হেপাটাইটিসের বিষ কাজ না করত এবং রুগীর মৃত্যু না হত, তাহলে এ ব্যাপারে একটা খোঁজখবর শুরু হতই। সোমনাথ সেই ঝুঁকি নিতে পারত না। উকিল আর ডাক্তারদের বাদ দেওয়া সম্ভব নয়, কারণ যিনি একবার মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছেন, তাঁর স্বহস্তলিখিত উইল একমাত্র গ্রাহ্য হতে পারে যদি তাতে এই এঁদের সাক্ষী হিসেবে সই থাকে। তখন আর সেটাতে কোন সন্দেহ করার প্রশ্ন ওঠে না বা সেটা চ্যালেঞ্জও করা যায় না।

'এখন, ষড়যন্ত্রটা যখন সফল হল, বীথিকা তার প্রেমিককে মোটা টাকা সরিয়ে দিতে লাগল এবং সোমনাথের ব্যবসা বেশ ফুলে ফেঁপে উঠতে শুরু হল, তখন অরিজিৎ বিকাশ ঘোষকে নীলকান্তপুরে নিয়ে এলেন। বীথিকা যে টাকা সরাচ্ছে সেটা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, বীথিকাকে এ ব্যাপারে কিছু বলার ক্ষমতা বা প্রবৃত্তি কোনটাই তাঁর ছিল না। অথচ রুগীদের ডোনেশনের টাকা বেরিয়ে যাচ্ছে, সেটা ঠেকানো দরকার। অতএব বিকাশ ঘোষের ডাক পড়ল। বিকাশ অ্যাকাউন্ট্যান্ট এবং অরিজিতের প্রতি সহানুভূতিশীল। এই টাকা

কোথায় যাচ্ছে সেটা খুঁজে বের করার জন্যে তাঁর চেয়ে উপযুক্ত লোক আর কে আছে বিশেষত যেখানে কাঞ্জিলালের কাছ থেকে এ ব্যাপারে সাহায্য পাওয়ার আশা বৃথা।

'বীথিকা কিন্তু ব্যাপারটা তৎক্ষণাৎ হৃদয়ঙ্গম করল। সে পত্রপাঠ বিকাশকে তাড়িয়ে দিল এবং সোমনাথের সঙ্গে পরামর্শ করতে বসল। সোমনাথের মাথায় তখন আকাশ ভেঙে পড়ল। যে টাকাটা তারা দুজনে সরিয়েছে, সেটা সাদা টাকা হিসেবেই ব্যাঙ্কে জমা পড়েছে। অতএব, যদি সেটা কোন ভুয়ো কোম্পানীর নামেও গিয়ে থাকে, তাহলেও পুলিশের পক্ষে ইনভেস্টিগেশন করে সোমনাথ পর্যন্ত এসে পৌঁছনো অসম্ভব নয়। আর তখন বৃহত্তর বিপদের সম্ভাবনা। সোমনাথ ভাল করেই জানে যে কোন বড়যন্ত্রই একেবারে নিশ্ছিদ্র ভাবে সুরক্ষিত হতে পারে না। তারওপর তার হাতে তিন তিনটে মৃত্যুর দায়।

'তখন সে কি করতে পারত? তারা যেখানে টাকাটা সরিয়েছিল, প্রথমে সেটার সমস্ত চিহ্ন বিলোপ করা। তার সহজতম রাস্তা ছিল ডাক্তার অরিজিৎ বোসকে খুন করা। আমার বিশ্বাস, এই দ্বিতীয় কর্মটি করতে গিয়ে তারা ব্যর্থ হয়েছিল। কারণ, অরিজিতের সঙ্গে বীথিকার কোন সম্পর্ক নেই। তিনি থাকেন আলাদা। কখন আসেন, কখন যান, কোন হিসেব বীথিকার জানা নেই। অতএব, তাঁকে খুন করতে গেলে প্রত্যক্ষ ভাবে করতে হয়। সেটা ওই জায়গায় সম্ভব নয়।

'এছাড়া, আর একটা সম্ভাবনা আছে যেটা আমার ধারণা সবচেয়ে প্রবল। তা হচ্ছে, বীথিকার কাজ ছিল রুগীদের মগজ ধোলাই করে বোস-দম্পতিই যে তাদের একমাত্র শুভানুধ্যায়ী এবং হোমিওপ্যাথ যে শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা, এই দুটি ধারণা তাদের মনে ঢোকানো। রুগীদের কিভাবে মৃত্যু হত, সেটা হয়তো সে জানত না। আর টাকার যখন বৃষ্টি হচ্ছে, তখন কেই বা তার খবর রাখে?

এইটাই যদি ঘটনা হয়, তাহলে অরিজিৎকে খুন করাতে বীথিকার অস্বীকার করাই স্বাভাবিক।

'অতএব, বীথিকার চিহ্নও বিলোপ করার ব্যবস্থা করা হল। সেই তো এই ষড়যন্ত্রের একমাত্র সাক্ষী। সোমনাথেরও কোন ভাবনা নেই। সে জানত যতদিন সে বীথিকার সঙ্গে ভালবাসার খেলা চালাবে ততদিন কোন ভয় নেই। বীথিকা মুখ খুলবে না। এমন-কি বীথিকা যদি তাকে কখনও তাড়িয়েও দেয়, তাহলেও হয়তো সে এ ব্যাপারে কোন কথা বলবে না, কারণ সেক্ষেত্রে তারও ফেঁসে যাবার সম্ভাবনা। কিন্তু তাই বলে তো তাকে আর বাঁচিয়ে রাখা যায় না। স্ত্রীয়াশ্চরিত্রং—কখন যে কি করে বসে?'

সমরেশ দুঃখিত ভাবে মাথা নেড়ে বলল, 'যা বলেছ। ডাক্তার অরিজিৎ বোস নিশ্চয়ই অনেক পাগলকে সুস্থ করে তুলেছেন, কেবল নিজের ঘরের পাগলটিকে চিকিৎসা করে উঠতে পারলেন না। বীথিকার নিমফোম্যানিয়া যদি সারাতে পারতে, তাহলে হয়তো এতগুলো বিয়োগান্তক ঘটনা ঘটত না। তবে, কে জানে, হয়তো এ রোগের কোন চিকিৎসাই নেই।

আনন্দ বাগচী

বিজন কার্টুন আঁকতো না আমরা জানতুম। কিন্তু প্রিন্সিপাল সেকথা বোঝেন নি। তিনি বিজনকে ভুল বুঝেছিলেন। আর তাই আর্ট কলেজ থেকে পাশ করে বেরুবার আগেই তাকে বেরিয়ে যেতে হয়েছিল।

বিজনকে এককথায় চেনাতে হলে তাকে থট পেইন্টার বলতে হয়। কিন্তু এই সহজ সংজ্ঞাটা অনেক পরে জেনেছি আমরা। তার জীবিতকালে তাকে চিনেছিলাম প্রতিভাবান বলে। অসাধারণ বলে।

অসাধারণ হলেও বিজন আমাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল। আমার আর পরেশের। আমরা ছিলাম আর্ট কলেজের সাধারণ স্তরের ছাত্র। বছর বছর যেমন দলে দলে ডিগ্রী নিয়ে বেরোয়। বর্ণ-পরিচয় এবং রেখার জ্ঞান আমাদের আর পাঁচটা ছাত্রছাত্রীর মতই হয়েছিল। আমরা যা দেখতাম তাই আঁকতে পারতাম। কিন্তু তার বেশি নয়। শিল্পের ব্যাকরণ আমরা আয়ত্ত করেছিলাম, রঙের সন্ধি আর সমাস আমাদের জানা ছিল এবং শরীরতত্ত্ব বা অ্যানাটমি ছিল নখদর্পণে। অর্থাৎ তুলিকলমের ডগায়। কিন্তু তার বেশি কিছু নয়।

আর বিজনের হাত ছিল অন্য ধাতুতে গড়া। সে চক্ষুষ্মান ছবি আঁকিয়ে ছিল না। তার তুলি ছিল তীক্ষ্ণ এবং অসাধারণ, চোখের সাহায্য ছাড়াই ছবি ফোটাতে পারত। তার মানে এই নয় যে, সে চোখ বুজে ছবি আঁকতো। তার মানে এই, মনে হত এক অন্ধ আবেগে ভেতর থেকে বিজনের ছবি আসছে। ডার্ক রুমে বসে আলোকচিত্রশিল্পী যেমন করে তার নিকষতম নেগেটিভ থেকে ছবি বার করে আনে।

কলেজ থেকে বেরিয়ে দেখলাম, নিছক শিল্পচর্চা করলে পেট ভরবে না। বাংলা দেশে ছবি আঁকিয়ে-কে কেউ বসিয়ে খাওয়াবে না। ফাইন আর্টস ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো। তাই প্রকাশক আর সম্পাদকদের দরজায় দরজায় ঘোরাফেরা শুরু করলাম। গল্প উপন্যাসের ছবি আঁকার কাজ যদি পাওয়া যায়। কিছু কিছু ঘনিষ্ঠতাও হল। কোন কোন লেখক ব্যক্তিগতভাবে আমাদের কাজ পছন্দও করতে লাগলেন। কিন্তু সে শুধু আমার আর পরেশের, বিজন বেচারী কোণঠাসা হয়ে পড়লো। আমরা সামান্য যা রোজগার করি বাসাভাড়া দিয়ে তাইতেই কোনমতে দিনগুজরান হয়। উড়োন চড়ুইয়ের দল। ইঁটের কোটরে বাসা, খাই হাত পুড়িয়ে। পিছুটান বলতে কিছু নেই। কোন কোন দিন পকেটে পাই পয়সাটাও তলানি পড়ে থাকে না। ধর্মতলা কলেজ স্ট্রীট পায়ে হেঁটে দুপুরগুলো কাটে, লণ্ড্রির পয়সা নেই হয়তো, চারমিনার নিভিয়ে নিভিয়ে খাই, এককাপ সস্তা চায়ের জন্যে প্রায় চাতক হয়ে থাকি।

আবার হঠাৎ কাজ এসে যায় হাতে। সঙ্গে সঙ্গে আকবর বাদশা। তখন কে কাকে কেয়ার করে। নতুন তুলি কেনা হয়, রঙের টিউব। দু'চারদিন গোল্ডফ্লেকের ধোঁয়ায় মেজাজ প্রসন্ন থাকে। রেস্তোরাঁর কোণে বসে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখা হয়। একটা ছবির একজিবিশান ঝোলাতে পারলে কেমন হয়। যাতে থাকবে এই যুগের যন্ত্রণা আর স্বপ্ন। নতুন এক্সপেরিমেণ্ট, নতুন কিছু কেরামতি। আর সেই আর্ট একজিবিশানে বিজন আমাদের অ্যাসেট। আজকের দিনের গোলা দর্শক তার ছবির মধ্যে রেখা রঙের গোলোকধাঁধার মধ্যে খুঁটে খাবার দানা পাবে না নিশ্চয়। এবং তার উদ্ভট চিন্তাকে পাগলামী ছাড়া অন্য কিছুও ভাববে না। কিন্তু কলারসিক, যোগ্য সমজদার লাখে কি আর দু-চারটে বেরোবে না। এদেশ বলেই আশঙ্কা, নইলে হত ইউরোপ কি আমেরিকা,

বিজনের চিন্তার মূল্য নিশ্চয়ই মিলত।

কিন্তু একজিবিশান অনেক টাকার ধাক্কা। ফুটপাথের রেলিঙে ছবি ঝুলিয়ে কোন লাভ হবে না আমরা জানতুম। তাই খাতা দেখা পর্যন্তই, কাজে কলমে এগোতো না। কিন্তু তবু আমরা ধীরে ধীরে জীবন সংগ্রামে তলিয়ে যাচ্ছিলাম না। এক এক ধাপ করে উঠছিলাম।

বছর খানেক পত্রপত্রিকায় কাজ করলাম, কভার আঁকলাম, কিন্তু দেখলাম লেখকদের চেয়েও আমাদের অবস্থা অতি দীন। আমরা ছবির জন্য সামান্য পারিশ্রমিক পাই। আমাদের ছবির সংস্করণ বা মুদ্রণ ঘটে না। একবার ছাপা হলেই ফুরিয়ে যায়। না গেলেও দ্বিতীয়বার তার জন্যে আমরা টাকা পাই না। এবং নামও। এক কোণে একটি সংকেত অক্ষর ছাড়া আমাদের স্বাধীকার ঘোষণার কোন উপায় থাকে না।

ভেবে দেখলাম কমার্শিয়াল আর্টেই যখন জীবিকা বাঁধা রয়েছে, তখন আর নিজেদের মানসম্মান খুইয়ে পস্তাই কেন। একটা স্টুডিও গড়তে হবে, একটা অফিস সেই সঙ্গে। তাছাড়া বিজনের কথাও ভাবতে হবে। ও এমনই খাপছাড়া যে ও কোনদিন এই সাধারণভাবে নিজের অন্নের সংস্থান করে নিতে পারবে না। সেদিকে ওর ভ্রূক্ষেপও নেই।

আমি আর পরেশ অনেক ঘোরাঘুরি করে দুটি ইউরোপীয়ান ফার্মে কাজ যোগাড় করে নিলাম। মাইনে ভালো, কাজও কম। সৌভাগ্য দেখা দিল এতদিন পরে। এইবার একটা কিছু করা যাবে। অন্তত স্টুডিও, অন্তত একটা অফিস। ভাবলাম আমরা। বিজনের উৎসাহও কম নয়। কতদিন রঙ খরচ করার মত কাগজ কিনতে পারে নি বেচারা। ছবি আঁকার চর্চা প্রায় বন্ধের দাখিল। এইবার আর যাই হোক তুলিকলমে কিছু চিন্তা করতে পারবে ও, কিছু নতুন চিন্তা, সেই সঙ্গে আমাদের স্বাধীন ব্যবসাও চলবে ..কা

অপারেটিভ বেসিসে।

অনেক খুঁজে খুঁজে পার্ক স্ট্রীটে একটা ফ্ল্যাট বার করলো পরেশ। এ বিষয়ে তার জুড়ি নেই। চারতলায় ঘরগুলো, তা হোক। প্রায় তিন দিক খোলা। নতুন ধাঁচের বাড়ি। ট্রাম হাতের কাছে, বাসও। আবার সেই সঙ্গে নিরিবিলিও। ভাড়াটা একটু বেশিই, তা হোক। এটা আমাদের কেবল পেশাঘর নয়, নেশার জায়গাও বটে। আর তাই এমনিই একটা ফ্ল্যাটের প্রয়োজন আমাদের ছিল, যেখানে বসে কাচের বিরাট জানলা দিয়ে সূর্যাস্তের সমারোহ দেখতে পাওয়া যাবে। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের পশ্চিমে যে সূর্য প্রতিদিন অফিস ছুটির পর অস্ত যায় ; যে গোধূলি দেখা যায় আউটরাম ঘাটে।

আমাদের এই চিত্রপ্রতিষ্ঠানটির নাম দিয়েছিলাম 'ক্লোজআপ'। নামটা অনেকদিন থেকেই মনের মধ্যে ছিল, এবার সাইনবোর্ডে আর লেটার হেডে বসলো। আমাদের তিনজনের মধ্যে যে নিগূঢ় অন্তরঙ্গতা, যে বন্ধুত্ব এবং যে আদর্শ আমাদের জীবনকে এত অর্থনৈতিক দুর্যোগের মধ্যেও ঊর্ধ্বমুখী করে রেখেছিল, তাকে সার্থকভাবে বোঝাতে গেলে এই নাম দেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। এবং সেই সঙ্গে আমরা পোট্রেট এবং অয়েল-পেন্টিং এবং ফ্রেস্কোর কাজ করতাম তার নিশানা দেওয়া ছিল। বিজ্ঞাপনের ছবি আঁকার কাজই ছিল মুখ্যতঃ প্রধান, সুতরাং ব্যবসায়িক স্বার্থকে ক্লোজআপে ধরে দেবার দায়িত্বও আমাদের তুলিকলম গ্রহণ করেছিল। যাই হোক, বিনা সমারোহে ক্লোজআপের প্রতিষ্ঠা হল।

বিজনের কাছে থাকে ফ্ল্যাটের চাবি। সে যথাসময়ে এসে স্টুডিও-অফিস খোলে। দুপুরটা পার করে দেয়, বিকেল নামে, আমরা অফিস থেকে আড্ডাখানায় ফিরে আসি। দিনের খবর নিই, গল্প করি, খাবার খাই। তারপর নতুন উদ্যমে স্টুডিওতে গিয়ে বসি। প্রথম প্রথম ফাঁকা ; কোন কাজ কর্ম আসে না। নিজেরা বাইরে

থেকে যা জুটিয়ে আনি, সেই সব স্কেচ-ড্রইং হয়, বাইরে থেকে কোন পার্টি এসে আমাদের ফ্ল্যাটে ওঠে না।

এক শনিবারের কথা স্পষ্ট মনে পড়ছে। অফিস থেকে সকাল সকাল স্টুডিওতে ফিরছি আমি আর পরেশ। চারতলায় উঠে দেখি অফিস ঘরে দু'জন ভদ্রলোক বসে আছেন, কিন্তু বিজন নেই। স্টুডিও ঘরে গিয়ে দেখি তাজ্জব কাণ্ড। এক বিরাট বপু ভদ্রলোক মুখে হাসি ফুটিয়ে বসে আছেন আর বিজন তাঁর ছবি আঁকছে।

ইজেলে গিয়ে উঁকি মারার ইচ্ছে প্রচুর হলেও আমরা ফিরে এলাম অফিসঘরে। বসে থাকা লোক দুটির সঙ্গে আলাপ করে জানলাম, কোন একটা ছোটখাট কোলিয়ারির ম্যানেজার এসেছেন নিজের অয়েলপেইন্টিং করাতে। কাগজে আমাদের বিজ্ঞাপন দেখেই আসা। তাছাড়া এদিকেই কাজের প্রয়োজনে তাঁদের আসতে হচ্ছে কয়েক দিন ধরে।

আটঘণ্টাটাক পরে আমাদের শাঁসালো খদ্দেরটি, সদলবলে চলে যেতেই আমরা ছুটলাম বিজনের ইজেলের দিকে। বিজন তখন তার রঙমাখা পাঞ্জাবি, পায়জামা পরেই ইজিচেয়ারে বসে রেস্ট নিচ্ছিল। মুখটা গম্ভীর। ইজেলে একটা মানুষের কুয়াশা ধরা দিয়েছে। আবক্ষ ছবি হবে বোঝা গেলেও, সবটা তখনো আঁকা পড়ে নি। রঙ তখনও স্পষ্ট হয় নি, রেখাগুলো অর্থহীন কাঠামোর মত বিভ্রান্ত। কোথাও কোথাও ফ্যাকাশে রঙের ছোপ পড়েছে, যেগুলোকে শিল্পী টেনে নিয়ে যাবে, বিস্তার দেবে, রেখার মোড় ফেরাতে সাহায্য করবে। কোন কোন পুঞ্জীভূত অন্ধকার থেকে আলো আসবে। একটি মানুষের দেহের জন্ম হচ্ছে, হতে যাচ্ছে; তারই যন্ত্রণা ক্যানভাসের ওপরে তালগোল পাকিয়ে আছে, মেঘলা করে আছে সমস্ত পটভূমিকা।

কোলিয়ারি মালিকের চেহারার কোন ইঙ্গিত পেলাম না যদিও, নাক, মুখ, কান, চিবুকের স্থূলত্ব, কপালের ঢেউ সমস্ত কিছুই ছড়িয়ে

আছে ইতস্তত, এই প্রথম দিনে তাই থাকে, ভ্রূণাক্ষরে এমনিই হয়ে থাকে খানিকটা, তবে এ যেন খানিকটা বাড়াবাড়ি।

বিজনের অন্যমনস্ক ঠোঁটের মধ্যে একটা গোল্ডফ্লেক গুঁজে দিয়ে আগুন ছুঁইয়ে দিয়ে বললাম, 'রেঞ্জের মধ্যে তাহলে এসে গেল?'

ধোঁয়ার কুণ্ডলী হাতের বাতাসে সরিয়ে দিয়ে বিজন বলল, 'ক্যারেক্টার এসে গেছে। লোকটা একটা আস্ত কোলাব্যাঙ!'

জানলা দিয়ে অনেক দূরে তাকিয়ে থাকলো। পরেশ আমার মুখের দিকে তাকালো জিজ্ঞাসু চোখে। কিন্তু ব্যাপারটা আমিও সঠিক বুঝতে পারি নি তখনো। সাংসারিক প্রশ্ন করলাম বিজনকে, 'টাকা পয়সার কথা কিছু বলেছিস, না শেষ পর্যন্ত ব্যাঙের আধুলি ভক্ষন হবে?'

বিজন তখনও যেন অন্য জগতের অধিবাসী। ধূসর গলায় বলল, 'পাঁচশো টাকা, তিনশো আগাম দিয়ে গেছে, এই নে—'

পাঞ্জাবির পাশ পকেট থেকে তিনখানা নোট কাঁচা শালপাতার মত আমার দিকে ছুঁড়ে দিল। টাকাগুলো কুড়িয়ে নিয়ে আমি চিন্তিত গলায় বললাম, 'একটু সাবধানে ছবিটা আঁকিস, পাগলামো করিস না। খদ্দের…'

'প্রভুর সমান!' পরেশ রসিকতা করে জুড়ে দিল।

বিজন কোন কথা বলল না উত্তরে। অনেকক্ষণ পরে কেবল বলল—'ছবি ভেতরের জিনিস।'

কিন্তু এই ভেতরের জিনিস আমাদের অনেক ভুগিয়েছিল। প্রথম দিনের সূচনা বহুদিনের জের টেনেছিল। ভদ্রলোকের অয়েল-পেন্টিং আঁকা হয়েছিল যথাসময়ে, কাজে কুঁড়েমি ছিল না বিজনের। ওর হাত খুব পাকা। তুলিকলমের ডগা ওর মনের মতই, একটুও কাঁপে না। তাই ছবি সম্পূর্ণ হতে দেরি লাগে নি। ছবি আঁকা হল, ভালো পাকিয়ে ডেলিভারি গেল, আমি পরেশ কিছুই জানি

না, কিন্তু সপ্তাহখানেক পরে যখন ফেরত এলো, কলকাতায় একখানা চিঠিও তার সঙ্গে তখন সবকিছু আমাদের চোখে পড়লো।

ভদ্রলোকের দিক থেকে কোন দোষের কিছু দেখি না। কেউ নিজের অয়েলপেইন্টিং বাঁধাতে গিয়ে একটা কোলাব্যাঙের ছবি নিশ্চয়ই দেওয়ালে যত্ন করে টাঙাবে না। বিজন যে ভদ্রলোকের ছবি না এঁকে জলজ্যান্ত একটি ব্যাঙের ছবি এঁকেছিল তা নয়, একটি হুবহু মানুষের ছবির মধ্যে একটি ব্যাঙের মূর্তিকে মিশিয়ে দিয়েছিল আশ্চর্য কৌশলে। দুটো রূপ একসঙ্গে দেখা যেত না। মনে হত মানুষটার মধ্যে থেকে একটা অশরীরী আত্মা ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করছে, ধীরে ধীরে স্পষ্ট হচ্ছে। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলে ভদ্রলোকের সমস্ত ক্যারেক্টার অবয়বহীন হয়ে একটি অকৃত্রিম ব্যাঙে পরিণত হয়ে ওঠে।

পাঁচশো টাকা আবার ফেরত দিতে হয়েছিল মানে-মানে। কিন্তু ছবিটা নষ্ট করা হয় নি, আমাদের স্টুডিও গুদামে জমা হয়েছিল।

বিজনকে বললাম, এ তুই কি করলি?

বিজন ক্লান্ত বিষণ্ণ ভঙ্গিতে চোখের ওপর হাত চাপা দিয়ে বলল, আমার কিছু করার থাকে না রে, আমার অভিশপ্ত হাত—

কান্নার মত করুণ শুনিয়েছিল সেদিন বিজনের কথাগুলো, বিশেষ করে বিজনের গলার স্বর। তাতে আমরা কেউ কথা বলবার ভাষা খুঁজে পাই নি। শুধু পিঠে হাত রেখে বলেছিলাম, ঠিক আছে, কমার্শিয়াল রাস্তা তোর নয়। তোর যা মন চায় তুই আঁক, স্বাধীনভাবে আঁক।

বুঝেছিলাম বিজনের রক্তের মধ্যেই পাগলামির বীজ রয়েছে। ইনস্ট্যানিটি প্রতিভার একটি লক্ষণ। সাধারণ হওয়া আর অসাধারণ হওয়ার মধ্যে যে সীমারেখা তা অপ্রকৃতিস্থতার। বিজনের মা রাঁচীর মেণ্টাল হস্পিটালে মারা গেছেন। বিজনের মামা পাগল। এই অন্ধ, অন্তর্ভেদী রঙ আর রেখার স্রোতের মধ্যে [illegible]

মারা যাবে। উপায় নেই, নিয়তি কেন বাধ্যতে।

আর্ট কলেজের দিনগুলোর কথা মনে পড়লো। মিউজিয়ামের আশপাশ দিয়ে যখন হেঁটে বেড়িয়েছি, যখন চৌরঙ্গীর জনসমাগমের মধ্যে আমাদের চোখ তিনটে রঙের তুলির মত ঘুরে বেড়িয়েছে, সেইসব দিনগুলোর কথা মনে পড়লো। যখন আমাদের স্টাডির বিষয় ছিল ফুচকাওলা, বুটপালিশ ছোকরা, দেহাতি মেয়েপুরুষ, প্রেমিক-প্রেমিকা, বে-ওয়ারিশ কুকুর, ফেরিওলা, বাসের জানলায় বসা বাসবদত্তা। যখন আমরা প্রকৃতির ছবির সঙ্গে সঙ্গে, ল্যাণ্ড-স্কেপের পাশাপাশি অগণিত মানুষের চলন্ত স্কেচ এঁকেছি। যখন জাহাজ ঘাটে, ডকে মেহনতি মানুষের মিছিল ফুটে উঠেছে।

প্রায়ই এমন হত, বিজন চাপা গলায় বলে উঠতো, ছাখ ছাখ, একটা ক্যাঙারু আসছে।—কিংবা বলত,—বক দেখেছিস ?

দেখতাম। বলাই বাহুল্য পশু বা পাখি নয়। মানুষ। তাকিয়ে শেষ পর্যন্ত তাই মনে হত। দেখতাম কখনো হুড খোলা ঝরঝরে মোটর, কখনো মুখ তোবড়ানো লরি হেডলাইট শুদ্ধু এক একটি যান্ত্রিক মূর্তি ফুটে উঠতো মানুষের মুখে। অবাক হতাম। কখনো বা দ্রুত চলন্ত গাড়িগুলিকে সনাক্ত করে যেত বিজন এক-এক চরিত্রের মানুষের ভূমিকায়। কখনো বলত, ঝুনঝুনওয়ালা চলেছেন, এই যে প্রফেসার, হাতুড়ে বদ্যি চলেছে, আহা ইনসিওরেন্সের দালাল ইত্যাদি।

ছেলেমানুষী বলে তখন উড়িয়ে দিতে পারতুম না বিজনের রানিং কমেন্টারী। আজ সেই কথাই মনে পড়লো। বিজন যেন সেদিনের মন্তব্যগুলোই কাগজে-কলমে ধরতে শুরু করেছে। ডুয়েল পার্সোনালিটির মতই মানুষের দৈহিক দুটি রূপ আছে। একটিতে তার জীবন, অন্যটিতে তার চরিত্র।

(শেষাংশ ২৫৭ পৃষ্ঠায়)

একটি ভুলের জন্য

সন্তোষ চট্টোপাধ্যায়

হরিশ প্যাটেল করিৎকর্মা পুরুষ। চেহারা সিনেমার নায়কোচিত, দীর্ঘকায়, তেমনই ফর্সা, চমৎকার নাক-মুখ-চোখ। এক কথায় প্রথম দর্শনেই জয় করে নেওয়ার মতই পুরুষ।

হরিশকে সেদিন দেখা গেল বোম্বে শহরের এক নামী হোটেলের সাত নম্বর রুমে বসে সুরাপানে মত্ত থাকতে। এই সাত নম্বর রুমে থাকা হরিশের অদ্ভুত একটা বাতিক। যখনই কোন হোটেলে সে

কোন ঘর ভাড়া নেয়, তখনই সাত নম্বর রুমই তার পছন্দ।

হরিশ আরামে পা ছড়িয়ে সোফায় বসে হাতে ধরা বীয়ারের গ্লাসে পাত্র থেকে কয়েক টুকরো বরফ ফেলে দিয়ে গ্লাসটা চোখের সামনে তুলে স্বপ্নালু চোখে তাকাল। হালকা বাদামী পানীয়ের মধ্যে জোরালো টিউবের আলো চমৎকার দেখাচ্ছিল। মৃদু স্বরে গুনগুন করে গান গাইছিল হরিশ। আজ সত্যিই তার আনন্দের সীমা নেই।

আজ আনন্দিত হওয়ার বিশেষ একটা কারণ অবশ্যই আছে হরিশ প্যাটেলের। বিরাট একটা দাঁও মারার মস্ত সুযোগ আজই হাতে এসেছে হরিশ প্যাটেলের। শুধু সুযোগটা কৌশলে কাজে লাগানো দরকার। এ বিষয়ে অবশ্য তেমন ভাবছে না হরিশ। কারণ এ ধরণের কাজে তাকে টেক্কা দেবার মত মানুষ খুব কমই আছে। এখানে দাঁও মারার ব্যাপারটা শুধু একজনকে কব্জা করা। অর্থ নয়, লোকটাকে ওর চাই, অন্য উদ্দেশ্যেই।

হরিশ প্যাটেল রূপবান, পোশাক-পরিচ্ছদ তার একেবারে কেতা-দুরস্ত, অত্যাধুনিক। কিন্তু যারা তাকে জানে, তারাই তার চরিত্রের ভয়ানক দিকটার সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। যদিও হরিশ প্যাটেলকে চেনে এমন লোকের সংখ্যা বেশি নেই, যেহেতু হরিশের নানা রূপ। ভারতের নানা রাজ্যে হরিশ প্যাটেলের অবাধ আনাগোনা, তাই চট করে ছদ্মবেশ ধারণ করে আত্মগোপন করা তার কাছে কোন সমস্যাই নয়। আর তাছাড়া—

হ্যাঁ, এই তাছাড়া ব্যাপারটা চিন্তা করলেই আতঙ্কে শিউরে ওঠা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না হরিশ প্যাটেলের সংস্পর্শে আসা মানুষদের। হিংস্র শ্বাপদের মতই ভয়ঙ্কর মানুষ প্যাটেল। মানুষ খুন করতে তার হাত কাঁপে না এক মুহূর্তের জন্যেও। কতজনকে সে অবলীলাক্রমে নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে হত্যা করেছে তার সংখ্যা নিজেই মনে করতে পারে না হরিশ প্যাটেল। পথের কাঁটা উপড়ে ফেলাই তার মূল

রীতি। সে একটা কথা ভালই জানে, মরা মানুষ কথা বলে না।

দৃষ্টিনন্দন চেহারা আর বাইরের ওই আবরণ একটা ছদ্মবেশ মাত্র তার। আসলে সে একজন ভয়ঙ্কর রক্তপিপাসু পেশাদার খুনী। সমাজের উপরতলার লোভী, শঠ মানুষরাই তার মক্কেল। অর্থের বিনিময়ে সে তাদের হয়ে কাজ উদ্ধার করে আর অবলীলায় খুন করে। এখানে সে রক্তলোলুপ এক নরখাদক, শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়াতেই তার আনন্দ। প্রচুর অর্থই সে পরিবর্তে পায়।

হরিশ প্যাটেল তিনদিন আগে বোম্বাই এসেছে এমনই এক উদ্দেশ্য নিয়ে। বিলাসবহুল এই হোটেলে সে আরামে দিন কাটাচ্ছে একজনের অপেক্ষায়। যে তার সঙ্গে দেখা করতে আসবে তার নাম ব্রীজমোহন। ব্রীজমোহন সম্বন্ধে ভাল করে খোঁজ নিয়েছে হরিশ, কারণ কোন শিকার করার আগে তার নাড়ী-নক্ষত্র জেনে নেওয়াই ওর রীতি।

ব্রীজমোহনের নাম হরিশ প্রথম শোনে দালিয়ার কাছে।

দালিয়ার নামটা মনে পড়তেই কেমন ক্ষণিকের জন্য আনমনা হয়ে গেল হরিশ। এটা ওর চরিত্রের সঙ্গে একেবারেই বেমানান।

দালিয়া কলকাতা শহরের এক নাচনেওয়ালী। অপরূপা দালিয়া। তার সঙ্গে বিচিত্র এক পরিবেশে একদিন পরিচয় হয় হরিশের। হরিশ অর্থলোলুপ হলেও সুন্দরীদের সান্নিধ্য এড়িয়ে চলে না, সুযোগ আর অবকাশ মিললে তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে সে পিছিয়ে আসে না। দালিয়াও এইভাবে তার সামনে এসে পড়েছিল।

দালিয়ার ডেরাতেই দিনের পর দিন কাটাচ্ছিল হরিশ, সেই সময়েই এক রাতে পুলিশ হানা দেয় সেই ডেরায়। হরিশ সেই রাতেই দালিয়ার কাছে জানতে পারে ব্রীজমোহনের নাম। ব্রীজ-মোহন এক অন্ধকারে ঘেরা মাফিয়া রাজত্বের একচ্ছত্র অধিনায়ক। বিশাল এক আন্তর্জাতিক চোরাচালানের কর্তা সে। কিন্তু কেউ তাকে দেখে নি। সম্পূর্ণ আড়ালে থাকলেও তারই অদৃশ্য অঙ্গুল

সেখানে পরিচালিত হয় দেশব্যাপী কর্মকাণ্ড।

কিন্তু পুলিশ দালিয়ার ডেরায় হানা দিল কেন এ প্রশ্নের উত্তর সঠিক সেদিন পায় নি হরিশ প্যাটেল। ওর ষষ্ঠ রিপুর মধ্য দিয়ে হরিশ শুধু বুঝতে পেরেছিল এখান থেকে অবিলম্বেই পালানো দরকার। পালিয়েও ছিল হরিশ প্যাটেল ঠিকই, কিন্তু অনেক মূল্যই তাকে সেদিন দিতে হয়।

পুলিশের গুলি সেদিন দালিয়ার সারা দেহটাই ঝাঁঝরা করে দিয়েছিল। বেঁচে গিয়েছিল হরিশ প্যাটেল ঠিকই, কিন্তু দালিয়ার রক্তে সেদিন সে তর্পণ করে শপথ নিয়েছিল ব্রীজমোহনকে তার চাইই। চাই চরম প্রতিশোধ নেবার জন্যেই।

অনেকদিন পরে সমস্ত রহস্য পরিষ্কার হয়ে যায় হরিশের কাছে। দালিয়ার ডেরাতে সে সময়েই ছদ্মবেশে লুকিয়ে ছিল মাফিয়া সর্দার ব্রীজমোহন। কিন্তু কে সেই লোকটা?

পরে হরিশ জানতে পারে দালিয়ার ডেরায় যে তবলচী মুন্না খাঁকে সে দেখেছিল, আসলে সে-ই ব্রীজমোহন। পুলিশ গোপন খবরের ভিত্তিতেই হানা দেয় সে রাতে। হরিশের ঘোরতর সন্দেহ দালিয়াই ইনফর্মারের কাজ করেছিল। কিন্তু কেন দালিয়া এ কাজ করেছিল, আজও সে-রহস্য ভেদ করতে পারে নি হরিশ। হরিশ এও বুঝেছে পুলিশের আগে ব্রীজমোহনই রক্ষা করেছিল দালিয়াকে।

আজ বোম্বাই শহরের হোটেলের কামরায় বসে নতুন করেই আবার দালিয়ার কথাটা মনের পর্দায় আলোড়ন তুলেছে হরিশ প্যাটেলের।

আজই এই হোটেলের সাত নম্বর রুমে আসার কথা ব্রীজমোহনের। এজন্যে গভীর জাল পাততে হয়েছে হরিশকে। প্রায় তিন বছর কেটে গেছে সেই ভয়ঙ্কর রাতের পর। একদিনের জন্যেও দালিয়াকে ভুলতে পারে নি হরিশ।

আসছে ব্রীজমোহন আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে। পেশাদার খুনী

হলেও হরিশ প্যাটেল ব্রীজমোহনকে কথা করতে চায় নিজেই, ও কাজে কেউ তাকে নিয়োগ করে নি। সে চায় দালিয়ার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে, কারণ দালিয়াকে সত্যিই সেদিন ভালবেসেছিল হরিশ।

কিন্তু ব্রীজমোহনকে যে টোপ ফেলে আজ টেনে আনছে সে, সেও বড় বিপজ্জনক। ব্রীজমোহনকে লোভ দেখিয়ে আনছে হরিশ প্যাটেল বেশ কয়েক মাস ধরে। ওর কাছে সন্ধান রয়েছে বিরাট এক হীরের চোরা চালানের, দাম যার কয়েক কোটি টাকা। এটাই তার টোপ।

হরিশ অবশ্য এটা জানে ব্রীজমোহনও কাঁচা লোক কখনও নয়, সেও যথেষ্ট সতর্ক হয়েই আসবে সন্দেহ নেই। অবশ্য আদৌ যদি সে আসে। ব্রীজমোহনের মত মাফিয়ারাজ যে ওর সম্পর্কেও খোঁজখবর নিঃসন্দেহে সংগ্রহ করেছে তাতে ভুল নেই। কিন্তু হরিশ জানে ওর সম্পর্কে কোন খবরাখবর সংগ্রহ স্বয়ং শয়তানেরও অসাধ্য কাজ। নিজেকে চিররহস্যের অন্তরালে রেখে দেবার ব্যাপারে সিদ্ধহস্ত হরিশ। এখনও পর্যন্ত সারা দেশের পুলিশ ওর পরিচয়ের কণামাত্রও জোগাড় করতে পারে নি। একটা খুনের কিনারাও তারা করতে পারে নি এমনই নিশ্ছিদ্র নিখুঁত পরিকল্পনায় কাজ হাঁসিল করে এসেছে হরিশ প্যাটেল। এবারই হতে চলেছে ওর আসল পরীক্ষা। মাফিয়া সর্দার ব্রীজমোহনের সঙ্গে সরাসরি মোকাবিলা করবে এবার হরিশ প্যাটেল, প্রতিশোধ নেবে দালিয়ার হত্যার। নিজের হাতে ও শেষ করবে ব্রীজমোহনকে।

সময় এগিয়ে আসছে। আর ঘন্টাদুয়েক পরেই আসার কথা ব্রীজমোহনের ঠিক সন্ধ্যা সাতটায়।

গ্লাসে আরও বীয়ার ঢালল হরিশ প্যাটেল। সময় যত এগিয়ে আসছে, ওর উত্তেজনাও ততই বাড়ছে টের পাচ্ছিল সে।

আচমকা ওই সময়েই ঘরের টেলিফোনটা ঝনঝন করে বেজে

উঠল।

অবাক হয়েই রিসিভারের দিকে তাকাল হরিশ। কে ওকে টেলিফোন করতে পারে? কারো তো জানার কথা নয় ও এই হোটেলে আছে। তবে?

যেন ভূত দেখছে ভেবেই চুপচাপ বসে রইল সে। টেলিফোনটা ঝনঝন করে বেজেই চলেছে।

একসময় নেহাৎ কৌতূহলী হয়েই ও রিসিভারটা তুলল।

'হ্যাল্লো!'

'কি, ভয় পাচ্ছিলেন টেলিফোন ধরতে?' ওপাশ থেকে নারী-কণ্ঠে কে যেন হেসে বলল।

'কে আপনি?' হরিশ চাপা গলায় বলল।

'আমার পরিচয় জেনে আপনার লাভ নেই—' নারীকণ্ঠ ভেসে এল, শুধু জেনে রাখুন, আমাদের দুজনেরই উদ্দেশ্য এক।'

'কি বলতে চাইছেন আপনি?'

'শুনুন প্যাটেল সাহেব, যার অপেক্ষায় রয়েছেন সে আদৌ আপনার কাছে যাবে না।'

'কি বলছেন আপনি?' হরিশের গলা কেঁপে উঠল। ও ভেবেই পেল না কি সব হচ্ছে। ওর সমস্ত মতলবই তাহলে অন্যরা জেনে ফেলেছে, কিছুই গোপন নেই। এই মহিলা কি তবে ব্রীজমোহনের কেউ?

'যার সঙ্গে আপনার দেখা হওয়ার কথা, তার নামের প্রথম অক্ষর 'বি', তাই না?' নারীকণ্ঠ বলল ওপাশ থেকে, 'প্যাটেল সাহেব, আপনার গতিবিধি তার অজানা নেই। জেনে রাখবেন, এই হোটেল থেকে আপনি আর বেরোতে পারছেন না। হ্যাঁ, আপনি নজরবন্দী।'

কথাগুলো শুনতে শুনতে শীতের মধ্যেও দরদর করে ঘামতে শুরু করল হরিশ প্যাটেল। বুঝতে পারল এবার কঠিন পরিস্থিতিতে

পড়েছে ও। ব্রীজমোহন অনেক অনেক দুর্বল।

'এসব কথা আপনি জানলেন কিভাবে?' কথাটা বলার সময় হরিশ যেন নিজের গলাই চিনতে পারল না।

'সে-কথা বলার দরকার নেই, যেহেতু আপনার কাজে লাগবে না—' মেয়েলী কণ্ঠ ভেসে এল, 'এখন বলুন, আপনি কি বাঁচতে চান?'

হরিশ টের পাচ্ছিল ওর হৃৎস্পন্দন অনেক বেড়ে গেছে। ভাঙা গলায় ও বলল, 'বাঁচতে কে না চায়?'

'বেশ। তবে শুনুন, ঠিক সাতটা পনেরোয় আপনার ঘরে ঢুকবে একজন বেয়ারা। সে আমার লোক। তাকে সেখানো থাকবে আপনি তাকে কাবু করে তার পোশাক খুলে নিজে পড়ে ফেলবেন। তারপর সামনে দিয়ে না বেরিয়ে পিছনের ফায়ার এসকেপ দিয়ে রাস্তায় পড়বেন। এরপর সোজা চলে যাবেন ফ্লোরা ফাউন্টেনের সামনে। সেখানে সিগারেট মুখে দিয়ে তিনবার কাঠি ঘষে দেশলাই জ্বালাবেন। তখনই সবুজ রঙের একটা মারুতি গাড়ি আপনার সামনে এসে দাঁড়াবে, ওতেই উঠে পড়বেন। কোন প্রশ্ন করবেন না। পরের ব্যাপার আমি দেখব।'

'কিন্তু—' হরিশ তবু বলতে গেল।

'প্যাটেল সাহেব—' নারীকণ্ঠ ভেসে এল, 'হয় প্রস্তাবটি মেনে নিন, নাহয় শেষ পরিণতির জন্যে প্রস্তুত থাকুন। আপনার জীবনের মেয়াদ আর বড়জোর চব্বিশ ঘণ্টা।'

হরিশ প্যাটেলের কলিজার জোর কম নেই, তবু নারীকণ্ঠের এই কথা শুনে ওর শিরদাঁড়া বেয়ে কনকনে একটা ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল। মৃত্যুকারবারী হরিশ এই প্রথম নিজেই মৃত্যুভয়ে কাতর হয়ে উঠল। না, ও মরতে চায় না, ও বাঁচবে যেমন করেই হোক।

ও তাই উত্তর দিল, 'আমি রাজী। কিন্তু টেলিফোনে কেউ আড়ি পাতলে?'

হেসে উঠল নারীকণ্ঠ, 'সে ভয় নেই। হোটেলের অপারেটর আমার লোক, সে সব দেখে নিয়েছে!'

'কিন্তু আপনার উদ্দেশ্য কি?'

'আগেই তো বলেছি প্যাটেল সাহেব, আমাদের দুজনেরই উদ্দেশ্য এক। কিন্তু আর কথা নয়। মনে রাখবেন রাত সওয়া সাতটায় বেয়ারা আপনার কামরায় ঢুকবে—'

ক্লিক করে যোগাযোগ কেটে যাওয়ার শব্দ শুনতে পেল হরিশ প্যাটেল। সোফায় বসে বীয়ারের বোতল খুলে ঢকঢক করে গিলে ফেলল সে কাঁপা হাতে।

এমন বিপদে কখনো পড়ে নি ও। কে ওই নারীকণ্ঠের অধিকারিণী? সব কি সাজানো? ওকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা? যাই হোক, ওর সম্পর্কে একজন সবই জেনে ফেলেছে, তাতে সন্দেহ নেই। মারাত্মক কোন গাফিলতি হয়েছে, এটা তারই পরিণতি।

হাতঘড়িতে সময় দেখল হরিশ, সাড়ে ছটা বাজে। আর আধ ঘণ্টা পরেই ও বুঝতে পারবে সবটাই ধাপ্পা না আর কিছু।

সময় যেন বড় দীর্ঘ মনে হচ্ছে। একবার ওর ইচ্ছে হল আগেই হোটেল থেকে গা-ঢাকা দেয়, কিন্তু পরক্ষণে ওর মনে হল ব্যাপারটা সত্যি হলে চরম বিপদই ঘটে যাবে। তার চেয়ে তৈরি হয়ে সাতটা পর্যন্ত দেখা যাক।

ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে চলেছে।

হরিশ প্যাটেল এবার হাতঘড়ির দিকে তাকিয়েই কেঁপে উঠল। পৌনে সাতটা।

পকেট থেকে ও বের করল এবার ওর চিরসঙ্গী লুগারটা।

সত্যিই যদি ব্রীজমোহন এসে পড়ে?

কাঁপা হাতে অস্ত্রটা বাগিয়ে ধরে উত্তেজনায় টানটান হয়ে যে কোন সম্ভাব্য পরিণতির জন্যে তৈরি হয়ে নিল ও।

একটু একটু করে ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে চলে। একসময় সাতটা

বাজল। যেন ভূত দেখছে মনে ভেবে দরজার দিকে তাকিয়ে রইল হরিশ প্যাটেল কান খাড়া করে।

সময় যেন কাটতে চাইছে না আর। নিজেই নিজের হৃৎপিণ্ডের শব্দ শুনতে পাচ্ছে ও।

সাতটা পাঁচ।

আরো এগোল সময়। সাতটা দশ।

না, ব্রীজমোহন বা তার কোন অনুচর কেউই এল না। নারীকণ্ঠ ঠিকই বলেছে তবে।

কিন্তু আর সময় নেই, পরবর্তী নাটক যে এখনই অভিনীত হতে চলেছে।

ঠিক সওয়া সাতটা বাজতেই দরজায় মৃদু শব্দ জেগে উঠল। দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে উঠে দাঁড়িয়ে দরজা খুলে দিল হরিশ।

প্রায় একই উচ্চতার সুদর্শন একজন হোটেলের পোশাক পরা বেয়ারা কামরায় ঢুকল। দেরি করল না হরিশ, কথা মত ও সুযোগ বুঝে বেয়ারার কানের পাশে পিস্তলের বাঁট দিয়ে আঘাত হানল। লোকটা জ্ঞান হারিয়ে টলে পড়তেই দু হাতে তাকে ধরে মাটিতে শুইয়ে দিল ও।

এরপর সময় নিল না হরিশ। দ্রুত বেয়ারার পোশাক খুলে নিজে পরে নিল। কামরার পিছনের ফায়ার এসকেপের সিঁড়ি বেয়ে আলো-আঁধারির মধ্যে রাতের অন্ধকারে রাস্তায় পৌঁছতে অভিজ্ঞ হরিশ প্যাটেলের পাঁচ মিনিটও লাগল না। কোন বাধাও এল না।

ফ্লোরা ফাউন্টেন চেনে হরিশ, দ্রুত সেদিকেই পা চালাল ও। সেখানে পৌঁছে যন্ত্রের মতই একটা সিগারেট গুঁজে তিনবার ফুঁকে দেশলাই ধরাল হরিশ প্যাটেল। যাদুমন্ত্রেই যেন একটা সবুজ আকৃতি গাড়ির আবির্ভাব ঘটে গেল।

একটা অদৃশ্য হাত দরজাটা খুলে ধরতেই উঠে পড়ল হরিশ।

নরম আসনে পিঠ রাখার পরক্ষণেই গতি নিল মারুতি।

মনের মধ্যে ঝড়ের তাণ্ডব জাগল হরিশের। যা ঘটে চলেছে এই মুহূর্তে ওর জীবনে তা কি সত্যি না চলচ্চিত্রের দৃশ্য? কোথায় নিয়ে চলেছে ওকে ওর ভাগ্য। ও কি মৃত্যুর পথেই চলেছে?

ব্রীজমোহনের সঙ্গে ওর কি দেখা হবে? চিনতে পারবে ব্রীজ-মোহনকে? চকিতে হরিশের মনে পড়ল তবলচী মুন্না খাঁর চেহারা।

স্মৃতিপথে এমন কিছুই জাগল না ওর যাতে তাকে এতদিন পরে চিনে নেওয়া যায়।

আচমকাই যেন বাস্তবে ফিরে এল হরিশ প্যাটেল। একটা অন্ধকার রাস্তায় বিরাট একটা বাড়ির সামনে মারুতি থামার সঙ্গে সঙ্গে জানলায় চারটে রাইফেলের নল ওকে প্রায় স্পর্শ করল।

'নেমে আসুন, কোন চালাকি করবেন না—!' কারো গম্ভীর গলা জেগে উঠল।

মন্ত্রমুগ্ধের মতই নেমে দাঁড়াল হরিশ।

'সামনে এগিয়ে চলুন।'

হরিশ পায়ে পায়ে এগিয়ে যেতেই কালো পোশাক পরা চারজন লোক সামনের একটা খোলা দরজা নির্দেশ করল। ভিতরে না ঢুকে উপায় ছিল না হরিশ প্যাটেলের। ওর অবস্থা অনেকটাই কলে-পড়া ইঁদুরের মতই।

ভিতরে ঢুকতেই আলোর বন্যায় চোখ ধাঁধিয়ে গেল হরিশ প্যাটেলের। বিরাট একখানা ঘর। অনেকগুলো সোফা আর নিচু টেবিল ঘরে। সবচেয়ে আশ্চর্য হল হরিশ একটা সোফায় অল্পবয়সী এক সুন্দরী তরুণীকে বসে থাকতে দেখে।

'আসুন প্যাটেল সাহেব!' তরুণী হাসিমুখে জানালো, 'বসুন।' কালো পোশাক পরিহিত চার মূর্তি রাইফেল তৈরি রেখে চারপাশে দাঁড়াল। 'পথে কোন কষ্ট হয় নি তো?' তরুণী প্রশ্ন করল।

টেলিফোনে শোনা কণ্ঠস্বর যে এই তরুণীর সেটা বুঝতে পারল

হরিশ। এগিয়ে গিয়ে একটা সোফায় বসল ও।

'আমাকে এখানে ধরে আনার উদ্দেশ্য কি জানতে পারি?' প্রশ্ন করল হরিশ।

'আগেই তো জানিয়েছি প্যাটেল সাহেব, আমাদের উদ্দেশ্য এক। অর্থাৎ ব্রীজমোহনের ওপর প্রতিশোধ।' তরুণী বলে উঠল।

'কে আপনি?'

'সেটা নাই বা জানলেন। শুনুন, সময় বড় কম। ব্রীজমোহনকে কব্জা করতে হলে আজই চেষ্টা করতে হবে। কাল সে আমেরিকায় পাড়ি জমাতে চলেছে, তাকে আর কেউ ছুঁতে পাবে না।'

'কোথায় ব্রীজমোহন?' হরিশ বলে উঠল।

'শিগগিরই সেটা জানতে পারবেন—' তরুণী বলে উঠল, 'এবার আপনাকে কি করতে হবে শুনে নিন। ব্রীজমোহন আজ রাত ন'টায় এক বাড়িতে কোন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবে। সেখানে কার্ড ছাড়া কারো পক্ষে ঢোকা অসম্ভব। আমি আপনার নামে কার্ড আনিয়ে রেখেছি। সেখানে আপনার নাম হবে ললিত গিদোয়ানী, ডায়মণ্ড মার্চেন্ট, আবুধাবি থেকে এসেছেন। এতে ব্রীজমোহনের কাছে যাওয়ায় বাধা পাবেন না। অনুষ্ঠানে গেলেও তাকে ঘিরে থাকবে তার দুজন দেহরক্ষী। সামনে পৌঁছে আপনাকে যে নতুন পিস্তল দেওয়া হবে, সেটা দিয়েই পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে গুলি করবেন। আমার লোক থাকবে ওখানেই। সেই মুহূর্তে তারা আলো নিভিয়ে দেবে আর সেই সুযোগেই পালাবেন আপনি।'

হরিশ প্যাটেল চোখ কুঁচকে বলল, 'যদি আপনার কথা না শুনি?'

'আপনার মৃতদেহ কাল সকালেই জুহু সমুদ্র-সৈকতে পড়ে থাকতে দেখা যাবে। বলুন, আপনি রাজী?'

এক মুহূর্ত ভাবল হরিশ, তারপর বলল, 'রাজী।' মনে মনে ও ভাবল, 'দেখাই যাক'।

একজন এগিয়ে এসে হরিশের পকেট থেকে লুগারটা বের করে নিয়ে তরুণীর হাতে চালান করল। এবার সত্যিকার অসহায় বোধ করল হরিশ, ও নিরস্ত্র।

'প্যাটেল সাহেব, আপনার কথা আমি অনেক শুনেছি। কিন্তু বিশ্বাস হয় না আপনার মত একজন এমন সুপুরুষ, সুদর্শন মানুষ সত্যিই ঠাণ্ডা মাথায় খুন করে এসেছেন।' তরুণী লুগারটা দোলাতে দোলাতে বলল।

'আজই দেখতে পাবেন।' হরিশের আত্মাভিমানে বোধ হয় আঘাত লাগল।

বোম্বাইতে শেষ শিকারটি কে ছিল জানাতে আপত্তি আছে?'

হাসল হরিশ প্যাটেল, 'স্বীকারোক্তি আদায় করতে চান।'

তরুণীও ভুবনবিজয়ী হাসি হাসল, 'না, নিছক কৌতূহল। মেটাবেন?'

একটু হাসল হরিশ, বলল, 'মেটাতে আপত্তি নেই। বোম্বাইতে আমার শেষ শিকার যে ছিল, তার হত্যাকারীর নাম জানতে পারলে পুলিশ অবশ্যই খুশি হবে। এখানে খতম করেছিলাম রমেশ সালদানাকে। বিখ্যাত জুয়েলার রমেশ সালদানা। আর তার ঠিক আগে পুলিশের ইন্সপেক্টর গিরীশ সাকসেনাকে। সে বড্ড বেশি জেনে ফেলেছিল।'

'চমৎকার। আপনি কৃতি পুরুষ, প্যাটেল সাহেব।' তরুণী উত্তর দিল, 'তবে এবার বড় কাঁচা কাজই করে ফেললেন বলতেই হবে। সত্যি, আপনার এই স্বীকারোক্তি আমাদের দরকার ছিল।'

লাফিয়ে উঠতে গেল এবার হরিশ প্যাটেল। একটা সন্দেহ, যা ওর অবচেতন মনে কিলবিল করছিল, সেটাই যেন মুখব্যাদন করে বিরাট আকার নিতে চাইল।

'না, উঠতে যাবেন না। আপনার চারপাশে যারা ঘিরে রয়েছে, তারা বোম্বাই পুলিশের অব্যর্থ লক্ষ্য দক্ষ পুলিশ অফিসার। অনেক

কষ্ট করে আপনাকে ফাঁদে আটকাতে হয়েছে, প্যাটেল সাহেব। এবার আপনার ঋণ শোধের পালা।'

চোখের সামনে সারা পৃথিবীটা যেন দুলে উঠল মৃত্যু-ব্যবসায়ী হরিশ প্যাটেলের। সামান্য একটা ভুলের জন্যে আজ ধরা পড়ে গেল ও পুলিশের হাতে।

'কি ভাবছেন প্যাটেল সাহেব?' তরুণী উঠে দাঁড়াল, 'অনুশোচনা হচ্ছে? হ্যাঁ, একটা কথা আপনাকে জানানো হয় নি। মাফিয়া-কিং ব্রীজমোহন গত সপ্তাহেই পুলিশ এনকাউন্টারে মারা গেছে। আর আপনার সঙ্গে আমায় টেলিফোনের সব কথা আর একটু আগের স্বীকারোক্তি সবই টেপরেকর্ডারে ধরা পড়েছে—'

কথাগুলো বোধ হয় কর্ণগোচর হল না হরিশ প্যাটেলের। ওর চোখের সামনে বিরাট হয়ে তখন নেমে আসছিল কাল্পনিক ফাঁসির দড়িটা।

ঠোঁট

শ্রীধর সেনাপতি

পুরোন লোহার গেট পেরিয়ে বাড়ির কম্পাউণ্ডে পা রাখলাম।

পশ্চিম গগনে সূর্য অস্ত গেছে একটু আগে। হাল্কা অন্ধকারের চাদর জড়ানো সার-সার দেবদারুর ফাঁক দিয়ে দেখলাম সন্ধ্যাকাশের পটভূমিতে বাড়িটা মসীবর্ণ ছায়া-পরিলেশ সৃষ্টি করে দাঁড়িয়ে রয়েছে আমার সামনে। বাড়ির দিকে মন্থর পায়ে এগোলাম। চারপাশে ঘিরে থাকা জমাট স্তব্ধতাকে ভাঙবার চেষ্টা করে বোধ হয় ক্লান্ত হয়ে পড়ছিল ঝিঁঝিপোকার পাল, তাই হয়তো বিশ্রাম নেবার জন্যে তাদের ডাক মাঝে মাঝে হঠাৎ থেমে যাচ্ছিল। এখানে আসাটা আমার পক্ষে কি উচিত কাজ হয়েছে? মনে প্রশ্ন জাগতে থাকে

বারবার।

তবে আমি আশা করেছিলাম সবকিছু ভিন্নতরই দেখা যাবে। বাড়ি হবে হয়তো বিচিত্র ডিজাইনের। বাড়ির লনের গাছগুলো বেশিরকম সোজা, অতিরিক্ত পরিমাণে স্বাভাবিক। কিন্তু কোথায় সেই যুক্তিতর্ক বিধিনিয়মের গণ্ডিভাঙা আমার কল্পনার অস্বচ্ছ ধূসর ছায়ার রূপায়ণ? এটা কি কোন উন্মাদাগারের অফিসঘর হতে পারে? এত যার শান্ত নির্জন পরিবেশ!

দরজার কাছ থেকে আমাকে আহ্বান জানাল একজন তরুণী নার্স। মুখে মিষ্টি হাসি। ঈষৎ অন্ধকারময় অস্পষ্ট করিডর আমি অতিক্রম করতে লাগলাম তাকে অনুসরণ করে। স্তব্ধতা এখানেও যেন জমাট বাঁধা। অকস্মাৎই ঘটল। স্তব্ধতায় চিড় ধরাল দূরের একটা কোণের দিক থেকে আসা ছোট্ট আওয়াজটা। চলার গতি বাড়িয়ে নার্স এগিয়ে গেল।

'কে—কে দরজা খুলল?' সামনের বাঁকের মুখে অদৃশ্য হল নার্সের মূর্তি, কিন্তু তার কণ্ঠস্বর আমার কানে এসে পৌঁছল, 'যাও—ফিরে যাও ওখানে।'

যথাসময়ে আমিও ওই বাঁকের মুখে পৌঁছে গেলাম। নার্সের হুকুমে যে মানুষটা তখন ফিরে যাচ্ছিল, তার অস্পষ্ট চেহারাটা আমার নজরে এল। শুধু তাই না, মানুষটা যেন কিছু বিড়বিড় করে বলছিল মুখে বোঝা গেল।

…'টোয়েন্টি-সেভেনথ ডাইমেনসন, টোয়েন্টি-এইটথ্ ডাইমেনসন টোয়েন্টি-নাইনথ ডাইমেনসন…'

দরজায় খিল এঁটে দিল নার্স; ঘুরে দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকাল। আগেকার সেই মিষ্টি হাসিটি তার মুখে ফুটে উঠল ফের।

'সো সরি।' মিষ্টি গলাতেই সে বলল, 'করিডরের শেষের ঘরখানায় গিয়ে আপনি বসুন। ডাক্তারবাবু আপনার সঙ্গে ওখানেই দেখা করবেন।'

মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানালাম। কিন্তু আমার মনের মধ্যে এখনও সেই শোনা কথাগুলো প্রতিধ্বনি তুলছে, টোয়েন্টি-সেভেনথ ডাইমেনসন…টোয়েন্টি-এইটথ ডাইমেনসন।

আমি বোবার মত ওয়েটিংরুমে ঢুকলাম। একটা আর্মচেয়ারে সোজা হয়ে বসতে গিয়ে প্রায় তলিয়ে গেলাম অতি আরামদায়ক নরম কোমল গদির ক্রোড়ে। দেখলাম আমি ছাড়া আর দ্বিতীয় ব্যক্তি ঘরে নেই। ডিসেম্বর মাসের সন্ধ্যাতে ঘরখানাকে কোল্ড স্টোরেজের মত মনে হতে লাগল। ঘরের সমস্ত সাজসরঞ্জামের রঙ ঠাণ্ডাতে যেন নীলচে হয়ে গেছে। সেণ্টার টেবিলের ওপর রাখা কিছু বর্ণহীন পুরোন ম্যাগাজিন। সে যাই হোক, টেবিল থেকে যে কোন একটা হাতে তুলে নিয়ে নেড়েচেড়ে যে দেখব একটু, তো আলো কই? সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমশ ঘন হয়ে উঠছে। সামান্য তফাতে আমার মুখোমুখি বড় আকারের সোফাটাকে কালো রঙের এক বিদঘুটে জন্তুর মত দেখাচ্ছে এখন। এখানকার নিয়মানুসারে আলো জ্বালাবার সময় কি এখনও হয় নি? নাকি লোডশেডিং চলছে? তাহলে এখানে একটা জেনারেটর থাকার সম্ভাবনার কথা কি মনে ঠাঁই দেওয়া যায় না? নাকি জেনারেটরের তেলের অভাব?

অন্ধকারের মধ্যে চোখের দৃষ্টি সুতীক্ষ্ণ করে আলোর সুইচ খুঁজতে গিয়ে দেখি, হা ঈশ্বর! সীলিং থেকে বিদ্যুতের একটা তার ঝুলছে ঠিকই, কিন্তু হোল্ডার আলোর বাল্বশূন্য। সন্ধ্যার পরেও তো ভিজিটরদের এখানে ডাকা হয়—আমাকে ডাকা হয়েছে। তাহলে? নিশ্চয়ই কোন তেলের আলো ব্যবহার করা হয় এখানে।

আমার ভেতর ক্রমশ একটা অস্থিরতা বাড়তে লাগল। অন্ধকার নিশ্চিত ভাবে ঘনীভূত হচ্ছে। নিজের হাতে বাঁধা ঘড়ির কাঁটা-দুটোকেও আর দেখতে পাচ্ছি না। পকেটটর্চটাকে হাতড়ে বার করার চেষ্টা করলাম। আমি সর্বদা এটাকে বয়ে বেড়াই, আমার বহুদিনের অভ্যাস। এখন মনে হচ্ছে, এটা আমার সৌভাগ্যই।

আমাদের পাড়ার গলির ভাঙাচোরা ক্ষতবিক্ষত রাস্তাটাকে পৌর কর্তৃপক্ষ দুষ্টক্ষতের মত পরিত্যজ্য জ্ঞান করায় বাধ্য হয়ে পকেটটর্চ ব্যবহার করতে অভ্যস্ত হয়েছিলাম। এতদিন বাদে টর্চটা তার উপযুক্ত মর্যাদা পাওয়ার বোধ হয় সুযোগ পেল। ওই অভ্যাসটি না থাকলে তো আমিও এটাকে এখানে বয়ে আনতাম না।

কিন্তু টর্চের সুইচ টিপবার আগে অকস্মাৎ অন্ধকারের মধ্যে একটি কণ্ঠস্বরের অনুরণন শুনলাম।

'গুড ইভনিং। আপনার বন্ধুর সঙ্গে আমরা দেখা করতে যাওয়ার আগে আমি দু-একটা কথা বলে নিতে পারি কি?'

অন্ধকারের ভেতরে আমি উঁকি মারলাম। ডাক্তার খুবই নিঃশব্দে ভেতরে ঢুকে প'ড়েছে নিশ্চয়। আমি তাকে এখনও দেখতে পাচ্ছি না, ঘর অন্ধকারের কম্বল জড়িয়ে রয়েছে। তবে ডাক্তারের কণ্ঠস্বর যেন দৃঢ় ভাবে নিশ্চিত করল।

'কোন আলো না থাকার জন্যে আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। কিন্তু একটা কথা বুঝলেন—আমরা সাধারণত ভিজিটিং আওয়ার্স কঠোর-ভাবে রক্ষা করে চলি। আগে আমরা কখনো কাউকে সন্ধ্যের পর আসবার অনুমতি দিই নি।'

'আমার কাছে টর্চ আছে, যদি—' আমি মুখ খুললাম।

'না, না, প্লীজ!' ডাক্তার বাধা দিয়ে বললেন, গলার স্বর এখন বেশ কিছুটা কর্কশ মনে হল, 'আমার চোখের অবস্থা মোটেই ভাল না। সম্পূর্ণ অন্ধকারের ভেতর তারা বেশ একটু আরাম পায় দেখেছি। আমি বিশ্বাস করি আপনিও নিশ্চয় চাইবেন না আমার দুর্বল চোখ দুটোর কষ্ট হোক।'

'না, এটা আমার আদৌ কাম্য নয়।' একটু অনিশ্চিত ভাবেই, প্রায় ফিসফিস করে কথাগুলো বললাম আমি।

'ধন্যবাদ। খুশি হলাম। অনেক বয়স্ক ব্যক্তিও যে অন্ধকারকে কত ভয় পায় দেখে অবাক হতে হয়! ভয়, বুঝলেন—বিশেষ করে

করে কিছু একটার ভয়ই আমাদের বেশির ভাগ রোগীর অবস্থার জন্যে দায়ী।

'কেন অন্ধকার এত ভীতিজনক হয়, এ সম্পর্কে কি কখনো ভেবেচিন্তে দেখেছেন? আমার ধারণা, এটা অজ্ঞাত জিনিসের চিন্তা, যেটা মাত্র ইঞ্চিখানেক দূরেও থাকতে পারে। অভাবিত যে কোন দিক থেকে কোন জিনিস, অভাবিত শব্দ সৃষ্টি করতে যাচ্ছে, এটা এরকমই একটা উপলব্ধি। আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে পর্যাপ্ত পরিমাণে সজাগ করে তোলে।

'তবু আমাদের অধিকাংশ পেসেন্টের দিনের বেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে। হয়তো এটাও খুব খারাপ। যাই হোক, অন্ধকারের ভেতর আপনি বিভ্রান্তি বিষয়ে কথা বলতে পারেন। যখন দিনের আলো থাকে, অদ্ভুত জিনিসগুলোকে অস্বীকার করা তখন যে কি কঠিন—বিশেষত যদি অন্য ব্যক্তিও একই অভিজ্ঞতা লাভ করে বসে।'

'তখন কিন্তু সেটা মানসিক দুর্বলতার লক্ষণ হতে পারে না।' আমি প্রতিবাদ করলাম, 'যদি দুজন মানুষ একই সময়ে একই জিনিস ঘটতে দেখে, সেখানে অন্য ব্যাখ্যা নিশ্চয়ই আছে।'

'কিন্তু ধরে নেওয়া হচ্ছে সেখানে সেটা নেই।' ডাক্তার জিদ ধরে বললেন, 'আমরা কি বলব যদি দুই বা আরো বেশি ব্যক্তি একটা অসম্ভব অভিজ্ঞতা লাভ করল, যা স্পষ্টত অযৌক্তিক।

'বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না, এমন ঘটনা ঘটে সময়ে সময়ে। ওই শ্রেণীর ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কোন ব্যক্তি, সে যা চোখে দেখেছে, সেটা স্রেফ দৃষ্টিবিভ্রম বলে যদি উড়িয়ে দেয়, তার মানসিক দিকে কোন ক্ষতি হয় না। এটা নিশ্চয় মেনে নেওরা যায়। তবে যদি সে তার অভিজ্ঞতার কাহিনী ছড়িয়ে আমাদের প্রতিদিনের অস্তিত্বের শিকড় ধরে টান দিতে চায়, আমাদের করণীয়টা কি?

'যদি কোন মানুষ আমাদের যুক্তিসম্মত বিশ্বাসগুলোকে উপড়ে ফেলে দিতে চায়, তা থেকে তাকে নিবৃত্ত করতে যাওয়া ন্যায়সঙ্গত

কাজই হবে। তাকে আটকে রাখা হোক এক জায়গায়। সাধ্যমতো প্রচেষ্টা চালানো হোক তার নিজের পাগলামো সম্পর্কে তার মনে বিশ্বাস জাগানোর। একবার যদি সে তার অবস্থার কথাটা মেনে নেয়, তাহলে আমাদের কাজ শেষ। আমরা তাকে সমাজে ফিরিয়ে দিতে পারি। আমরা একথা জেনে নিশ্চিন্ত থাকব যে সে ফিরে গিয়ে আর কোনরকম ঝামেলা বাধাবে না কারো সঙ্গে।'

আমি শুনে গেলাম। বিশ্বাস হচ্ছিল না। এটা কী ধরণের একটা উন্মাদাগার, জিজ্ঞাসা করলাম নিজেকে। কণ্ঠস্বর অব্যাহত। আমার মনে এই প্রথম জাগল সন্দেহের একটা ঢেউ।

'খুব বেশিদিন আগের কথা নয়। আমার হাতে ওই ধরণের একটা ছোট্ট কেস ছিল। তার নাম ছিল অভিজিৎ রায়। একেবারে স্বাভাবিক, স্বাস্থ্যবান সুদর্শন এক যুবক। তার একটা বিচিত্র স্বভাব ছিল—সিঁড়ি গোণা। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠবে, ধাপ গুণতে গুণতে—এক...তুই...তিন...নিচে নামবার সময়েও তাই। আপনি হয়তো বলতে পারেন, এটা খুব একটা বিচিত্র ব্যাপার নয়। তা ঠিক, মেনে নেওয়া যায়।

তবে তুর্ভাগ্যবশত অভিজিৎ ইদানীং তার বাসা বদল করেছিল। আর, তার নতুন ঘরে মাত্র একটা দিন কাটানোর পরই তার প্রায় পাগল হয়ে ওঠার অবস্থা। কেন জানেন? কারণ সে আবিষ্কার করেছিল, নিচে থেকে সিঁড়ির বারোটা ধাপ পেরিয়ে তার ঘরে পৌঁছনো যায়, নিচে নামতে হলে সেটা সংখ্যায় একটা কম—মাত্র এগারোটা!

'বাড়িওয়ালা অবশ্য এটা অনেকদিন থেকেই জানতেন। তিনি বোধ হয় বিশেষ উদ্বিগ্নও ছিলেন না। এতে তার কোন অসুবিধাই তো হয় না। যদিও আমার বিশ্বাস, তিনি ওপরের ঘর-বারান্দা ইত্যাদি জায়গার ধুলো ঝাঁট দিয়ে নিচে নামিয়ে সিঁড়ির কাছে জমিয়ে রেখেছিলেন। সেটাই সিঁড়ির একটা বাড়তি ধাপের কাজ

করেছে।

'অভিজিৎ রায়, যাই হোক, ব্যাপারটাকে অত সহজে নিতে পারে নি। সিঁড়ি দিয়ে শুধু ওপর-নিচে ওঠা-নামা করেই তার প্রথম দিনের বেশির ভাগ সময়টা সে কাটিয়ে দিল। কিছু তর্ক-বিতর্কও তার হল বাড়িওয়ালার সঙ্গে। তবু তার অখুশি হওয়ার কারণ তাতে দূর হল না। অভিজিৎ রায় সাংবাদিকদের ডেকে এনে ব্যাপারটা বোঝাতে চায়, বিজ্ঞানীদের ডাকতে চায়, শেষে থানা-পুলিশের ভয় দেখাতে চায় বাড়িওয়ালাকে। পরিণাম স্বরূপ, এখানে আমাদের কাছে তাকে আনা হল। প্রচলন অনুযায়ী পরীক্ষাদি করে আমরা তাকে সার্টিফিকেট দিলাম। এখন থেকে তিন মাস আগে তার চিকিৎসা শুরু হয়েছিল। চার মাসে পড়ল।'

'আর, ওই সিঁড়ি?' আমি প্রায় ফিসফিস করে বললাম।

'সিঁড়িগুলো এখনো পর্যন্ত অবশ্যই তেমনি আছে—ওপরে বারো, নিচে এগারো। অভিজিৎ রায়ের ব্যাপারটা নিয়ে বাড়িওয়ালা ভদ্রলোকও তো খুব সুস্থির নেই। তিনি তাঁর পরিচিত মানুষদের কাছে বলেন, সিঁড়িটা তো তাঁর নিজের বাড়িরই। এটাকে জড়িয়ে কোনরকম জটিলতা সৃষ্টি করা অভিজিৎ রায়ের পক্ষে খুবই কঠিন হবে।...

'মাত্র ক'দিন আগে একটি মেয়েকে এখান থেকে ডিসচার্জ করা হয়েছে। তার কেসটা ছিল আরো ব্যক্তিগত। আমার ধারণা মিস ব্যানার্জির সমস্ত রকম উদ্ভূত পরিস্থিতি সামাল দেবার ক্ষমতা যথেষ্টই ছিল। তার কেসের বিশেষত্ব কি ছিল, জানেন?'

একটুকরো হাসি কানে এল আমার। না বললে, জানব কী করে—কথাটা আমার ঠোঁটের ডগায় এসেও আটকে গেল। সেটা বলবার আর প্রয়োজন হল না। তবে এখন আমি প্রায় নিশ্চিত যে আমি এই বিস্ময়কর সংলাপ চালিয়ে যাচ্ছি কোন একটি রোগীর সঙ্গে, উন্মাদাগারের অফিসরুমে বসেই। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি

না, আসল ডাক্তার এখনও পর্যন্ত এসে পৌঁছলেন না কেন ?

'হ্যাঁ, যা বলছিলাম। মিস ব্যানার্জির কেসের বিশেষত্ব। তার সঙ্গে একটা অলস প্রকৃতির ছায়া ঘুরে বেড়াত। তিনি যখন যা করতেন, তার ছায়াটিও সবসময়ে তাকে অনুকরণ করত হুবহু। তবে কয়েক সেকেণ্ড দেরি করে। আবার কখনো কখনো বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে ছায়ার মুখখানা থাকত গোমড়া হয়ে। দীর্ঘ সময়ের জন্যে বিশ্রাম না দিলে গোমড়ামুখো ছায়া নড়াচড়া করতেই অস্বীকার করত। আর একটা কথা। মিস ব্যানার্জির ফ্যামিলি অনেক দিন আগে থেকে ব্যাপারটা মেনে নিয়েছিল। ঘটনার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পাওয়ার চেষ্টা চলেছিল তখন। আমাদের কিছু করার ছিল না।

'যাই হোক, তিনি আমাদের ভেতর ছিলেন মাত্র এক বছর। এই ধরণের কেসের পক্ষে খুবই কম সময় বলা যায়। মিস ব্যানার্জি বেশ শান্ত প্রকৃতির মেয়ে, তবে নিজেকে উচ্চাকাঙ্খী বলে যেমনভাবে প্রকাশ করতে চেষ্টা করতেন, তেমনটি নন। তাঁর সমস্যার বিষয়টা অন্তত বেশি করে গ্রহণযোগ্য হয়েছে এখন। আমি নিশ্চিত, বাইরের জগতে আমাদের খ্যাতি প্রচারে আমরা মিস ব্যানার্জির ওপর ভরসা রাখতে পারি। এখনও পর্যন্ত, বুঝলেন, এখান থেকে একবার ছেড়ে দেওয়া রোগীকে আর দ্বিতীয়বার ভর্তি করার দরকার হয় নি।'

'অসাধারণ!' আমি বিড়বিড় করে বললাম। কণ্ঠস্বরটা ঠিক কোন জায়গা থেকে আসছে, আমি এখন সেটা বুঝে নিয়েছি। আমার সামনের বড় সোফাটাতে উন্মাদটি বসে রয়েছে। তার মনে কোন সন্দেহ না জাগিয়ে দরজা পর্যন্ত পৌঁছনো যাবে কিনা, কিংবা সাহায্যলাভের আশায় চিৎকার করাটাই আমার পক্ষে শুভ হবে— এখনও স্থির করতে পারছি না।

'সন্দেহ নেই, আপনার বন্ধুকে এখানে কেন আনা হয়েছে ভেবে নিশ্চয় অবাক হচ্ছেন আপনি—' ওই কণ্ঠ বলে চলল।

চমকে উঠে, আস্তে আস্তে আমি চেয়ারে পিঠ ছোঁয়ালাম। গদির স্প্রিং একটা বিদঘুটে শব্দ সৃষ্টি করল। কিন্তু তার কথা বলা ব্যাহত হল না।

'গত সপ্তাহে তিনি এখানে এসেছিলেন। এখানে একটা চাকরি খালি ছিল, সেটার জন্যে একটা দরখাস্ত নিয়ে। তিনি এই ঘরে বসে অপেক্ষা করছিলেন। হ্যাঁ, এই সোফায়। যখন তিনি তাঁর পকেট থেকে রুমালটিকে টেনে বার করার চেষ্টা করছেন, তখন কয়েকটা কয়েন মেঝের ওপর গড়িয়ে পড়ে। সেগুলোকে তুলে নেবার জন্যে তিনি যে হাত বাড়াবেন, এ তো স্বাভাবিক। তিনি একটু নিচু হয়ে মেঝের দিকে হাত বাড়িয়েছেন, অমনি তাঁর সেই হাতটিকে কে যেন তার হাত দিয়ে খপ করে চেপে ধরল বলে তাঁর মনে হল।

'ফের আর-একবার, এটা একটা আচরণের প্রশ্ন। তার মানসিক ঘাটতির সমন্বয় সাধন না হওয়া পর্যন্ত তাকে আমাদের সঙ্গে থাকতে হবে। আমাদের ঘর-আসবাব ইত্যাদি নিয়ে তিনি যে বোকার মতন যতসব অদ্ভুত বিচিত্র কথা বলে বেড়াবেন, এটা তো আমরা তাঁকে করতে দিতে পারি না। যদিও আমরা জানি তিনি বেঠিক কিছু বলেন নি।'

'আপনারা জানেন, তিনি যা বলেছেন সব সত্যি?' আমি না বলে আর থাকতে পারলাম না। হাতড়ে আমি আমার পকেটের ভেতরে টর্চের অস্তিত্ব অনুভব করলাম। আমি তার চোখে আচমকা টর্চের আলো ফেলে হয়তো ক্ষণিকের জন্যে তাকে অন্ধের মত করে দিতে পারি, সে চোখের দৃষ্টি ফিরে পাবার আগেই আমি ঝাঁপিয়ে পড়তে পারি তার ওপর। কিন্তু উন্মাদেরা তাদের শরীরে অমানুষিক শক্তি ধারণ করে থাকে শোনা যায়।

'অবশ্যই তিনি সত্যি কথা বলেছিলেন। সোফাতে হাতটাকে আমরা প্রথম অনুভব করেছিলাম। তাও গোটা নয়, টুকরো টুকরো

অবস্থায়। আর কিছু ছিল না। বিচ্ছিন্ন অংশগুলো সাজিয়ে এখানে পেয়েছিলাম। ও সম্পর্কে আমরা আর বেশি কথা বলি না। আসুন না, আপনি এখানে আসুন, নিজেই অনুভব করুন সেটা।'

আর কোন উপায় নেই। আমি চটপট পকেটের ভেতর হাত ভরলাম। টর্চটা বের করে নিলাম। সামনের কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করে ফেললাম আলোকরশ্মি। প্রথম জিনিস আমার যা চোখে পড়ল—একটা জোড়া পুরু ভারী ঠোঁট, তখনও আমাকে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানাচ্ছে। শুধু একজোড়া ঠোঁট, যাদের মধ্যে কিছু নেই, পিছন দিকে কিছু নেই, আশপাশও শূন্য। জমাট অন্ধকারের ভেতর শুধু একজোড়া ঠোঁট কথা বলে যাচ্ছে।

তার কথাগুলো আরো মন দিয়ে আমার শোনা উচিত ছিল। আমার মনে রাখা উচিত ছিল যে এ সমস্তই একটা আচরণের প্রশ্ন। ঠোঁটজোড়া বলে, আমি এখনও বিপজ্জনক, আমি এখনও যুক্তি দিয়ে অপরকে বোঝাবার চেষ্টা করছি, প্রমাণ খুঁজছি। যদি তারা এটা দেখে, ভীষণ ক্রুদ্ধ হবে। বুঝলেন, আপনারা কাউকে বলবেন না। আপনারা ঘটনাগুলো সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হলেন, ব্যস। এই পর্যন্ত। এরকম ঘটনা ঘটতে পারে না। নিশ্চয়ই ঘটে নি। সুতরাং আপনাদের যা কিছু করার তা হল আপনাদের নিজেদের পাগলামী চিনে রাখা।

আমি কয়েক মাস ধরে চেষ্টা করে যাচ্ছি। সেই ঠোঁটজোড়ার বলা কথাগুলো আমার মনে আছে। না, ঠোঁটজোড়া না। কোন ঠোঁট ছিল না। ওটা আমিই ছিলাম। স্রেফ বিভ্রান্তি, প্রবঞ্চনা, মায়া এবং আমি।

সোনার হরিণ

হীরেন চট্টোপাধ্যায়

মোচড়ানো একটা সিগারেটকে সোজা করতে করতে ফোঁস করে একটা নিশ্বাস বেরিয়ে এল বাবলুর বুক থেকে।

বেঁচে থেকে আর সুখ নেই। কত লোক দেখ, দিব্যি জামা-কাপড়ে চেকনাই মেরে পাটভাঙা বাবুর মত দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। আর বাবলুর মত একটা তরতাজা জোয়ান ছেলে বসে বসে কী করছে! আসলে ভাল লোকের জন্যে এই পৃথিবীটা নয়। চুমকি অবশ্য রাগ হলেই যা তা বলে বসে বাবলুকে—চোর, ছ্যাঁচোড়, ছোটলোক যা

খুশি। মানে রাগলে তো আবার ওর মাথার ঠিক থাকে না। তা যে গরু দুধ দেয়, দু-চারটে চাঁটি মারলে সহ্য করতে হবে বৈকি। সময়ে অসময়ে চুমকিই তো ভরসা, মুখ ঝামটা দিলেও একসঙ্গে কয়েকখানা দয়লা আর চাইলেই পাওয়া যায় কার থেকে। সত্যি কথা বলতে কি একটু ভাব-ভালবাসা আছে বলেই না দেয়। নইলে যে মেয়ে গতর খাটিয়ে রোজগার করে তার সঙ্গে ভাব করার লোকের অভাব। তবে ওই যে কথাগুলো বলে—চোর, ছ্যাঁচাড়, ছোটলোক—একেবারে বাজে কথা। না, গঙ্গাজলে ধোয়া তুলসীপাতা বাবলু নয়, কিন্তু ভদ্রবেশী এমন সব ডাকাতে ভরে গিয়েছে শহরটা যে ওর মত ছোটখাটো মতলববাজকে নেহাৎ ভালোমানুষই বলতে হবে। আর ভালোমানুষের অন্ন নেই বলেই পকেটে স্রেফ একটা দু' টাকার নোট নিয়ে চুপচাপ বসে আছে ও।

সিগারেটটা ঠোঁটে লাগিয়ে পকেট থেকে দেশলাই বার করল বাবলু। পাড়াটা নিজের। অবশ্য উল্টোপাল্টা কাজ পেয়ে গেলে কলকাতার যে কোন প্রান্ত চষে ফেলতে ওর আপত্তি নেই। কিন্তু মানুষ এমন সেয়ানা হয়ে গেছে এখন—একটু চালে ভুল করে ফেললেই বিপদ, বেপাড়া হলে একেবারে পাড়ার উঠতি মস্তানরা আলুভাতে বানিয়ে দেবে। তার চেয়ে চেনা জায়গায় ব্যাঙ্কের সামনেটিতে বসে নিজের অদৃষ্টের কথা ভাবাই ভালো।

ফস করে সিগারেটটা ধরিয়েই ফের মনে হল বাবলুর কথাটা, বেঁচে আর সুখ নেই। উঠতে বসতে একটা চটকদার মেয়ের কাছে কথা শোনা—কাজকর্মের জুত নেই বলেই না। আজ যদি শালা এই ব্যাঙ্কের ওই ফাইল টানার একটা কাজও জোগাড় করা যেত, তাহলে ক্ষমতা ছিল চুমকির কথা শোনানোর। ভেবে দেখ একবার, বউ হয় নি তাই এই—হলে তো একেবারে বগলের তলায় চেপে রাখবে।

না, চুমকির দোষ দিচ্ছে না বাবলু। মাঝে মাঝে দু-একটা শাড়ি ব্লাউজ কি কানের দুল-টুল দিতে পারলে তবু যা হোক একটু ইজ্জত

থাকে। কিন্তু কাছে গিয়ে দাঁড়ানো মানেই পাত্তি ছাড়ো, এতে আর কার মেজাজটা ভাল থাকে।

গুলি মারো শালা এই ছিঁচকেমিতে। বাবলু সিগারেটে দুটো বড় বড় টান মেরে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল, ওসব ছিঁচকে বদমায়েসিতে পেট ভরবে না। দুনিয়াটা এখন ডাকাতের রাজ্য। তোমার মত ভালোমানুষের দ্বারা কিস্সু হবে না। তার চেয়ে সটান চলে যাও শিয়ালদা ইস্টিশনে—মালপত্তর বও, তবু যা হোক রোজ দশ-বিশটা টাকা হবে। তোমার মত ঝাড়াঝাপ্টা লোকের তাতেই চলে যাবে কোনরকমে। চাই কি চুমকিকে মাঝে-মধ্যে দু একটা শখের জিনিস-টিনিসও কিনে দিতে পারবে।

উঠেই পড়ছিল বাবলু, হঠাৎ অভিজ্ঞ চোখ আটকে গেল সামনে।

হিপি-টিপিই হবে বোধ হয়। গেঞ্জি আর হাফপ্যান্ট, পায়ে ফটফট হাওয়াই চপ্পল। কিন্তু পকেটে ঢোকাবার আগে মানিব্যাগে যে টাকাগুলো ঢোকাল, তার মধ্যে একটা চকচকে পাঁচশো টাকার নোট যে ঝলসে উঠল।

দূর থেকে দেখলে একশো আর পাঁচশোর তফাৎ ধরতে পারবে এমন লোক অল্পই আছে, কিন্তু বাবলুর কাছে এসব নস্যি। উঠতে গিয়েও থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল বাবলু। নাঃ, কাল থেকে যা হয় তাই হবে, আজকের মত কাজটা ছাড়লে চলবে না। ওই পাঁচশোর পাত্তিটা ওর চাই। চাই মানেই ধরা যেতে পারে ওটা ওর হয়ে গেছে। চুমকির জন্যে শ-দুয়েক টাকা খরচা করে একটা কিছু কিনতে পারলেই দিন সাতেকের জন্যে নিশ্চিন্তি।

সিগারেটটা পায়ের তলায় পিষে সামনে এগিয়ে গেল বাবলু। 'গুড মর্নিং স্যার, গুড মর্নিং!' বাবলু নিজের মুখটা যথাসম্ভব গোবেচারা করে রাখল, 'জাস্ট এ মিনিট স্যার। আই অ্যাম পুওর স্যার। মাই ফ্যামিলি—ভেরি গুড ফ্যামিলি স্যার। সো মেনি ফ্যামিলি-মেম্বারস—'

দম নেবার জন্যে এক সেকেণ্ড চুপ করেছিল। তার মধ্যেই বাবলু বুঝে নিয়েছে ওষুধ ধরেছে! চোখের দৃষ্টিই বলে দিচ্ছে ওর কথা ও বিশ্বাস করেছে। আর বিশ্বাস যখন করেছে তখন চালাও কোপ, দেরি করে লাভ নেই।

কথা কিন্তু হিপিই আগে বলল। চোখ দুটো একটু কুঁচকে খাটো করে বকল, 'কুডাই হেল্প ইউ?'

'ইয়েস স্যার, নো স্যার!' বাবলু যেন মানেটা বুঝেই জিভ কাটল, বললে, 'নট এ বেগার স্যার। সেলিং ফ্যামিলি প্রপারটি স্যার—'

চট করে পকেট থেকে ঝুটো মুক্তোর দুলটা বার করে ফেলল। পুরোন, কোন সন্দেহ নেই—মায়ের জিনিস না ঠাকুরমার তাও ভাল জানে না ও। তবে দাম যে এখন কুড়ি টাকার বেশি নয়, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এরকম জিনিস আরো অনেক আছে ওর কাছে।

'রিয়াল পার্ল স্যার—মাই গ্র্যাণ্ডমা হ্যাড স্যার—ইয়েস, ফাদারস মাদার। সি হাউ বিউটিফুল! ওনলি ফাইভ হানড্রেড স্যার।'

'ফাইভ হানড্রেড ওনলি!' হিপির চোখে সংশয়, 'ইজ ইট জেন্যুইন?'

'জেন্যুইন স্যার—রিয়াল পার্ল!' বাবলু ওর মনের সংশয়টাকে কাজে লাগিয়ে বলল, 'মে বি থাউজাণ্ড, মে বি মোর। গিভ স্যার ওনলি ফাইভ। ভেরি পুওর স্যার।'

বেশি বলার দরকার নেই, বাবলু আনন্দে গদগদ হয়ে উঠল। কুড়ি টাকার একটা বাজে মালের জন্যে ধরতে গেলে পাঁচশো টাকার একটা কড়কড়ে নোট ওর পকেটে এসে গিয়েছে। লোকটার হিপ পকেট থেকে ব্যাগটা বেরিয়ে এসেছে, পাঁচশো টাকার নোটটা দু আঙুলে বার করে নিয়েছে, বাবলু মনে মনে হিসেব করছে কত খরচ করবে চুমকির জন্যে, ঠিক এই সময়—যেমন ঝরে কাকের লুব্ধ

চোখের সামনে থেকে ছোঁ মেরে মাংসের টুকরো নিয়ে যায় ক্ষুধিত বাজপাখি, বাবলুকে প্রায় ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে হিপির সামনে দাড়িয়ে পড়ল রোজারিও।

সাক্ষাৎ শয়তান একটা। বাবলুদের মত ভালোমানুষের যম। জাল নোট তৈরির কল আছে। কখন যে কিভাবে হাজির হবে বলা মুশকিল। পুলিশের ওপরমহল পর্যন্ত যাতায়াত। সবাই চেনে, সুতরাং ভয়ডর বলতে কিছু নেই। চেহারাখানাও পুরো ভদ্দরলোকের মত—আসল ডাকাত কিনা।

কোন আশা নেই বুঝতে পেরে বাবলু সরে দাঁড়িয়েছিল। নীল প্যান্ট-শাদা শার্ট আর টাই পরা রোজারিও ধরে ফেলল তার শিকার।

'এক্সকিউজ মি স্যার—' চোস্ত ইংরিজিতে ও বোঝাতে লাগল হিপিকে, 'রাস্তায় এরকম যার তার কাছে কেনাকাটা করবেন না। আপনি বিদেশী বলেই বলছি—খুব বিপদে পড়ে যাবেন এতে।'

যাবে তো যাবে, ব্যাটা তোর কী। মনে মনে রোজারিওর বাপান্ত করতে লাগল বাবলু—আরে বাবা, ওর টাকা আছে, ও যদি একটা কুড়ি টাকার জিনিস নিয়ে পাঁচশো টাকার আনন্দ পায়, তাতে তোর কী। তুই বাগড়া দেবার কে?

'এখানে জাল টাকাও খুব চলে—' রোজারিও বললে, 'নোটটা একবার দেখি স্যার। ভয় নেই, আমি গভ্‌মেণ্ট অফিসার—এসব দেখাই আমার কাজ।'

লোকটা যে মুহূর্তে হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে, সেই মুহূর্তেই বাবলু বুঝতে পেরেছে এবার একটা জাল নোট হিপি ফেরৎ পাবে। হলও ঠিক তাই। হিপি বেশ রাগত স্বরে যেই বলতে শুরু করেছে, 'কি আশ্চর্য, ব্যাঙ্ক থেকে টাকা নিলাম আর আপনি বলছেন—'

সঙ্গে সঙ্গে থতমত খেয়ে টাকা ফিরিয়ে দিয়েছে রোজারিও, বলেছে, 'আমায় ক্ষমা করবেন স্যার, প্লীজ কিছু মনে করবেন না।

আগেই যদি বলতেন এটা ব্যাঙ্কের টাকা—নিন স্যার, আমি আবার ক্ষমা চাইছি—'

এরপর আর রোজারিওকে পাওয়া যাবে না, বাবলু জানে। ট্যাক্সি নিয়ে সোজা হাওয়া হয়ে যাবে একেবারে দক্ষিণ কলকাতায়, নয়তো দমদম-বেলঘরিয়ায়। 'কাজ' করার পর সে জায়গায় আর থাকে না ও।

কিন্তু আমি শালাকে ছাড়ব না। বাবলু নিজের মনে গজগজ করে উঠল, আমার মুখের গ্রাস এইভাবে ছিনিয়ে নিয়েছ। চুমকিকে কত দামের শাড়ি দেবো আমি ঠিক পর্যন্ত করে ফেলেছিলাম। ও টাকা আমার—দেখি তুমি কেমন করে ভোগ কর ওটা।

লোকটা যাতে চোখের আড়ালে না যায়, বাবলু ওকে লক্ষ্য করে এগিয়ে যাচ্ছিল, হিপিটা ওর পথ আটকালো, 'হে ম্যান, হোয়ারস্ ইওর পার্স? আই ওয়ান্ট আই হ্যাভ ইট।'

হাতে বাড়ানো পাঁচশো টাকার নোট, একটুকরো কাগজ ছাড়া যেটা কিছুই নয়। হাতটা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বাবলু বললে, ইট ইজ নাথিং—ফল্‌স পার্স। প্রাইস টোয়েন্টি!'

কিছু বলবার সুযোগ না দিয়েই ছিটকে বেরিয়ে এল বাবলু।

ওই তো, পাওয়া গেছে—ব্যাটা দোকানে দাঁড়িয়ে সিগারেট কিনছে। তা কিনবে না কেন, সক্কালবেলায় কড়কড়ে পাঁচশোটা টাকা লাভ।

দাঁড়াও, লাভ তোমার ঘোচাচ্ছি, ওটা আমার টাকা।

রাগে গা জ্বালা করছিল, কিন্তু নোটটা ফেরৎ পাওয়া যেতে পারে কেমন করে বাবলু ভেবে পাচ্ছিল না। ডাণ্ডা মেরে ব্যাটার মাথাটা দু ফাঁক করে দিলে কেমন হয়। মাথা যেমন আগুন হয়ে আছে, সেটা এমন কিছু ব্যাপার নয় ওর পক্ষে। তাছাড়া একটা বরাবরের ঝামেলা চোকে তাহলে। আমি শিকার ধরে আনব আর মাঝপথে তুমি ছিনিয়ে নিয়ে যাবে—সারাজীবন এটা সহ্য করার কোন মানেই

হয় না। পুলিশও খুব ভাল করেই চেনে ওকে, একেবারে হাতেনাতে ধরা না পড়ে গেলে ব্যাপারটা নিয়ে ঝঞ্ঝাটও খুব বেশি হবে না। কিন্তু কথা হচ্ছে এই কটকটে রোদ্দুরে—রাস্তায় গিজগিজ করছে লোক—এই অবস্থায় কেমন করে কায়দা করা যায় ওকে? ঠিক আছে, শালার পেছন ছাড়ব না—দেখি না কোথায় যায় বেটা! এখন না হয় দু' ঘণ্টা পরে ধরব, ওর মরণ নাচছে আজ আমার হাতে।

ভাবনায় ডুবে ছিল বলে ব্যাপারটা চোখে পড়ে নি ওর, যখন খেয়াল হল, পাঁচকড়ি সামন্ত একেবারে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে রোজারিওর।

এই এলাকায় কাজ করতে হলে পাঁচকড়ি সামন্তকে না চিনে উপায় নেই। গোকাল থানায় কাজ করে। হাতে টান পড়লে বেরিয়ে পড়ে এধার ওধার। ছিনে জোঁক একেবারে লোকটা। আরো ভাল করে চেনে বাবলু এই জন্যে যে ওর পাড়াতেই থাকে শয়তানটা! একেবারে জাঁকিয়ে বসেছে। গাবদা গোবদা একটা দুলালী মার্কা বউ আছে—ঠাট দেখলে কে বলবে সেটা লাট সাহেবের বেটি নয়! হবে নাই বা কেন, যা চাইছে তাই পাচ্ছে—দামী দামী সব পর্দা ঝুলছে চারদিকে। টিভি ফ্রীজ ভি-সি-আর, কী নেই ঘরে। সব শালা ওই রক্ত চুষে চলছে! ব্যাটার চোখও আছে বটে, রোজারিওকে পাকড়েছে তো ঠিক। ব্যাপারটা কী দাঁড়ায় দেখবার জন্যে চায়ের গুমটির পাশে দাঁড়িয়ে পড়ল বাবলু।

'কী চাঁদু, খবর কী?' সামন্ত অন্য দিকে তাকিয়ে কথা ছুঁড়ে দিল।

'আরে, আসুন আসুন—' রোজারিও একটা সিগারেট বাড়িয়ে দিল ওর দিকে, 'কী ভাল যে লাগল আপনাকে দেখে।'

'লাগবেই তো—' কুৎকুতে চোখে হাসতে দেখতে পেল বাবলু, সিগারেটটা ধরিয়ে বলল, 'একটু দেরি করে দেখা হয় তো আজকাল।'

'না না, সে কি কথা। কাজকর্মে ব্যস্ত থাকি—'

'ব্যস্ত দেখেই তো ডাকি নি। হিপিটার সঙ্গে কী এত কথা হচ্ছিল?'

'হিপি! ও, ওই ট্যুরিস্টটা? একটা ঠিকানার খোঁজ করছিল আর কি—তেমন কিছু নয়।'

'বটে! আর তোমার এই ইউনিফর্মটা? সেটাও কিছু নয়?'

'সবই তো বোঝেন। কী আদেশ বলুন আমার ওপর?'

'বাবা! বিনয়ের অবতার!' খ্যাঁকখ্যাঁক করে হাসল সামন্ত, 'কিছু ছাড়ো তো চাঁদ, হাত একেবারে গড়ের মাঠ। বউ বায়না ধরেছে অফিসারের বউয়ের সঙ্গে কাল পিকনিকে যাবে।'

'কত চাই বলুন।

'পাঁচের কম কি আর হয়।' সামন্ত সিগারেটে বড় করে একটা টান মেরে অন্য দিকে তাকিয়ে বলল, 'দরাদরি করো না যেন আবার। এ মাসটা তোমায় রেহাই দিলাম।'

বাবলু বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে দেখল, ওর পাত্তি ঢুকে গেল সামন্তর প্যান্টের পকেটে।

হয়ে গেল! হাত কামড়াতে ইচ্ছে হল বাবলুর। আর আধ মিনিট সময় পেলেই পাত্তিটা নিয়ে হাওয়া হয়ে যেতে পারত! তার মানেই চুমকির একটা শাড়ি, তারপর রাজার হালে একটা সপ্তাহ কাটানো। তার বদলে কী যে সব গণ্ডগোল হয়ে গেল—ওর পাত্তি এখন বিশ বাঁও জলে।

সামন্তর পকেট থেকে পাঁচশোর পাত্তি সরিয়ে নেওয়া! অসম্ভব! এর চেয়ে সাপের গর্তে হাত ঢোকানো ভাল। কিন্তু আমার পাত্তি শালা এমনি করে বেহাত হয়ে যাবে! চোখ চেয়ে দেখতে হবে সেটা!

মাথার ভেতরটা চিড়বিড় করে জ্বলছিল। বাবলু ভাবতেই পারছিল না, পাঁচশো টাকার নোটটা ওর নয়! পয়সা শিকার করে

ধরেছে, আর সেই পাত্তিটাই ঘুরছে আরো বড় ডাকুদের হাতে হাতে। কিন্তু সত্যি কথা বলতে গেলে পাত্তিটা তো ওরই—ওর হকের টাকা।

প্রায় কিছু না বুঝেই সামন্তকে অনুসরণ করছিল ও। রোদ্দুরের কি তেজ রে বাবা! মাথার ঘিলু পর্যন্ত শুকিয়ে উঠছে। ব্যাটা শয়তানের বাচ্চা দিব্যি হেসে হেসে কথা বলছে রাস্তার দোকানদারের সঙ্গে। ওই তো দাঁড়িয়ে গেছে এক ভাঁড় চা নিয়ে।

আড়ালেই দাঁড়াল বাবলু। কাছে যাবার উপায় নেই। পকেটের ভেতর লেপটে আছে একটা ময়লা দু টাকার নোট। ব্যাটা একটা ঠাণ্ডা খাওয়াতে বললেই চিত্তির। কি করবে কিছুই বুঝতে পারছিল না। সামন্তর পকেটে না গিয়ে অন্য যে কোন জায়গায় যদি যেত ওটা—

ঠুনঠুন রিক্সা থেমে গেল সামন্তর পাশে এসে। আরে, দুলালীটা এখানে কী করতে এসেছে। বরের সঙ্গে এত পিরীত!

পিরীতের কারণটা জানা গেল রিক্সা থেকে নামার পরেই। বললে, 'তুমি এখানে!' এই গরমে আমি টো টো করে ঘুরে মরছি তোমার জন্যে।'

'কেন?'

'কেন। মিসেস শর্মা যে বসে আছে আমার বাড়ি!'

'সেকি!'

'সে কি মানে? আজকেই চাঁদা কালেকশনে আসবে তোমায় বলেছিলুম না?'

'কী সর্বনাশ, এ-এস-পির মিসেসকে বসিয়ে রেখে এসেছ?'

'উপায় কী। অনেকক্ষণ এসেছি, থানায় এসে শুনলাম তুমি বেরিয়েছ—'

'নাও, নাও—'

বাবলু লুব্ধ চোখে তাকিয়ে দেখল তার পাত্তি গিয়ে ঢুকল

দুলালীর ব্যাগে। হতাশ দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে একটা সিগারেট ধরানোর জন্যে পকেটের সবেধন নীলমণিটা বার করতে যাচ্ছিল বাবলু, হঠাৎ কেমন রোখ চেপে গেল ওর।

না, এ টাকা ওর। এত সহজে হাল ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবে না। সামন্তর বউ যা বলল, তাতে অবশ্য তার পেছন পেছন যাওয়ার কোন মানে হয় না, কিন্তু একেবারে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বার করে দেওয়ার মত জায়গা না হলে ওকে যেতেই হবে। উপায় নেই।

কলকাতার টানা রিক্সার পেছন পেছন যাওয়া এমন কিছু শক্ত ব্যাপার নয়। কিন্তু বাবলুকে অবাক করে দিয়ে খানিক দূর যাবার পরই রিক্সাটা দাঁড়িয়ে গেল।

কী ব্যাপার! সামন্তর বাড়ি তো আরো অনেকখানি দূর! দুলালীটা এতখানি গতর নিয়ে হেঁটে যাবে নাকি এতটা পথ! যেরকম তাড়া বলল তাতে তো এখানে নেমে পড়ার কথা নয়!

এতক্ষণ তবু অবাক হচ্ছিল, এবার যা দেখল তাতে বাবলুর চোখ ভেতর থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসার জোগাড়।

এ কোথায় যাচ্ছে সে! এটা তো কুখ্যাত স্মাগলার ছোটু গুপ্তর বাড়ি! তাহলে—

ছি ছি ছি—ডাইনী মুটকি কোথাকার! এই তোমার পিকনিকের টাকা নেওয়া? ভেতরে ভেতরে ওই ছোটু গুপ্তর সঙ্গে বেন্দাবন-লীলা চালাচ্ছ তাহলে!

হারামজাদা শয়তানী একটা! মনে মনেই বিশ্রী গালাগাল দিল বাবলু। এই মুহূর্তে সামন্তর জন্যে দুঃখ হল ওর। এত উঞ্ছবৃত্তি করে লোকটা টাকা জোগাড় করে—বউয়ের মন জোগাবার জন্যে মাথার ঘাম পায়ে ফেলেছে! আর গোবদা দুলালী কিনা তাকে শুষে নিয়ে যাচ্ছে পিরিতের লোকের কাছে!

জঘন্য! মেয়ে জাতটাই এমনি বোধ হয়।

এতক্ষণে অদ্ভুত একটা ক্লান্তি অনুভব করতে পারল বাবলু।

বাড়িটার উল্টোদিকে ছোট্ট চায়ের দোকান। দুটো সিঙারা আর এক কাপ চা দিতে বলল।

সিঙারায় একটা কামড় দিয়ে ওর মনে হল, চুমকিও কি এই-রকমই করবে। একদিন না একদিন বিয়ের প্রশ্ন উঠবেই। বিয়ের পর সংসারের খরচ টানবার জন্যে ওকে হাড়ভাঙা খাটনি খাটতে হবে। সেই মাথার ঘাম পায়ে ফেলা পয়সা নিয়ে চুমকিও কি ফুর্তি মারতে যাবে অন্য লোকের সঙ্গে। ওই দুলালীটার মত? হুঁঃ, যাক না একবার—বুঝতে পারবে আড়ং ধোলাই কাকে বলে। একদিন ওই ঝাড় খেলে আর পরের দিন—

দূর, দূর এসব কী ভাবছে ও। বাবলু তাড়াতাড়ি চা-টা শেষ করে নিয়ে উঠে পড়ল। পাশেই সিগারেটের দোকান। খুচরোগুলো উপুড় করে দিয়ে একটা সিগারেট কিনল। নিশ্চিন্ত, এখন কেউ ঠেঙালেও একটা পয়সা বেরুবে না ওর পকেট থেকে।

সিগারেটে দুটো টান দিয়েই সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল বাবলু। দুলালী বেরিয়ে এসেছে, একেবারে এসে দাঁড়িয়েছে পান-সিগারেটের দোকানে। একপাশে সিঁটিয়ে থেকে, পানের পয়সা দেবার সময় বাবলু দেখে নিল, মানি ব্যাগে ওর সেই পাঁচশোর পাত্তি লোপাট।

নির্ঘাৎ ডাইনীটা ছোটু গুপ্তর শ্রীচরণে নিবেদন করে এসেছে পাত্তিটা।

দুঃখটা ভুলে ছিল অল্প সময়ের জন্যে, এখন আবার উথলে উঠল সেটা। ইস, আমার পাত্তি লোপাট হয়ে গেল এইভাবে। নিজের হক্কের ধন ছেড়ে দেব। বাবলুর মাথাটা গুলিয়ে যাচ্ছিল। এখন যদি সোজা ঢুকে যাই বাড়ির মধ্যে, নিজের টাকা নিজে ফেরৎ চাই। হাড়বজ্জাত লোকটা চাইলেই দিয়ে দেবে না এটা ঠিক, বরং নিজেরই প্রাণসংশয় হয়ে উঠতে পারে, আর প্রাণ বাঁচাবার জন্যে হয়তো বাধ্য হয়ে—

উঁহু, কাজটা বুদ্ধিমানের মত হবে না। এলেমদার লোক গুপ্ত,

হাতে অনেক পোষা গুণ্ডা আছে। গোঁয়াতুর্মি করে জানটা খোয়াবার কোন মানে হয় না।

হঠাৎ বাবলুর সমস্ত ইন্দ্রিয় টানটান হয়ে উঠল। ছোটু গুপ্ত বেরিয়ে এসেছে বাড়ি থেকে। আর দামী শার্ট-প্যান্ট, বাহারি চপ্পল—কে বলবে শালা এক নম্বরের শয়তান। শয়তান হতে হয় তো এই রকম, ওর মত ভালোমানুষের পক্ষে এসব লাইন নয়।

ভাবনার সময় অত্যন্ত অল্প। সিগারেট ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চুলগুলো উস্কোখুস্কো করে নিল বাবলু, তারপর একদৌড়ে গুপ্তর সামনে গিয়ে বললে, 'আপনিই ছোটু গুপ্ত তো?'

কথা না বলে ঘুরে দাঁড়াল ছোটু গুপ্ত। বাবলু সেইভাবেই বলে গেল, 'সামন্তবাবুর স্ত্রী পাঠালেন। এক্ষুণি যে পাঁচশো টাকার নোটটা দিয়েছেন সেটা ফেরৎ নিয়ে আসতে বললেন। সামন্তবাবু টের পেয়ে গেছেন—হয় যে জিনিস কিনতে ওটা দিয়েছিলেন সেটা চাই, নয় টাকাটা। তাই—'

দরকারের চেয়ে আরো বেশি হাঁফানোর কথা শেষ করতে পারল না বাবলু। 'তাই বলল 'তোমাকে'!' ছোটু গুপ্ত সন্দেহ করে নি এই রক্ষে, কিন্তু পরের কথাগুলো শুনে আর মনের মধ্যে আনন্দটা রইল না। ও বলছিল, 'মেলাটা জমুক তাহলে। ওই মুটকিটাকে আমি আর সহ্য করতে পারছি না। যাও যাও, ভাগো এখান থেকে!'

এবার! কী করবে বাবলু! এই কথার পর তো আর দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। এতক্ষণ ওকে অন্তত সন্দেহ করে নি, এর পরও কাঁউ কাঁউ করতে গেলে কি আর কিছু বুঝতে বাকি থাকবে ধড়িবাজ লোকটার!

উপায় নেই, সরে এল বাবলু। ওঃ, কি জঘন্য এই পৃথিবীটা! চোর, বদমাস, জোচ্চোর, মতলববাজ, ডাকাত, শয়তান—সব গিজগিজ করছে। ওর মত ভালোমানুষ কখনো টিকতে পারে না

এখানে। চুমকিকে শাড়ি দেওয়া দূরে থাক, দুপুরের খাবারটা কেমন করে জোগাড় হবে সেইটেই সমস্যা। পকেটে তো একটা তামার পয়সাও নেই—ওই দুটো পানিফলের মত সিঙারা খেয়েই কি দুপুরটা পেটে কিল মেরে কাটাতে হবে নাকি!

ভাবছিল আপন মনে, কিন্তু চোখ দুটো ছিল ছোটু গুপ্তের ওপর। পাও চলছিল নিতান্ত অভ্যাসের বশেই। হঠাৎ ছোটু গুপ্তকে থামতে দেখে ও-ও থেমে গেল।

ভিখিরির মত খেঁকুরে লোকটার সঙ্গে আবার কি দরকার হল ছোটু গুপ্তের! আড়াল না পেয়ে খৈনি ডলা একটা ঠেলাওয়ালার সামনে হাত পেতে দাঁড়িয়ে গেল বাবলু। বলা বাহুল্য, চোখ দুটো থাকল ওই দিকেই।

লোকটার হাতে ছিল জুতোর বাক্সর মত একটা প্যাকেট, কি আর একটু ছোট। সেটা সরাসরি তুলে দিল গুপ্তর হাতে, যেন আগে থেকে কথাবার্তা বলাই ছিল। ছোটু গুপ্তও কালবিলম্ব না না করে ব্যাগ খুলে—

বাবলু দেখতে পেল আর একখানা একশো টাকার নোটের সঙ্গে ওর সেই চকচকে পাত্তিটাও দিয়ে দিল লোকটাকে। তারপরই বাক্স নিয়ে মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

তা যাক, বাবলুর এখন দরকার এই লোকটাকে। ওর মনে হচ্ছিল, এমন সুযোগ আর পাওয়া যাবে না। চেহারার যা ছিরি লোকটার, তেমন একটা কিছু করারও দরকার হবে না—গলাটা একবার টিপে ধরলেই সুড়সুড় করে বেরিয়ে আসবে পাত্তিটা। কিন্তু তার জন্যে দরকার আর একটু নিরালা জায়গা। মনে হয় কিছুক্ষণ লোকটার সঙ্গে সেঁটে থাকলেই সে সুযোগ পাওয়া যাবে।

এতক্ষণে কপালটা খুলল মনে হচ্ছে। ভাগ্যদেবী এইভাবেই বোধ হয় সাহায্য করেন অধ্যবসায়ী মানুষকে। কপালগুণে লোকটা গিয়ে ঢুকল সেই 'বারে'ই যেটা বাবলুর নিজের ঠেক। ঠেক মানে

এখানকার খাবার দাবার যে ওর কপালে জোটে এমন নয়, কিন্তু বেয়ারা থেকে শুরু করে মালিক পর্যন্ত ওকে চেনে। হাঙ্গামা একটা কিছু বাধলে, ওই অচেনা লোকের চেয়ে ওর নিজের সুবিধেই হবে বেশি।

কিন্তু দরজায় মাথা গলিয়ে যা দেখল তাতে এতক্ষণকার উচ্ছ্বাস এক মুহূর্তে মিলিয়ে গেল।

ভারী পর্দা টানা জানলা আর হালকা আলোর জন্যে ভেতরটা অবশ্য খুব ভাল দেখা যায় না, তবু যেটুকু দেখা যায় তাতেই লোকটাকে দেখে ও আঁতকে উঠেছে।

মানুষ না বলে দানব বললেই ভাল হয় ওটাকে। যেমনি দশাশই চেহারা, তেমনি রাক্ষসের মত হাবভাব। সত্যি কথা বলতে কি, এমন ভয়ঙ্কর-দর্শন লোক বাবলু এখানে কেন, কলকাতার কোন অঞ্চলেই বোধ হয় কখনো দেখে নি। খেঁকুরে লোকটা সবাইকে ছেড়ে এগিয়ে গেল কিনা সেই দানবেরই কাছে, আর একটিও বাক্যালাপ না করে টাকাটা বেমালুম গুঁজে দিল তার হাতে।

তালপাতার সেপাই বেরিয়ে যাবার পরও খানিকক্ষণ ভাবল বাবলু। একেবারেই আশা ছেড়ে দেবে! না, জোর টোর করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। ওই হাতের খুব মোলায়েম একটা ছোঁয়া পেলেই বাবলুকে আর উঠে দাঁড়াতে হবে না। তবু, চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কি! পাত্তিটা তো আসলে ওরই।

ছায়ার মত লোকটার পাশে এসে বসে পড়ল বাবলু, ফিসফিস করে বলল, ভাল কিছু পেতে হলে স্যার আমাকে বলুন—এখানকার সবকিছু আমার জানা আছে। একবার শুধু মুখের কথাটুকু খসান।'

যেমন দেখতে তেমনি চোখের দৃষ্টি। বুকের ভেতর পর্যন্ত পুড়িয়ে দেয় একেবারে। ভদ্রতার লেশমাত্র ধার না ধেরে হেঁড়ে গলায় বললে, 'খুব সুবিধে হবে না এখানে—চটপট সরে পড় তো।'

'আমি আপনার ভালর জন্যেই বলছি, এখানে তো আপনি

নতুন। যা চান—'

'যা চাই আমি নিজেই জোগাড় করে নিতে পারব। যাকে চাই না তাকে দেখলে আমার হাত নিশপিশ করে। ভাল চাও তো কেটে পড় এখান থেকে।'

ভাবা যায়, এই সেই লোক যার কাছে রয়েছে বাবলুর সেই পাত্তিখানা? সারাটা দিন যার পেছনে দৌড়ে বেড়াচ্ছে বাবলু, সেই চকচকে লোভনীয় কাগজখানা! ভাগ্যের কি নিদারুণ পরিহাস! তীরে এসেও তরী ডুবে যায়। আর বিপদ যত তা হয় এই সব ভাগ্যো-মানুষদেরই। বদমাইসের দল ক্রমশ বড়লোক থেকে আরো বড়লোক হচ্ছে, আর যে তেমন কিছুই চায় না, ভালোভাবে বাঁচতে চায়—

বারের বাইরে ইতস্তত পায়চারি করতে করতে এইসবই ভাবছিল বাবলু। হঠাৎ ওর মাথার ভেতর যেন কে রিনরিন করে একটা মিষ্টি বাজনা বাজাতে শুরু করল। উচ্ছ্বাস সামলাতে না পেরে বারের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে পড়ল ও আবার।

বাইরে থেকে এসে ভেতরটা আরো অন্ধকার লাগছে। তবু বাবলু শিকারী বেড়ালের মত চোখ করে দেখে নিল। একলা একটি চেয়ারে বসে থাকা ছিপছিপে মেয়েটার দিকেই যাচ্ছে দানবটা।

চমৎকার! একটা পাঁচশো টাকার পাত্তি, এখানকার চমৎকার কাটলেট আর আর চুমকির শাড়ি—তিনটেই একসঙ্গে ভেসে উঠল চোখের সামনে। চটপট একটা চেয়ার টেনে নিয়ে তুড়ি মেরে ডাকল ও বেয়ারাকে।

'শোন, একটা গরম কাটলেট দাও—সঙ্গে একটা ছোট হুইস্কিও দিও।'

চেনা বেয়ারা, একটু মুখের দিকে চেয়ে বলল, 'টাকাটা কে দেবে, গৌরী সেন?'

'এই শর্মাই দেবে, ঘাবড়াচ্ছো কেন?'

'চালাকি করছ না তো?'

'আরে, না রে বাবা, দেখছ না কাকে ধরে নিয়ে এনেছি।'

'ওই রাক্ষসটা ?' বেয়ারা মুখ ভেটকে বলল, 'ওরকম ফঁকো নবাব আমি অনেক দেখেছি।'

'আরে বাবা, তুমি দেখে যাও না। টাকাটা পাওয়া নিয়ে তো কথা।'

বেয়ারা চলে গেল। শিকারীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়ে ট্যারা চোখে চেয়ে রইল বাবলু।

হুইস্কির পাত্রে চুমুক দিচ্ছে দানবটা। ছুঁড়িটার লীলায়িত ভঙ্গি দেখে তার চোখ চকচক করছে, দূর থেকেও স্পষ্ট বুঝতে পারছে বাবলু।

দানবটা আর একটু ঘেঁষে গেল তার দিকে।

মেয়েটার চোখে যেন আহ্বানের ইঙ্গিত, ঠোঁটে হালকা হাসি।

দানবটা আর সামলাতে পারল না, দুটো হাত তুলে দিল ওর কাঁধে।

মেয়েটা একেবারে হুমড়ি খেয়ে পড়ল ওর বুকের ওপর।

দানব পরম আয়েসে ওর কাঁধের ওপর এলিয়ে দিল নিজের মাথা। আর তারপরই –

সহসা ছিটকে উঠে পড়েছে মেয়েটা। সঙ্গে সঙ্গে সশব্দে এক চড় কষিয়েছে দানবের গালে।

দানবটা প্রথমে হকচকিয়ে গিয়েছিল, পরক্ষণে যেন গাঁক গাঁক করে কি একটা বলে উঠল। কিন্তু তাকে ছাপিয়ে বেজে উঠল মেয়েটির গলা।

ছুটে এল বেয়ারা। দানবমূর্তি লোকটা কিছু বলবার আগেই বললে, 'কী হচ্ছে কী এসব ?'

'কী হচ্ছে মানে ? দেখতে পাচ্ছ না এই ছুঁড়িটা—'

'চোপ! আর একটা কথা বললে আমি পুলিশ ডাকব। বেরিয়ে যান এখান থেকে।'

'মানে ?'

'মানেটা আমাদের মালিক জানতে পারলে আরো ভাল ভাবে টের পাবেন। মহিলাদের পেছনে ছোঁক ছোঁক করছেন—আবার মানে! বেরোন!'

'তুমি আমায়—'

'ফের তর্ক করছেন! ঠিক আছে, আমি পুলিশকেই জানাচ্ছি—'

বেয়ারা টেলিফোনের কাছে যাবার আগেই উঠে পড়েছে লোকটা। একবার বিষদৃষ্টি হেনে বেরিয়ে গেল গটগট করে।

মেয়েটা একটা লোভনীয় কটাক্ষ করে এবার বাবলুর সামনা-সামনি বসে পড়ল। হাসি মুখে বাবলু বেয়ারাকে ডেকে আর একটা কাটলেটের অর্ডার দিল, তারপর মেয়েটার দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, 'ওই পাঁচশোর পাত্তিখানা কিন্তু আমার।'

'মানে ?'

'মানে যে মানিব্যাগ তুমি সরালে তার মধ্যে ওরকম একখানা পাত্তি আছে।'

'কী আবোল তাবোল বকছো ? ওরকম ফালতু লোকের পকেটে অত টাকা থাকে ?'

'শুধু ওই একটি পাত্তি—' প্রায় হুকুমের সুরে বলল বাবলু, 'বাকিটা তুমি রাখো না, আমি কি আপত্তি করেছি ?'

কী করে ব্যাপারটা জানল বাবলু ভেবেই পাচ্ছিল না মেয়েটা। তবু বিস্ময় চেপে রেখে বললে কিন্তু পেলাম তো আমি—তুমি চাইছ কেন ?'

'বাঃ, ওই দানবটাকে এখানে নিয়ে এল কে! তোমার কাছে ওকে পাঠালো কে!' বাবলু এক চুমুক হুইস্কি খেয়ে উত্তেজিত গলায় বললে, 'তুমি কি ভেবেছো এমনি এমনিই ও তোমার কাছে গেছে ? সেই সকাল থেকে এই পাঁচশো টাকার নোটখানা আমি পাহারা দিয়ে বেড়াচ্ছি।'

খুব একটা ইচ্ছে ছিল না বোঝাই যাচ্ছিল, তবু মেয়েটা ব্যাগ খুলে পাত্তিটা বাড়িয়ে দিল ওর দিকে।

আঃ, সেই পাত্তি—কড়কড়ে পাঁচশো টাকা। সারা সকাল ছুটিয়ে বেরিয়েছে এই কাগজের টুকরোটা। এখন সেটা বাবলুর, হ্যাঁ বাবলুর। সৎ কাজের পুরস্কার ভগবান এমনি করেই দেন।

এখন বাবলু আবার স্বপ্ন দেখতে পারে, অনেক স্বপ্ন। চুমকির শাড়ি—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই সেটা কেনা হবে। বাবলুর মন যে কত বড়, কত উদার সেটা ওকে দেখাতেই হবে। এখন আর চুমকি কোন অভিযোগ করতে পারবে না ওর কাছে, অন্তত দামী শাড়িটা পাবার পর তো নয়ই। আজ রাত্তিরটা—আঃ, কি সুন্দর কাটবে আজকের রাত। ভাল হোটেলে গিয়ে পেটভরে মাংস-ভাত, তারপর আরামের ঘুম। পরের দিনের ভাবনা ভাবতে গিয়ে আর আজ রাত্তিরের ঘুম নষ্ট হবে না।

মেয়েটার পিঠে আদর করে একটা হালকা চাপড় দিল বাবলু। নিজেকেও বেশ পরিতৃপ্ত মনে হচ্ছিল ওর। সারাদিন মাথা খাটিয়েছে, পরম নিষ্ঠায় লেগে থেকেছে একটা কাজের পেছনে, একবারও আশা না ছেড়ে কঠিন প্রতিজ্ঞায় অটল থেকেছে। সেই জন্যেই তো এত বড় একটা কাজ জীবনে ও করতে পেরেছে—হ্যাঁ, এই জঘন্য পৃথিবীতে একটা নিপাট ভালোমানুষ হওয়া সত্ত্বেও। আর সেই সঙ্গে কঠিন শাসনে রাখতে পেরেছে সেই মেয়েকেও, যার কাছে হাত পাততে হয় মাসের মধ্যে বিশ পঁচিশটা দিন।

পরম তৃপ্তিতে মেয়েটার গালে একটা আলতো টোকা দিয়ে বাবলু বললে, 'আমার আদরের চুমকি!'

মনে মনে

অমল রায়

লতিকার ঘুম ভেঙে গেল।

সকালের আলো সারা ঘরে খেলা করছে। লতিকার মনে হল, আলো ছড়িয়ে পড়েছে বললে সবটুকু বলা হল না। বরং ভাবা হবে—আলোর ঝাঁক ঘরে ঢুকে সারা ঘরে লুটিয়ে পড়েছে। এখন ক'টা বাজে? সকালের বয়েস কত হল? দেওয়ালে টাঙানো ঘড়ির দিকে তাকাল। সাতটা বাজব-বাজব করছে।

একটা বুলবুলি জানলার ওপর বসে ডাকছে কিচিরমিচির করে। বেশ ভাল লাগছিল লতিকার। ভোরের আলোর সঙ্গে পাখিটার

আলতো ডাক যেন মিষ্টি এক পরিবেশ সৃষ্টি করেছে।

লতিকা জানলার দিকে পাশ ফিরতেই পাখিটা ফুড়ুৎ করে উড়ে গেল। চোখের আড়াল হয়ে গেল পাখিটা। আসলে পাখিটা ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল, কিন্তু লতিকা তো ওকে ভয় দেখাতে চায় নি। তবু যেভাবে ওটা পালাল, লতিকার মনে হল ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল।

ঠিক দিবাকরের মত—পাখিটা যেমন করে পালিয়ে গেল, সেদিন দিবাকরও ঠিক ওইরকম ভাবে পালিয়ে গেছে। বেচারা দিবাকর। অথচ লতিকা তাকে মোটেই ভয় দেখাতে চায় নি।

দিবাকর অস্ফুট কণ্ঠে বলেছিল, তুমি দেখছি আমাকে ভয় পাইয়ে দিচ্ছ! তোমার কি মতলব বল দেখি।

ভয় তোমাকে দেখাচ্ছি না।—লতিকা বলেছিল, শুধু আমাদের বিপদের কথা তোমাকে জানালাম।

ব্যাপারটা মোটেই বিপদ নয়।

তাহলে কি?

সমস্যা তো বটে।

মোটেই নয়।

নয়?

না।

তুমি বলছো কি, দিবাকর!

বেশ তো, বিপদ বলেই যদি মনে হয়, চল আমার এক ডাক্তার বন্ধুর কাছে। ঝেড়ে-মুছে ঠিক করে দেবে। কুল মান সব বাঁচবে।

না।—লতিকা দাঁতে দাঁত চেপে বলেছিল, ভ্রূণহত্যা আমি করতে দেব না!

কিন্তু সমাজের কথা ভাবো।—দিবাকর বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করেছিল, এই সমাজেই তো আমাদের বাস করতে হবে।

এসব কথা গতকাল দুপুরের। দিবাকর অনেক ভাবে বুঝিয়েছিল

লতিকাকে, কিন্তু সে বুঝতে চায় নি, রাজী হয় নি ভ্রূণ আকারে তার উদরে যার আবির্ভাব ঘটেছে তাকে নষ্ট করে ফেলতে।

একটা অ্যাক্সিডেন্টকে তুমি এভাবে আঁকড়ে ধরে থাকতে চাইছ কেন, লতিকা? আমাদের দুজনের বাকি জীবনটা নষ্ট করে ফেলতে চাইছ কেন?

এসো, আমরা বিয়ে করি।

দিবাকর দু' পা পিছিয়ে গিয়ে বলেছিল, বিয়ে!

এ সমস্যা থেকে উদ্ধার পাওয়ার এটাই তো সহজ পথ।

কিন্তু লতিকা—, দিবাকর থেমে থেমে চিবিয়ে চিবিয়ে বলেছিল, এখন বিয়ে তো করা সম্ভব নয়।

কেন?

কেন তা কি তুমি জানো না?

জানে লতিকা। দিবাকরের বাবা চান না তাঁর ছেলে কোন অসবর্ণ বিয়ে করুক। এ বিয়ে করলে ছেলেকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করবেন। তার মানে জেনে শুনে দারিদ্র্যের মধ্যে ঝাঁপ দেওয়া। কে না জানে যে দারিদ্র্য যদি দরজা দিয়ে ঢোকে, তাহলে ভালবাসা জানলা দিয়ে পালায়। তার মানে সামনে শুধু চাপ চাপ অন্ধকারের দিকে এগিয়ে যাওয়া।

আমার চেয়ে বাপের সম্পত্তি তোমার কাছে বড় হল?

তার চেয়ে চল না কেন একজন ডাক্তারের কাছে?

না।

তাহলে আমাকে ভাবতে সময় দাও।

বেশ, ভাবো। কত সময় লাগবে?

কয়েক ঘণ্টা।—দিবাকর বলেছিল, আমি সন্ধ্যেবেলা এসে চূড়ান্ত কথা বলব।

বেশ, আমি অপেক্ষা করব। কিন্তু যদি সন্ধ্যার সময় না আসো—

না, ঠিক আসব। ইউ ওয়েট ফর নি।

কিন্তু তুমি সন্ধ্যায় না এলে একটা অঘটন ঘটে যেতে পারে।

না, ঘটবে না, আমি ঠিক আসব।

তোমার জন্যে আমি অপেক্ষা করব।

কিন্তু দিবাকর আসে নি। অনেক রাত পর্যন্ত পথ চেয়ে ছিল লতিকা। তার পর পথ চেয়ে বসে থাকবার আর দরকার হয় নি। একটা সময় আসে যখন আর প্রতীক্ষার প্রয়োজন থাকে না। অত রাতেই লতিকার ইচ্ছা হচ্ছিল দিবাকর যে হোটেলে উঠেছে, সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয়। মানুষটার মুখোমুখি হয়। তাছাড়া অত রাতে বাবা তাকে যেতে দিতেন না। একবার ভেবেছিল পরদিন ভোরেই ঠিক গিয়ে উপস্থিত হবে, কিন্তু মনটা আশঙ্কায় ভরে উঠল। এমনও তো হতে পারে, আজই হয়তো দিবাকর হোটেল ছেড়ে কেটে পড়বে? কাল গিয়ে দেখা মিলবে না। তাহলে?

তাহলে আজ রাতেই যাওয়া দরকার। কিন্তু মনের ইচ্ছা ত্যাগ করতে হল লতিকার। আকাশ ঘন মেঘে ছেয়ে আছে। বৃষ্টি হয়তো এক্ষুণি নামবে। না, আজ রাতে যাওয়ার ইচ্ছা তাকে ত্যাগ করতেই হবে। কিন্তু মনটা যেন মানতে চাইল না, যদি কাল সকালে···

তারপর একসময়ে লতিকা ঘুমিয়ে পড়ল। তারপর···

আবার পাশ ফিরল লতিকা। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হল জলে বুঝি ঝাঁপিয়ে পড়ল। তার পরনের নাইটি যেন ভিজে সপসপ করছে। এমন করে তার পোশাক ভিজলো কি করে? এখুনি বিছানা থেকে নেমে ভিজে সবকিছু ছেড়ে ফেলে শুকনো পোশাক পরা দরকার। নইলে ঠাণ্ডা লেগে নিমোনিয়া হয়ে যাবে। ভাববার সঙ্গে সঙ্গে হাঁচলো লতিকা বারদুয়েক।

এখন লতিকার মনে পড়ছে, যেন স্বপ্ন দেখা আলতো আলতো ভাবনা। মনে হচ্ছে কাল রাতে সে ঘন বর্ষার মধ্যে বেরিয়েছিল। যাকে স্বপ্ন বলে মনে হচ্ছিল সেটা তাহলে স্বপ্ন নয়। সত্যিই সে

ষ্টির মধ্যে বেরিয়েছিল। যদি বেরিয়েই থাকে, তাহলে সে কি করেছে? দিবাকরের কাছে গিয়েছিল? কিন্তু সেরকম কোন কথা তো মনে পড়ছে না। দিবাকরের কাছে গিয়ে কি করেছে? একটু গভীর ভাবে চিন্তা করতেই লতিকার মনে পড়ল, দিবাকরের কাছে গিয়ে ভীষণ কান্নাকাটি করেছে সে। যা এতক্ষণ স্বপ্ন বলে ভাবছিল সে, তা তাহলে স্বপ্ন নয়। সত্যিই বা হবে কি করে?

তাহলে কি ছোটবেলাকার সেই রোগ এখনও তার ঘাড়ে ভূতের মত চেপে বসে আছে! ঘুমের মধ্যে হেঁটে চলে বেড়ানো। এখন একটু একটু মনে পড়ছে ডাঃ বরাটের কথাগুলো! বাবাকে তিনি বলেছিলেন একটু সাবধানে থাকতে, কারণ তাঁর মেয়ে একটা রোগে ভুগছে। মনে যে কাজের গোঁ নিয়ে সে ঘুমোবে, সে কাজ ঘুমের মধ্যে করবার প্রবণতা তার মধ্যে থাকবে। তবে একটু বয়স বাড়লে আপনা থেকে সেই রোগের হাত থেকে মুক্তি পাবে।

কিন্তু সে মুক্তি পায় নি সেই রোগের হাত থেকে। যে রোগ পনেরো বছর আগে তার মধ্যে বিশ্রী ভাবে প্রকাশ পেয়েছিল, তা আজও তার মধ্যে কাজ করছে।

আমি তাহলে রোগমুক্ত নই?—দু হাতে মাথার চুল মুঠো করে চেপে ধরে লতিকা ভাবল, আমি তাহলে ঘুমের মধ্যে গত রাতে কি করেছি?

কিন্তু তার প্রশ্নের উত্তর কেউ দিল না। বুকের মধ্যে ধড়ফড় করে উঠল। মনে হল দমটা বুঝি বন্ধ হয়ে যাবে।

ছোটবেলাকার একটা ঘটনার কথা মনে পড়ল লতিকার। তার একটা বেশ বড়সড় পুতুল ছিল, সেটা কোন সময়ের জন্যে সে কাছ-ছাড়া করত না। একদিন কি কারণে যেন দাদা সেটা কেড়ে নিয়ে একটা তাকের ওপর তুলে রেখে দিয়েছিল, অনেক কান্নাকাটি করেও সে ফেরৎ পায় নি। তারপর কাঁদতে কাঁদতে একসময় ঘুমিয়ে পড়েছিল। কিন্তু পরদিন সকালে ঘুম ভাঙতেই সে দেখেছিল সেই

পুতুলটা জড়িয়ে ধরে সে ঘুমোচ্ছে। দাদার কাছে সে শুনেছিল, ঘুম চোখে বিছানা ছেড়ে নিচে নেমে সে একটা টুল কাছে নিয়ে গিয়ে সেটার ওপর উঠে পুতুলটা নামিয়ে নিয়ে বিছানায় গিয়ে আবার শুয়ে পড়ে। কি তাজ্জব কাণ্ড!

তারপর এই পনেরোটা বছর আর কিছু ঘটে নি। বেশ ভালই কাটছিল। কিন্তু এতগুলো বছর পেরিয়ে এসে আবার সেই ছোট-বেলাকার রোগ যে মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে তা ভাবতে পারে নি।

বন্ধ দরজার গায়ে ধীরে ধীরে কে যেন টোকা দিল। একবার, দুবার, তারপর বারবার।

লতিকা জিজ্ঞাসা করল, কে?

আমি মা লতু!—বাবার কণ্ঠস্বর ভেসে এল, দরজাটা একটু খোল, মা।

দাঁড়াও খুলছি।

বিছানা ছেড়ে নিচে নামল লতিকা। কি বিশ্রী! নাইট গাউনটা বিশ্রী ভাবে ভিজে গেছে। এক রাত্রেই কি এক অঘটন ঘটে গেছে।

ড্রেসিং গাউন হাতে তুলে নিয়ে লতিকা অনুভব করল সেটা ভিজে সপসপে। কি যে এক অমঙ্গল ঘটে গেছে কাল রাতে কে জানে। মনে মনে প্রমাদ গুণলো সে।

আবার দরজায় টোকা পড়ল।

লতিকা বলল, একটু দাঁড়াও বাবা।

একটু তাড়াতাড়ি কর, মা। দরজা খোল।

খুলছি।

একটা চাদরে সারা শরীর ঢেকে নিয়ে লতিকা দরজা খুলল। খোলা দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে বাবা। পরনে ড্রেসিং গাউন। বাবার চোখে-মুখে উদ্বেগ আর অস্থিরতা।

বাবা!—অস্ফুট কণ্ঠস্বর লতিকার, কি হয়েছে, বাবা?

পুলিশ এই রিভলবারটা দিয়ে বলল—, বাবা বললেন, গত রাতে কে বা কারা যেন দিবাকরকে খুন করেছে। মৃতদেহর পাশে নাকি এটা পড়েছিল।

লতিকার মনে হল সে বুঝি এখুনি মাথা ঘুরে পড়ে যাবে। দরজার পাল্লা টেনে ধরে নিজেকে সামলে নিল। ফ্যাঁসফেঁসে গলায় সে বলল, ওটা আমার, বাবা। আমাকে দাও। আর পুলিশকে বল অপেক্ষা করতে। জামাকাপড় পাল্টে এখুনি আসছি।

বেশি দেরি করিস না।—বাবা বললেন, পুলিশ ইন্সপেক্টর বড় তাড়া দিচ্ছেন।

না, দেরি হবে না।—পিস্তলটা হাতে নিল লতিকা। তার ঠোঁটে একচিলতে হাসি খেলে গেল।

বাবা সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা রাখতেই শুনতে পেলেন আগ্নেয়াস্ত্রর গর্জন।

দ্বিতীয় ধাপে আর তিনি পা রাখতে পারলেন না। বিড়বিড় করে কি যেন বললেন। কথাগুলো এত অস্ফুট যে বোঝা গেল না।

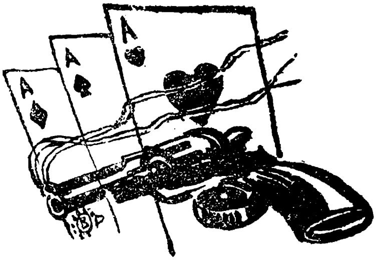

মিষ্টি বিষের স্বাদ

বসুমিত্র দত্ত

না, বৃষ্টি থামল না। থামার লক্ষণও নেই কোন। বরং বেড়েই চলেছে। কালো আকাশের বুক চিরে ধারালো বর্শার ফলকের মত বিদ্যুতের তীব্র রেখা ছোটাছুটি করছে এদিক ওদিক। হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে ঝলসে যাচ্ছে চোখ। কড়-কড়-কড়াৎ বজ্রপাতের শব্দ তালা লাগিয়ে দিচ্ছে কানে। ভাদ্র মাস। ভরা বর্ষা। এ ভরা বাদর মাহ ভাদর শূন্য অঙ্গন মোর। কোন্ মহাকবি যেন লিখে গেছেন।

সুমন্ত ভাবছিল। প্রায় এক ঘণ্টা হল মধ্য কলকাতার এই নামী সিনেমা হলটার পাশের রেস্তোরাঁয় বসে আছে সুমন্ত। কারো অপেক্ষায় নয়। বসে আছে বাধ্য হয়েই। এই অবিরাম ধারাপাত শেষ না হলে বের হবার প্রশ্নও নেই কোন। রাত দশটা। কব্জি ঘুরিয়ে ঘড়ি দেখল সুমন্ত। তৃতীয় কাপ চায়ের অর্ডার দিয়ে আট

নম্বর সিগারেটটা বের করল প্যাকেট থেকে। লাইটার জ্বেলে নিজেই মুখাগ্নি করল নিজের। আর ভাবতে লাগল কিংবা ভাবনাটা হঠাৎই মাথায় এল বলা যায়···এই সময় পাশে একজন সঙ্গিনী থাকলে মন্দ হত না।

আর আশ্চর্য, মনের কোন ইচ্ছে কেমন ভাবে হঠাৎ-হঠাৎ পূরণ হয়ে যায়, অন্তত সুমন্তর বেলায় তো হল। আকাশের একঝলক বিদ্যুৎ যেন হঠাৎই থমকে দাঁড়িয়েছে রেস্তোরাঁর দরজার সামনে। নীল বিদ্যুৎ। ম্যাচ করা নীল শাড়ি-ব্লাউজ চমৎকার মানিয়ে গেছে তন্বী শরীরে। একঢাল কালো চুলের নিচে গভীর দু'চোখের দৃষ্টি।

সুমন্ত দেখছিল কি করে মেয়েটি। এ দেখি ইতিউতি চায়। নীল ফোল্ডিং ছাতা বন্ধ করে একহাতে ধরে রেখেছে। টপটপ করে জল ঝরছে।

সুমন্ত তাকিয়ে ছিল। চোখাচোখি হতে সুন্দরী হাসল। এগিয়ে এল ওর দিকে।

বসতে পারি?

স্বচ্ছন্দে।

মেয়েটি বসল।

ততক্ষণে সুমন্তর চা এসে গেছে। ধোঁয়া উঠছে গরম চায়ের কাপ থেকে। কিন্তু তা আপাতত উপেক্ষা করে সুমন্ত তাকাল মেয়েটির দিকে। একটু ইতস্তত করে বলল, কিছু খাবেন তো, অর্ডার দি?

সুমন্তকে অবাক করে মেয়েটি বলল, সত্যি, বড্ড খিদে পেয়েছে।

ফিসফ্রাই আর ফ্রায়েড চিকেন অর্ডার দিল সুমন্ত।

মেয়েটার খাওয়া দেখে মনে হল বেশ কিছুদিন বুঝি কিছু পড়েনি পেটে। প্রায় গোগ্রাসে গিলছে বলা চলে। তবু ভাল একটা কাজ তো করা গেল। আত্মতৃপ্তির চোরা হাসি ফুটে উঠল সুমন্তর দু' ঠোঁটের ফাঁকে। খারাপ না হোক, মেয়েটা অভাবী, নিডি। এ

বিষয়ে সন্দেহ নেই কোন। হঠাৎ কেমন অদ্ভুত এক মমতায় ভিজে গেল সুমন্তর মনটা। আহা, খুব পরিশ্রম করতে হয় নিশ্চয়। সুন্দর মুখের প্রতিটি রেখায় কঠোর জীবনসংগ্রামের ছাপ। চোখের তলায় বিষণ্ণতা আর ক্লান্তির ছাপ হয়তো স্থায়ী বাসা বাঁধবে কিছুদিনের মধ্যেই।

আচমকা পার্থর কথা মনে হল সুমন্তর। পার্থ প্রায়ই সাবধান করে দেয় ওকে—সুমন্ত, তোমার মনের ওই যে কি বলে সুকুমার কোমল বৃত্তিগুলোকে ধামাচাপা না হোক, অন্তত রুমাল চাপা দিয়ে রাখার চেষ্টা করো, নাহলে বিপদে পড়বে কোনদিন। তারপর কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলে, বিশেষ করে মেয়েদের ব্যাপারে সতর্ক থেকো। সুন্দর মুখ দেখে ভুলে যেও না যেন। বুঝলে হে আইবুড়ো কার্তিক।

সত্যিই তো, মেয়েটির নামই তো জানা হল না এখনও। সুমন্ত ভাবে।

ওর মনের কথা যেন পড়ে ফেলে মেয়েটি। খাওয়া শেষ হয়ে গেছে ওর। ছোট্ট নীল রুমালে মুখ মুছে নিয়ে বলে, আমার নাম নীলা হালদার। দাদার নামটা?

সুমন্ত—সুমন্ত সেন।

দাদা বুঝি প্রফেসর? দেখে তো তাই মনে হচ্ছে।—মুখ টিপে হাসে মেয়েটি।

মিষ্টি মুখে দুষ্টু হাসি ভালই লাগে সুমন্তর। একটা কপট দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, হওয়ার ইচ্ছে তো ছিল অনেক কিছুই, কিন্তু শেষ অবধি হয়েছি সওদাগরী অফিসের কেরানী।

একটা কথা অবশ্য ইচ্ছে করেই বলে না সুমন্ত। ওর সখের গোয়েন্দাগিরির ব্যাপারটা। কয়েকটা জটিল কেসের ফয়সলা করে এর মধ্যেই বেশ নাম হয়ে গেছে ওর। পুলিশ মহলেও সুনাম ছড়িয়েছে। সাহায্যের জন্যে ডাক পড়ে মাঝে মাঝেই।

আমিও বসে নেই। খেটে খাই।

বুঝেছি।—মেয়েটির ঢাউস ভ্যানিটি ব্যাগটার দিকে চোখ ফেলে সুমন্ত, তা, কি কাজ? অফিস, আমার মত?

'না, নিজেই কিছু করার চেষ্টা করছি। একটা ছোটখাটো গ্রুপ চালাই। ইমপোর্ট-এক্সপোর্ট।

সাবাস রমণী। সুমন্ত তারিফ করে মনে মনে। জাগো নারী জাগো বহ্নিশিখা। এই বধূহত্যা, নারী নির্যাতনের যুগে বানতলা ঝাউতলার পাশবিকতার মুখোমুখি রুখে দাঁড়াও। মুখে বলে, তা হঠাৎ এইরকম সিদ্ধান্ত? বাড়িতে, মানে সংসারে···

বাধা দেয় নীলা। কেমন উত্তেজিত মনে হয় ওকে। একটু রূঢ় ভাবেই বলে, না, কেউ নেই আমার সংসারে। এই পৃথিবীতেই বলতে পারেন, একা, বড় একা আমি।

সুমন্ত ওর মুখের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে আছে দেখে বলে, সব বলব—শুনবেন? শুনতে পারবেন তো? লজ্জা করবে না?

লজ্জা! লজ্জা কেন?—সত্যিই অবাক হয় সুমন্ত।

না, মানে আপনি যে পুরুষমানুষ। স্বজাতির অপকীর্তি শুনতে ভাল লাগার কথা তো নয়।

তা হোক, তবু বলুন।—কেমন জেদ চেপে যায় সুমন্তর। বৃষ্টি কমলেও থামে নি একেবারে। দু কাপ চায়ের অর্ডার দেয় সুমন্ত।

নীলা শুরু করে ওর কাহিনী।

খুব ছোটবেলাতেই মা-বাবা দুজনকেই হারাই আমি। ভাই-বোন আর কেউ নেই আমার। মামা এসে নিয়ে গেলেন নিজের কাছে। মোটামুটি ভালই কাটছিল দিনগুলো। কিন্তু সুখ সইল না কপালে। দিন-মাস-বছরের সঙ্গে সঙ্গে আমার বয়সও বাড়তে লাগল। বুঝলেন তো, মানে আমার দেহে এল যৌবন। মামাতো দাদা অনন্ত যে কিনা এতদিন হারামজাদি মুখপুড়ি ছাড়া সম্বোধন

করত না, কথায় কথায় লাথি-চড় চালাত, সে হঠাৎ দেখি খুব সদয় হয়ে উঠল আমার ওপর। এই নীলি, এক গেলাস জল দিয়ে যা তো। নীলি, দেখ তো আমার হলদে বুসশার্টটা কোথায় রাখলাম— এইরকম নানান ছুতোনাতায় কাছে ডাকত। কাছে গেলেই হাত ধরে টানত, কোমর জড়িয়ে ধরত। কত বড় হয়ে গেছিস বলে যেন আদর করেই গাল টিপে দিত, বুকে-পিঠে হাত বোলাত। বুঝতুম সবই, তবু সহ্য করে ছিলুম। কিন্তু ধৈর্যের বাঁধ ভাঙল একদিন। আরও শুনবেন দাদা, নাকি—

সুমন্তর চোখের দিকে তাকাল নীলা।

না, না, বলুন। শুরু যখন হল, শেষটা বাকি থাকে কেন?— চায়ের কাপে ছোট্ট চুমুক দিল সুমন্ত।

তবে শুনুন। সে এক দুর্যোগের রাত আমার জীবনে। মামা-মামী বাড়ি ছিলেন না। সামাজিকতা বজায় রাখতে গেছলেন এক আত্মীয়ের বাড়ি। বলে গেছলেন রাত হবে ফিরতে। সেই সুযোগে প্রেম নিবেদন করল মামাতো দাদা অনন্ত। খুব বাধা দিয়েছিলুম আমি। বলেছিলুম, ছিঃ, ছাড়ো। তুমি না আমার দাদা? কিন্তু 'পুরুষে পাইলে নারীকে কোথায় ছাড়ে'। বিশেষ করে মানুষ যখন পশু হয়, তখন তো কথাই নেই। কিছুতেই ছাড়তে চাইল না অনন্ত। বলেছিল, দূর বোকা মেয়ে। আপন ভাই-বোন তো নয়, তবে বাধা কিসের? বলে খিকখিক করে ধূর্ত শেয়ালের মত হেসেছিল লম্পটটা। শেষ পর্যন্ত পশুটার হাত থেকে আত্ম-রক্ষার ভার নিজেকেই নিতে হল। ধারালো কাটারির এক কোপে পশুটার ডান হাতের তিনটে আঙুল পড়ল কাটা। সত্যি, বুঝলেন দাদা, সেদিন ওই অনন্তর একেবারে অন্ত করে ছাড়তুম আমি।

তারপর?—সুমন্ত শুধু এইটুকুই বলতে পারে।

তার আর পর নেই। বুঝলেন দাদা, মামী খুব কান্নাকাটি, রাগারাগি করলেন। বললেন, এই শয়তানী বাড়িতে থাকলে আমি

আর এখানে জলগ্রহণ করব না। থাকিও নি। এককাপড়ে বেরিয়ে এসেছিলুম।

থামল নীলা। বাইরে বৃষ্টি ধরে এসেছে ততক্ষণে। এবার উঠতে হয়।—নীলা বলল, ধন্যবাদ দিয়ে ছোট করব না। তবে নামটা জানা হলেও ঠিকানাটা কিন্তু এখনও অজানাই রইল।

অল্প হেসে চিরকুটে নিজের নাম-ঠিকানা লিখে দিল সুমন্ত।

বাইরে এসে সুমন্ত বলল, আমি দক্ষিণের যাত্রী। টালিগঞ্জ কুদঘাট। আপনিও ওদিকে হলে ভাল হত।

হবে কি বলছেন, হয়েছে। আমিও ওদিকের বাসিন্দা। করুণাময়ী পশ্চিম পুটিয়ারী।

কুদঘাট বাসস্ট্যাণ্ডে পৌঁছতে রাত সাড়ে এগারোটা। নীরব নিঝুম চরাচর। অন্যদিন এত রাতেও লোকজন কিছু থাকেই। কিন্তু আজ জনমানবশূন্যই বলা যায়। তারওপর লোডশেডিংয়ের অন্ধকার। একটা গা-ছমছমে পরিবেশ। কেমন অস্বস্তি লাগছিল সুমন্তর।

একটু দূরে পুলিশের জীপগাড়ি দাঁড়িয়ে। পুলিশ কেন?—নীলা অস্ফুটে বলে। সুমন্তও অবাক। ইউনিফর্ম পরা একজন এগিয়ে আসছে। বিনোদ না? হ্যাঁ, তাই তো, বিনোদ রায়। ছোকরার এলেম আছে। ওর হবে। সুমন্তকে শ্রদ্ধাও করে খুব।

কাছাকাছি আসতে সুমন্ত ডাকে, হ্যালো বিনোদ, কি ব্যাপার? আমাদের এরিয়ায় আবার কি গণ্ডগোল?

ব্যাপার গুরুতর দাদা, বলছি।—তারপর হঠাৎ নীলার দিকে চোখ পড়তে বলে, ইনি কে দাদা, বান্ধবী নাকি?

হ্যাঁ, প্রিয়বান্ধবী।—সুমন্ত মুচকি হাসে।

একটু এদিকে আসুন দাদা, বলছি সব।

দুজনে গভীর অন্ধকারের মধ্যে এগিয়ে যায়।

বিরাট একটা স্মাগলিং গ্রুপের খোঁজ পাওয়া গেছে দাদা।

কোকেন, হেরোইন থেকে আরম্ভ করে হীরে পর্যন্ত স্মাগলিংয়ের ব্যাপারে জড়িয়ে আছে এরা। আর সবচেয়ে আশ্চর্য কি জানেন দাদা, দলের লীডার একজন মহিলা। মানে রীতিমত সুন্দরী যুবতী। —একটু থেমে বিনোদ রায় হেসে বলে, অফেন্স নেবেন না দাদা, লোডশেডিংয়ের জন্যে ভাল বুঝতে পারলুম না। তবে যা বর্ণনা পেয়েছি তাতে আপনার বান্ধবীটির সঙ্গে কিন্তু মিল আছে বেশ।

সুমন্তও হাসে: তাই নাকি? তা, নাম কি মেয়েটির?

দলের লোকেরা আদর করে ফুলন দেবী বলে ডাকে। তবে শুনেছি এ লাইনে আসার আগে নাম ছিল নীলা—নীলা হালদার।

অন্ধকার থাকায় সুমন্তর ভাবান্তর চোখে পড়ে না বিনোদের। সে তখন বলে চলেছে, শুনেছি নীল রং খুব পছন্দ মেয়েটার। পোশাক থেকে শুরু করে ছাতা, রুমাল, ভ্যানিটি ব্যাগ সবই নাকি বেশির ভাগ নীল রংয়ের।

কয়েকদিন পর একটা চিঠি আসে সুমন্তর নামে। তাতে মাত্র কয়েক ছত্র লেখা: কালকের উপকার ভোলা যাবে না। সুখস্মৃতি হয়ে থাকবে। আশা করি দেখা হবে আবার।—নীলা।

সুমন্ত মনে মনে বলে, তাই যেন হয়।

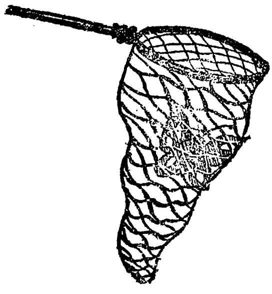

কালো সরকার

অদ্রীশ বর্ধন

নীল বৃত্ত

মশার কামড়ের সামান্য একটা দাগ বৈ তো নয়।

কিন্তু তাই থেকেই প্রাক্তন বিচারপতি সত্যেন মল্লিকের যে শেষ পর্যন্ত এমন পরিণতি হবে, তা ভাবি নি।

শুধু অভাবনীয় নয়, ভয়ঙ্করও বটে।

চোখ বুজলে এখনও দেখতে পাই বুকের ওপর ঝুলে পড়া তাঁর মাথাটা। বুদ্ধিদীপ্ত চওড়া কপাল দেখে তখনও বোঝার উপায় ছিল না যে মারা গিয়েছেন উনি। আনন্দময় কক্ষে অজ্ঞাত কারণে সে এক রহস্যময় মৃত্যু।

ডাক্তার বলেছিলেন, করোনারী অ্যাটাক।

শেষ পর্যন্ত তাই সাব্যস্ত হত, যদি না মশার কামড়ের সেই দাগটা দেখে ইন্দ্রনাথ—

কিন্তু না, মাঝপথ থেকে নয়, সে কাহিনী যখন লিখতে বসেছি, তখন গোড়া থেকেই শুরু করা যাক।

হগ সাহেবের মার্কেটে গিয়েছিলাম আমি আর কবিতা পুজোর বাজার সারতে। ভেতরে ঢোকার আগেই লিণ্ডসে স্ট্রীটের ওপর দেখা হয়ে গেল জয়ন্তর সঙ্গে।

মুখখানাকে রামগড়ুরের ছানার মত করে সাদা পোশাকে ঘুরঘুর করতে দেখেই সন্দেহ হয়েছিল আমার। পুলিশের চাকরি তো। নেহাৎ দায় না পড়লে খোলস ছাড়তে চায় না কেউ।

বলেই ফেললাম, 'শিকার আছে মনে হচ্ছে?'

দুই ভুরুর মাঝে কিলবিলে বিছুটির মত বিরক্তিটাকে সরল করে জয়ন্ত বললে, 'আরে না, না, এমনি হাওয়া খাচ্ছি।'

আর যায় কোথা। সঙ্গে সঙ্গে বাঁকা সুরে ফোড়ন কাটলে কবিতা, 'তা তো খাবেই। মেয়েদের ঘরে আনতে যারা ভয় পায়, তারাই তো প্ল্যাস্টিক সার্জারী করা পরীদের হাঁ করে দেখার জন্যে হাওয়া খেতে আসে এখানে।'

অবাক হয়ে জয়ন্ত শুধোলে, 'প্ল্যাস্টিক সার্জারী করা কেন?'

'সবে ডানা কাটা গেছে তো।'

বিরক্তির বিছুটিটাকে এক তুড়িতে উড়িয়ে দিয়ে অট্টহাস্য করে উঠল জয়ন্ত।

'বুঝলে বৌদি, অনেকটা এই কারণেই মেয়ে জাতটাকে দু'চক্ষে দেখতে পারি না আমি।'

'বটে, বটে!'

'মুখ দেখিয়ে মন ভুলোনোর জন্যে এরা মস্তিষ্কের চেয়ে মুখের কদরটাই বেশি করে। ফলে, মাথার চর্চা কমতে কমতে এমন অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে যে—'

'আজকাল বুদ্ধিমতী মেয়েরা বিয়ে করছে,আর বুদ্ধিমান ছেলেরা করছে না, এই তো?' মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললে কবিতা।

আমি বললাম, 'কি গো, তোমরা এইখানে দাঁড়িয়ে থিয়েটার করবে, না এগোবে?'

'এগোব? কোন দিকে?' শুধোয় জয়ন্ত।

'বাজারের মধ্যে।'

'পাগল! ওই ছুঁড়িদের মাঝে গিয়ে পড়লে আমার কেবলই পা হড়কে যায়। তার চাইতে বরং গ্লোবের ওই বিলিতি লাভ-পিকচারটা দেখলে কেমন হয়?'

মুখ বেঁকিয়ে কবিতা বললে, 'থাক, থাক, আর লাভ-পিকচার দেখে কাজ নেই! চল, কোথাও বসে কফি গেলা যাক।'

প্রস্তাবটা মন্দ নয়। অনেকদিন শীতাতপনিয়ন্ত্রিত রেস্তোরাঁয় বসে আড্ডা দেওয়া হয় নি। তাই বললাম, 'জাহানারাতে গেলে কেমন হয়?'

জাহানারা শহর কলকাতার আধুনিকতম সৌখীন রেস্তোরাঁ। সুতরাং কবিতা তক্ষুণি সায় দিয়ে বললে, 'ঠিক বলেছ, আড্ডা দেওয়ার উপযুক্ত জায়গাই বাতলেছো।'

জয়ন্ত কিন্তু-কিন্তু করছিল। তবে কবিতার ভ্রুকুটির সামনে সে আপত্তি ধোপে টিকল না। গল্প করতে করতে পৌঁছলাম জাহানারার সামনে।

বাদশাহী কারুকাজ করা অতীব সুন্দর তোরণের ঠিক ওপরে রঙীন নিওন সাইনে আঁকা একজন নর্তকী ঘুরে ঘুরে নেচে চলেছিল বিরামবিহীন ভাবে। একই ছন্দ, একই মুদ্রা আর একই চমকের ঘুরে ফিরে আসা দেখার জন্যে পথচারীরাও মাঝে মাঝে থমকে দাঁড়িয়ে গিয়ে হাঁ করে তাকাচ্ছিল ওপর পানে।

তোরণ পেরিয়ে ছোট একটা কক্ষ। সে ঘরের দেওয়াল আর ছাদ বিলিতি আয়নায় মোড়া। আমীরী পোশাক পরা একজন পুরুষ আদাব করে রুপোর আতরদানী তুলে ধরে সুগন্ধি ছিটিয়ে দিলে অঙ্গে। ভুরভুরে খোশবাইয়ে মেজাজটা শরীফ হয়ে যেতেই কাচের জাফরীকাটা দরজা খুলে গেল। চোখের সামনে ভেসে উঠল যে দৃশ্য, তার সঙ্গে কল্পনার বেহেস্তেরই খানিকটা তুলনা চলে।

সে এক ইলাহী কাণ্ড। মস্ত ঘর। অনেক উঁচু। ছাদ থেকে ঝুলছে বিচিত্র ঝাড়—কিন্তু তা শুধু শোভার জন্যে। গোপন উৎস থেকে আসা আলোর স্রোতে ঝলমল করছে গোটা ঘরটা। চার-পাশের দেওয়ালে বিরাট বিরাট তসবির। কোথাও জাজিমের ওপর বসেছে গুলজার আমদরবার, কোথাও জাঁহাপনার সামনে বান্দীরা নেচে নেচে বিতরণ করছে সিরাজীর পেয়ালা। ছড়িয়ে দিচ্ছে গুলাবজল।

আর প্রতিটি টেবিলেই দেখলাম গুলতানি চলেছে। সামনেই ঘাড়ের ওপর চর্বির ভাঁজওলা একটি মাড়োয়ারী একজন সুবেশা সুকেশী সুনয়না তন্বীর সঙ্গে হেসে হেসে সোনার দাঁত বার করে খোশগল্প জুড়েছে। অদূরে, সমস্ত ব্যবধান ঘুচিয়ে, একান্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে ফিসফিস করছে একটি অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান যুগল। ঘরের এক প্রান্তে একটু নিচু মঞ্চে জাজিমের ওপর বসেছে বাজনদারদের সভা। এস্রাজ, সেতার, সারেঙ্গী, পাখোয়াজ, বাঁশি থেকে শুরু করে প্রায় সবই আছে। ঐকতানের সঙ্গে তাল মিলিয়ে পাশেই একটু বড় মঞ্চের ওপর নেচে চলেছে ঘাঘরাপরা একটি সুন্দরী মেয়ে। আই-

ভরির মত গালে আকাশের তারার মত অজস্র চুমকি চমকে চমকে উঠছে মোমের মত মোহময় নরম আলোয় সাপের মত বেণীটি দুলে দুলে উঠে বেঁধে ফেলতে চাইছে পীনোন্নত তন্বী দেহকে। অপরূপ সুন্দর মুখটি মায়াময় হয়ে উঠেছে কালো রঙের একটা ফিনফিনে দোপাট্টার বেষ্টনে।

বাজনদারদের প্রায় সামনে বসেও যৌবনোচ্ছল নাচের দিকে মনোযোগ ছিল যাঁর, তাঁর দিকে চোখ পড়তেই অবাক হয়ে গেলাম আমি। মানুষটি মাথায় খুবই খাটো। বাজনদারদের দিকে পেছন ফিরে বসেছিলেন উনি। পরণে অত্যন্ত সাদাসিধে ধুতি আর পাঞ্জাবি। চোখা শেল ফ্রেমের চশমা। দু'চোখের প্রখর ব্যক্তিত্ব তাতে ঢাকা পড়ে নি—তীব্র সে চাহনি যার ওপর গিয়ে পড়ে, চকিতে সে বুঝে নেয়, কি পরিমাণ কঠোর এই তাপসিক পুরুষটির চরিত্র।

ইনিই ভারতবিখ্যাত বিচারপতি সত্যেন মল্লিক। বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত। আগে থেকেই এই বিরাট পুরুষটি সম্বন্ধে অনেক খবরাখবর রাখতাম বলেই অত অবাক হয়ে গেছলাম আমি।

স্টুয়ার্ড নির্দেশিত টেবিলের দিকে যেতে যেতে জয়ন্তকে বললাম, 'কি ব্যাপার বল তো, সত্যেন মল্লিক এখানে আড্ডা মারছেন কেন?'

'সত্যেন মল্লিক! তাই তো, এ সময়ে ইনি এখানে?'

সবুজ মখমল মোড়া গদিতে বসতে বসতে বিরক্ত স্বরে কবিতা বলল, কি মুস্কিল, তোমরা ছাড়া কি আর কেউ আসতে পারে না এখানে?'

'তা নয় কবি, সত্যেন মল্লিকের মত মানুষকে এখানে দেখেই আশ্চর্য হচ্ছি আমরা। ওঁর সময়ের দাম তো বড় কম নয়। প্রধানমন্ত্রী কলকাতায় এলে তাঁর সঙ্গে দেখা না করে যান না, তিনি এখানে আসবেন কেন?'

জয়ন্ত বললে, 'তাছাড়া জানো তো, বিচারপতিদের থাকতে হয়

উনবিংশ শতাব্দীর বিধবাদের মত। সংসার থেকে দূরে নিরাসক্ত জীবন যাপন করতে হয় তাঁদের। তাই—'

সঙ্গে সঙ্গে কবিতা জবাব দিলে, 'ভুলে যেও না, উনি এখন অবসরপ্রাপ্ত। যাকগে ওসব ছাইয়ের কথা, কি গিলবে বল।'

উদ্ভট নামওলা কতকগুলো খাদ্যবস্তুর অর্ডার দেওয়ার পর আবার চোখ তুললাম।

সত্যেন মল্লিক একা নন। আর একজন ভদ্রলোক ওঁর সামনে বসে। আমাদের দিকে পেছন ফিরে থাকলেও সাজপোশাক দেখে বোঝা যায়, ভদ্রলোক এদেশী নন। সম্ভবত বোম্বাইওলা পার্শি। ঘাড়ের আর গালের রঙ হাতির দাঁতের মত ধবধবে সাদা। চুলে পাক ধরেছে। বসার ভঙ্গিমাটা অনেকটা অষ্টাবক্র মুনির মত।

নিশ্চয়ই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা চলছিল দুজনের মধ্যে। কাউকেই ক্ষণেকের জন্যেও মুখ তুলে এদিক-ওদিক তাকাতে দেখলাম না।

জয়ন্ত বললে, 'বৌদি, ঈদের চাঁদ দেখেছ?'

'সে আবার কি?'

'বাঞ্ছিত হলেও সহজে যা দেখা যায় না, তাই হল ঈদের চাঁদ। এক কথায় সত্যেন মল্লিককেও ঈদের চাঁদ বলা চলে।'

ভ্রূকুটি করে কবিতা বললে, 'পরচর্চা না করে দয়া করে বলবে কি, নিউ মার্কেটের সামনে এরকম সন্দেহজনক ভাবে ঘোরাফেরা করছিলে কেন?'

গম্ভীর মুখে জয়ন্ত বললে, 'সেটা একান্ত গোপনীয়—বিশেষ করে মেয়েদের কাছে।'

রুখে উঠল কবিতা, 'রাখো তোমার গোপনীয়তা। আসলে কোথাও মজেছো।'

'আরে, আরে, তা নয়, তা নয়—

'তা নয় তো এত লুকোছাপা কিসের শুনি?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে জয়ন্ত বললে, 'বৌদি, কালো টাকা বাড়তে বাড়তে আজ এমন অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে যে সরকার শুদ্ধ ঠুঁটো জগন্নাথের মত দাঁড়িয়ে দেখছে। হু হু করে জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে, কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ সৃষ্টির চেষ্টা চলছে, কিন্তু কালো টাকার মালিক কালো-বাজারীদের শায়েস্তা করার কোন পথই খুঁজে পাচ্ছে না। সম্প্রতি দিল্লী থেকে কড়া হুকুম এসেছে, অভিযান শুরু হয়েছে এদের বিরুদ্ধে ঠগীদমনের মতই গুরুত্বপূর্ণ এই অভিযান।'

কবিতা বাঙালী ললনা হলেও শিক্ষাদীক্ষা তার বোম্বাইতে। সিনেমা-পত্রিকাই তার একমাত্র পাঠ্যবস্তু নয়। রাজনীতি এবং অর্থনীতি সে বোঝে—তা নিয়ে আলোচনাও করে। কাজেই জয়ন্তর কথায় সায় দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ও বললে, 'তা যা বলেছ ঠাকুরপো! গলায় ফাঁস দিয়ে নিরীহ পথিকদের অতর্কিতে খুন করত ঠগীরা। আর, এই মানুষ-পিশাচগুলো পরম বন্ধু সেজে অক্টোপাশের মত হাজার হাজার 'সাকার' দিয়ে শোষণ করে চলেছে আমাদের। কিন্তু তোমাদের পুলিশ বিভাগেও তো দুর্নীতি ঢুকেছে।'

আর যায় কোথা! উরুর ওপর প্রচণ্ড চাপড় মেরে স্থানকাল ভুলে জয়ন্ত চেঁচিয়ে উঠল, 'কে বলেছে একথা!'

ব্যস, শুরু হয়ে গেল গরম বিতর্ক। কথা-কাটাকাটির তোড়ে বিচিত্র নামের খাবারগুলো কখন যে গলাধঃকরণ করে ফেলেছি, সে খেয়ালই ছিল না। কফির পেয়ালায় চুমুক দিয়ে মুখ তুলতেই কবিতার কাঁধের ওপর দিয়ে নজর পড়ল ওদিকে।

একা বসেছিলেন সত্যেন মল্লিক। অষ্টাবক্র মুনি কোন ফাঁকে উধাও হয়েছেন। চেয়ারের পেছনে পিঠ ছেড়ে দিয়ে অলস ভঙ্গিমায় বসেছিলেন সত্যেনবাবু। দাঁতের ফাঁকে একটা পাইপ, খুব সম্ভব ওক-কাঠের। চিমনির মত ধোঁয়া উঠছিল পাইপের সুড়ঙ্গ থেকে।

অষ্টাবক্র মূর্তি বাথরুমে গেছেন নিশ্চয়।

কয়েক মিনিট বাদে আবার সেদিকে চোখ পড়তেই দেখি তখনও

একা বসে সত্যেন মল্লিক। অষ্টাবক্র-মূর্তি কি তাহলে ওঁকে ফেলে রেখেই চলে গেলেন? না, আর কারও প্রতীক্ষায় বসে রয়েছেন সত্যেনবাবু?

ব্যাপারটা বেশ রহস্যময় মনে হল। প্রথমত, কি এক অজ্ঞাত কারণে তাঁর মত খ্যাতিমান পুরুষ নিজের চেম্বার ছেড়ে এসেছেন পাঁচজনের এই হট্টগোলের হাটে। দ্বিতীয়ত, পার্শি ভদ্রলোকের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ কোন আলোচনার পরেও নিশ্চয় বসে রয়েছেন কারো প্রতীক্ষায়।

জয়ন্তরও চোখ এড়ায় নি সত্যেন মল্লিকের একলা বসে থাকাটা। হাজার হোক, পুলিশের মন তো, সরল চোখে কোন কিছুই দেখে না।

ঘটনাটা ঘটল ঠিক তখনি।

আচমকা ঘাড়ে চাপড় মারলেন সত্যেন মল্লিক।

নিশ্চয় মশার কামড়।

সেকেণ্ড কয়েক ঘাড়টা চুলকোলেন। তারপর আবার আড় হয়ে ধূমপানে মন দিলেন।

কবিতা বললে, 'পুলিশের পরিবারে কেন এত অশান্তি, আর কেনই বা তুমি এখনও আইবুড়ো, তা এতক্ষণে বুঝলাম ঠাকুরপো।'

'কেন?'

'দুনিয়ার সব রঙ-রূপ-রসের মধ্যে তোমরা ক্রাইমের গন্ধ পাও, আনন্দ নেই, শান্তি নেই তোমাদের ঘরে।'

'বড্ড পার্সোনাল অ্যাটাক হয়ে যাচ্ছে না?'

'মোটেই না। এসেছ কফি খেতে, তা নয়, তখন থেকে ড্যাব-ড্যাব করে তাকিয়ে আছো ভদ্রলোকের দিকে।'

আচম্বিতে জয়ন্তর হাত এসে পড়ল আমার হাতের ওপর।

'দেখেছ?'

অস্বাভাবিক ভাবে মাথা দোলাচ্ছেন সত্যেন মল্লিক। ঘুমের

ঘোরে থুতনি যেমন বুকে এসে ঠেকে, ঠিক তেমনি ভাবে ওঁর মাথাটা ঝুলে পড়তে চাইছে বারবার, কিন্তু জোর করে মাথা তুলে ধরছেন উনি। বারতিনেক এইভাবে মাথা ঝাঁকানি দিলেন সত্যেনবাবু, তারপরই দাঁতের ফাঁক থেকে পাইপটা খসে পড়ে গেল গালিচার ওপর—বুকের ওপর ঝুলে পড়ল অবশ মাথাটা। আর নড়লেন না।

এক মিনিট…দু মিনিট…তিন মিনিট…দশ মিনিট কেটে গেল অসহ্য প্রতীক্ষার মধ্যে দিয়ে…

কিন্তু নিস্পন্দ হয়ে রইল সত্যেন মল্লিকের দেহ…

নিথর হয়ে রইল বুকের খাঁচা…

জয়ন্ত আমার দিকে তাকালে, কি করবে?'

'ম্যানেজারকে ডাকো।' বললাম আমি।

ম্যানেজার এলেন। ভিড় ঠেলে একজন ডাক্তারও এলেন। পরীক্ষা করে যা বললেন, তা আমরা আগেই অনুমান করেছিলাম। কি এক রহস্যময় কারণে আমাদের চোখের সামনেই নাচ-গান ভরা এই পরিবেশে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন ভারতবিখ্যাত বিচারপতি সত্যেন মল্লিক।

জয়ন্ত নিজের পরিচয় দিয়ে পুলিশে ফোন করে দিলে তক্ষুণি।

আমি আর কবিতা দাঁড়িয়েছিলাম ভিড়ের মধ্যে। অপলক চোখে বিরাট পুরুষটির ক্ষুদ্র গতায়ু দেহটির দিকে তাকিয়ে ভাবছিলাম, মানুষের জীবন কত সংক্ষিপ্ত, আর মৃত্যু কি আকস্মিক। এক ফুঁয়ে মোমবাতির শিখা নিভে যাওয়ার মতই মিলিয়ে গেল ওঁর জীবনদীপ। কিছুই করতে পারলাম না আমরা। অথচ এই ক্ষণিক জীবনের জন্যেই এত হানাহানি, এত উদ্বেগ, এত—

শ্মশানবৈরাগ্য আচমকা টুকরো টুকরো হয়ে গেল কবিতার ফিসফিসানিতে।

'শুনছো?'

'কি?'

'ঘাড়ের কাছটা লক্ষ্য কর।'

করলাম। পরক্ষণেই নিঃসীম কৌতূহলে সূচ্যগ্র হয়ে এল দৃষ্টি। সত্যেন মল্লিকের ঘাড়ে, পাঞ্জাবির ঠিক ওপরে অদ্ভুত একটা নীল বৃত্ত। বৃত্তের ঠিক মাঝখানে মশার কামড়ে খানিকটা ফুলে উঠেছে।

মশার কামড়ের চারধারে নীলবৃত্ত। এ কোন জাতীয় মশা?

মশার কামড়ে মানুষ মরে না

প্রতিদিন ভোরে ঘুমজড়ানো চোখ মুদে চুড়ির রিনিঝিনি রাগিনী শোনার আমেজ ভাঙে অর্ধাঙ্গিনীরই মিঠেকড়া ধমকে, 'বেলা হল, কুঁড়ের বাদশা, উঠবে কখন?'

অতি কষ্টে চোখ খুলে প্রতিদিনই শয্যার পাশে টিপয়ের ওপর দেখি ধূমায়িত চায়ের কাপের পাশে ভাঁজ করা খবরের কাগজ।

কিন্তু ব্যতিক্রম ঘটল সেদিন ভোরে। চায়ের কাপ যথাস্থানেই শোভা পাচ্ছিল, উধাও হয়েছিল খবরের কাগজটা।

পুরো চোখ খুলতেই দেখি, জানলার সামনে পিঠে ভিজে চুলের রাশ এলিয়ে কাগজ মেলে ধরেছে স্বয়ং গৃহিনী।

খুব জোরে কেশে উঠে বলেই ফেললাম, 'আহা, খবরের কাগজের আজ কি সৌভাগ্য।'

বলেই বুঝলাম, বেফাঁস কথা বলে ফেলেছি। এই সকাল বেলা দাবানল এবার জ্বলল বলে।

কিন্তু আজ হল কি? বোঁ করে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে উঠল কবিতা, 'ওগো শুনছো!'

ভড়কে গিয়ে বললাম, 'কি হল?'

'র হ স্য জ ন ক মৃত্যু—সত্যেন মল্লিকের!'

উঠে বসেছিলাম। আবার শুয়ে পড়ে ছোট্ট করে বললাম, 'সে

তো গত রাতেই দেখেছি।'

'কিন্তু তুমি কি এখনও শুয়ে থাকবে?'

'তাছাড়া আর করবই বা কি? আমি কি—'

'তুমি যে কিচ্ছু না, তা বিয়ের পর থেকেই হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। ও নিয়ে আর ড্রামবিটিং নাই বা করলে।'

একটা চোখ কুঁচকে বললাম, 'বটে বটে বটে। বিবাহ-পুরাণের প্রথম অধ্যায় তাহলে প্রায় হজম করে বসে আছো দেখছি।'

'থাক, যথেষ্ট হয়েছে, গতর তুলে দয়া করে ইন্দ্র-ঠাকুরপোকে ফোন কর।'

'কিন্তু সে এ কেস নিয়ে মাথা ঘামাবে কেন? এ তো জয়ন্তর—'

'ঘটের বুদ্ধিটুকু এ ব্যাপারে খরচ না করলেও চলবে বুদ্ধির বেস্পতি। আমি শুধু জানতে চাই, মশার কামড়ে মানুষ মরে কি না।'

আর কিছু বলার দরকার হল না। হাত বাড়িয়ে রিসিভার তুলে নিয়ে ডায়াল করলাম তক্ষুণি। আমার গলা পেয়েই সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল ইন্দ্রনাথ, 'জয় রাম, কল্কি এসে গেছেন।'

'সেটা কি?' সত্যি সত্যি ঘাবড়ে যাই আমি।

'আজকের কাগজের কার্টুনটা দেখ নি বুঝি? দুই পাখাওলা সাদা ঘোড়ায় চড়ে এসেছেন কল্কি—দশম অবতার। এক হাতে আইনের কেতাব, আর অন্য হাতে হাতকড়া নিয়ে ধূমকেতুর মত এসেছেন তিনি। কালোবাজারীদের নির্মূল করে অশ্বমেধ যজ্ঞ করে তিনিই দক্ষিণাস্বরূপ সসাগরা পৃথিবী ব্রাহ্মণদের দান করবেন।'

হুঙ্কার দিয়ে উঠলাম, 'ইন্দ্রনাথ, কার্টুন নিয়ে ফক্কুড়ি করার জন্যে এত ভোরে তোমাকে ফোন করি নি আমি। রহস্যজনক মৃত্যুর খবরটা দেখা হয়েছে কি?'

'কে, সত্যেন মল্লিক? কিন্তু তার চাইতেও চমকপ্রদ এই

কার্টুনটা। কল্কির মুখখানা অবিকল একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর মত দেখতে। কি কাণ্ড!'

'ইন্দ্রনাথ, দোহাই তোমার। সত্যেন মল্লিকের মৃত্যু নিশ্চয় স্বাভাবিক নয়।'

'প্রত্যেক মানুষের মৃত্যুই অস্বাভাবিক। তার চাইতেও অস্বাভাবিক হল এই কার্টুনটা। এটার—।

'মশার কামড়ে কি মানুষ মরে?'

কিছুক্ষণ সব চুপ।

তারপর?

'মশার কামড়ে মানুষ মরে না! জাহানারাতে আজকাল খুনে মশারা বিচরণ করছে জানতাম না। কৃপা-পরবশ হয়ে আরও একটু খোলসা করবে কি?'

সব বললাম। বললাম, মশার কামড়ের চারধারে নীলচে বৃত্তের বৃত্তান্ত।

শুনে ইন্দ্রনাথ শুধু বললে, 'আমি আসছি, তোমরা বেরিও না।'

ঘণ্টাখানেক বাদেই এল ইন্দ্রনাথ। একহাতে একটা চ্যাঙারি, আর পেছনে জয়ন্ত।

কবিতা শুধোলে, 'এসব কি?'

ইন্দ্রনাথ বললে, 'মোড়ের রামপদ মোদকের দোকানে গরম গরম কচুরি আর জিলিপি ভাজছিল। সকালবেলা একসঙ্গে এই দুটি জিনিস যে কতদিন খাই নি! সকালবেলা কেই বা আর এনে দেয় বল। তাই দেখামাত্রই দু' টাকার কিনে ফেললাম। ওরা বললে, হিঙের কচুরি নাকি—'

গালের মধ্যে গোল করে জিবটা ঘুরিয়ে নিয়ে হাসি চেপে কবিতা শুধোলে, 'আর কি চাই? চা, না কফি?'

'কফি।'

বলেই, আমার দিকে ফিরে শুরু করে দিলে ইন্দ্রনাথ, 'মশা কামড়ালে মানুষ মরে না, কিন্তু সত্যেন মল্লিক কেন মারা গেলেন ?'

জয়ন্ত ব্যাজার মুখে বললে, 'ধুত্তোর, কান ঝালাপালা হয়ে গেল মশার কেচ্ছা শুনতে শুনতে। মশা, মশা আর মশা! মশার কামড়ে উনি মারা যাবেন কেন ? ডাক্তার বলেছে করোনারী অ্যাটাক। পোস্টমর্টেম না হলে সঠিক কিছু বলা মুস্কিল।'

আমি বললাম, 'কিন্তু নীল সার্কেলের মাঝে ফুটোটা—'

হাঙরের মত মুখব্যাদন করে হাই তুলে জয়ন্ত বললে, 'মশা ছাড়াও তো অন্য পোকামাকড়ের কামড়ে অমন দাগ হতে পারে।'

'কি সেই পোকামাকড় ?'

'আমি তা কি করে বলব ? সেজন্য তোমার মত ডিটেকটিভ নভেল লিখিয়েরাই তো রয়েছে ?'

ইন্দ্রনাথ বলে উঠল, 'আহা-হা, প্রথম থেকেই তোমরা যদি এভাবে ঝগড়া শুরু করে দাও, তাহলে আসল সমস্যার মীমাংসা তো কোনদিনই হবে না। তবে সত্যি কথা বলতে কি জয়ন্ত, ওই নীল দাগটা নিয়ে আমার মনেও খটকা লেগেছে।'

প্রতিবাদে হয়তো জয়ন্ত এবার কড়িকাঠ কাঁপিয়েই চিৎকার করে উঠত, কিন্তু সে সুযোগ না দিয়েই ইন্দ্রনাথ বললে, 'এয়ার-কণ্ডিশণ্ড ঘরে কখনো পোকামাকড় মাছি-মশার উপদ্রব হতে দেখেছ ?'

সত্যিই তো, শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ঘরে তো কখনো এসব উৎপাত দেখি নি। বললাম, মশা না হলেও, ভীমরুল জাতীয় কোন বিষাক্ত পোকার কামড়ও তো হতে পারে!'

'তাহলে তো এখন কীটবিজ্ঞান নিয়ে বসতে হয়।' বললে ইন্দ্রনাথ।

'দরকার হলে তা বসতে হবে বৈকি।' খাপ্পা হয়ে বলি আমি।

'নিশ্চয়, নিশ্চয়, তা বসব বৈকি। তার আগে জয়ন্ত যদি আমাকে জাহানারাতে একবার ঘুরিয়ে আনতে পারত, তাহলে

আরো ভাল হত।'

'জাহানারা কেন? বিশেষ জাতের ভীমরুলটাকে আবিষ্কার করতে?' মন্তব্যটি জয়ন্তর।

পিত্তিশুদ্ধ জ্বলে উঠল আমার। খেঁকিয়ে উঠতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু মাঝখান থেকে ইন্দ্রনাথ বলে উঠল, 'রবার্ট ব্লেকের ভাষায় অকুস্থল পরিদর্শন করতে।'

'এখন সেখানে অশ্বডিম্ব ছাড়া আর কিছু নেই।'

চটে উঠে ইন্দ্রনাথ বললে, 'জীবনে তুমি শার্লক হোমস হতে পারবে না। আগে থেকেই যারা থিওরিকে অকাট্য বলে মনে করে, তারা কস্মিন কালেও গোয়েন্দা হওয়ার উপযুক্ত নয়।'

'নাটক-নভেলের অমন ম্যাজিক জানা টিকটিকিও হতে চাই না আমি। বাস্তব নিয়ে আমাদের কারবার। সত্যেন মল্লিক মারা যাওয়ার সময়ে গমগম করছিল অত বড় রেস্তোরাঁটা—আর এখন তা একদম ফাঁকা। তোমার কি মনে হয়, দেওয়ালে আঁকা তসবিরের রক্তচক্ষু দেখে হার্টফেল করেছেন সত্যেন মল্লিক?'

অসহিষ্ণু স্বরে ইন্দ্রনাথ বললে, 'তোমার সঙ্গে বাজে ডিবেট করতে চাই না আমি। মৃগাঙ্কর মুখে যা শুনলাম তাতে মনে হয়, এ মৃত্যু স্বাভাবিক নয়। সেইজন্যে, আর সত্যেন মল্লিকের মত দেশবরেণ্য ব্যক্তির মৃত্যু-রহস্যের সমাধান করার জন্যে বিনা স্বার্থে আমি এ ব্যাপারে নাক গলাতে চাই। তাই, নিরিবিলিতে জাহানারা রেস্তোরাঁয় আমি এখন দেখব কি অবস্থায় মারা গেছেন উনি। ইচ্ছে হলে আসতে পারো, নয়তো আমি একলাই চললাম।' বলে উঠে দাঁড়ালে ইন্দ্রনাথ।

বন্ধুবর ক্ষেপলে আর রক্ষে নেই। কাজেই নরম হয়ে জয়ন্ত বললে, 'যো হুকুম, আমি যাব। তবে কফির ফরমাস দিয়ে এখন কেটে পড়লে মৃগাঙ্কর বেটার-হাফ আমাদের আর মুখদর্শন করবে না।

অগত্যা আবার বসে পড়ল ইন্দ্রনাথ।

সকাল দশটার সময় জাহানারায় পৌঁছলাম তিন বন্ধু। ম্যানেজার হাজির ছিলেন তদারকির জন্যে। জয়ন্তকে দেখে তক্ষুণি বিনয়ে গলে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে অর্ডার দিলেন এসপ্রেসো কফির।

দর্শক হওয়া ছাড়া আমার কিছু করণীয় ছিল না। জয়ন্তও দেখলাম 'পড়েছি মোগলের হাতে' গোছের ভাব নিয়ে ঘুরঘুর করছে ইন্দ্রনাথের সঙ্গে। যে চেয়ারে বসেছিলেন সত্যেন মল্লিক, সেই চেয়ারেই অনেকক্ষণ বসে রইল ইন্দ্রনাথ। মৃত্যু কোন কোন পথে আসতে পারে, সেই চিন্তা নিয়েই সম্ভবত তন্ময় হয়েছিল ও। কিছুক্ষণ বাদে আনমনে তাকালে কড়িকাঠের পানে, শূন্য দৃষ্টি মেলে রইল চেয়ারগুলোর ওপর। অন্ধকার মুখ দেখে মনে হল, অনেক আশা নিয়ে এসে বেজায় নিরাশ হয়েছে বেচারা।

তারপর, উঠে এসে বসল সামনের চেয়ারে—যে চেয়ারে বসেছিল পার্শি ভদ্রলোকটি। সামনেই মঞ্চের নিচু অংশ—বাজিয়েরা বসে সেখানে। পাশেই মূল মঞ্চ—নর্তকীর হাস্যে লাস্যে কটাক্ষে যা অপরূপ হয়ে ওঠে সন্ধ্যা আসার সঙ্গে সঙ্গে।

অপলক চোখে অনেকক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে রইল ইন্দ্রনাথ।

মনে হল যেন ধ্যান করছে—চোখ খুলে। দেওয়াল ফুঁড়ে দৃষ্টি চলে গেছে কোন্ সুদূরে। ভাবসমাহিত এই দৃষ্টি দেখে কে বলবে ইন্দ্রনাথ ডিটেকটিভ—গোয়েন্দাগিরিই তার পেশা। বলবে, সে কবি—কবিতাই জীবন। সে শিল্পী—শিল্পই তার স্বপ্ন। কিন্তু আমি তো তাকে চিনি। তাই বুঝলাম, ইন্দ্রনাথ স্বপ্নালু চোখে কবিতার ছন্দ খুঁজছে না। মন তার হাতড়ে মরছে এক দুর্বোধ্য হেঁয়ালীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে। অত্যন্ত কঠিন অঙ্কের খেই হারিয়ে ফেললে মানুষ যেমন দিশেহারা হয়ে যায়, উদাস দৃষ্টির অন্তরালে ওর চোখে রয়েছে এখন সেই ছবিই।

পলকহীন চোখে আমিও তাই তাকিয়ে ছিলাম ওর মুখপানে। এ সময়ে হাস্যময়, কৌতুকপ্রিয় ইন্দ্রনাথ বড় রহস্যময়, বড় অস্পষ্ট হয়ে ওঠে—নাগাল পাওয়া যায় না মনের। তাই অপলক চোখে লক্ষ্য করছিলাম কোন্ কোন্ ভাবের লেখা পাওয়া যায় ওর মুখে।

সেই কারণেই হঠাৎ ওর চমকে ওঠাটা নজর এড়াল না আমার। যেন আচমকা ভূত দেখে চমকে উঠল ও। কিন্তু তা পলকের জন্যে। পর মুহূর্তেই ধীরে ধীরে আলোকিত হয়ে উঠল ওর মুখ। মৃদু হাসি ফুটে উঠল ঠোঁটের কোণে। মাথা নেড়ে আপন মনেই সায় দিলে নিজের মনকে।

বললাম, 'কি হে রবার্ট ব্লেক, কেল্লা মেরে দিয়েছ মনে হচ্ছে?'

আর একবার ভয়ানক চমকে উঠল ইন্দ্রনাথ।

পরক্ষণেই আত্মস্থ হয়ে বললে, 'না, তা নয়। ভাবছিলাম সামনের ওই চেয়ারটায় বসে কতরকম ভাবে মরতে পারি আমি।'

'ভাবনার রেজাল্টটা কি?'

সবশুদ্ধ তিনরকম ভাবে মরা যায়। অবশ্য সবটাই কল্পনা। জয়ন্তর ভাষায়, স্রেফ গাঁজায় দম। কাজেই তা নিয়ে আমি মনগড়া গল্প ফাঁদতে চাই না। তবে…এই যে, ম্যানেজার সাহেব যে—'

অত্যন্ত মূল্যবান এক প্যাকেট সিগারেট সামনে ধরে বদনপটে বিগলিত হাসি ফুটিয়ে তুলে সামনে এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন ইয়া লম্বা পাঠান ম্যানেজার।

কোনরকম সৌজন্যের ধার দিয়ে না গিয়ে একটা সিগারেট টেনে নিয়ে পাশের চেয়ারে খাতির করে ম্যানেজারকে বসালো ইন্দ্রনাথ। শুরু হল খোশগল্প।

নাচ গানের প্রতি ইন্দ্রনাথের যে এত অনুরাগ আছে তা এই প্রথম জানলাম। লক্ষ্ণৌতে এক নর্তকীর পায়ের বোল দেখে ইন্দ্রনাথ যেরকম মোহিত হয়েছিল, সেরকম আর কখনও হতে পারে নি জেনে আমি অবাক হলাম।

পাঠান ম্যানেজার উত্তেজিত হয়ে তক্ষুণি ওকে আমন্ত্রণ জানিয়ে বসলেন সেদিন সন্ধ্যায়। বেনারসের এক খ্যাতনামা নর্তকীর প্রোগ্রাম আছে সেদিন। আর বাজনদার? তারা রেস্তোরাঁর মাইনে করা বাঁধা বাজনদার হলেও অনেক খানদানী শিল্পীকেও টেক্কা মারতে পারে।

পাথরের মত চ্যাটালো বুক ঠুকে ম্যানেজার জানালেন, এ নাকি ফাঁকা বড়াই নয়। আজ সন্ধ্যায় আমরা এসে পরখ করে যেতে পারি।

বসবার ভাল জায়গা? কুছ পরোয়া নেহি। ওই টেবিল-চেয়ার-গুলোই রিজার্ভড রইল আমাদের জন্যে।

সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গেল ইন্দ্রনাথ।

বন্ধুদের নাড়ী চিনতে তো আর বাকি নেই আমার। কাজেই ইন্দ্রনাথের আদেখলাপনা দেখে যে জয়ন্ত রেগে টং হয়েছে, তা ওর থমথমে মুখ দেখেই অনুমান করে নিলাম আমি।

বাইরে পা দিয়েই বোমার মত ফেটে পড়ল জয়ন্ত, 'তুমি যে এত ফিচেল, জানতাম না। প্রেসটিজ-ফ্রেসটিজ গোল্লায় দিয়ে বিনি পয়সায় খ্যাঁট আর নাচ-গানের মজা লোটবার মতলবই যদি ছিল তো আগে বললেই পারতে?'

কাঁচুমাচু মুখে ইন্দ্রনাথ বললে, 'সত্যিই ভারি অন্যায় হয়ে গেছে। কিন্তু মশাটাকে যদি এই ফাঁকে দেখতে পাই, তাই লোভ সামলাতে পারলাম না।'

ঠাট্টার ছলে কথাগুলো বললেও গুরুত্বটুকু উপলব্ধি করলাম সেই রাতেই। শত মহফিলের রোশনাই ঝলমল জাহানারার কক্ষে নৃত্যের তালে তালে উন্মোচিত হল রহস্যকুহেলীর তিমির অবগুণ্ঠন। এখনও সেকথা ভাবলে অবাক হয়ে যাই যে, যা আমাদের সামনেই ছিল, তা আমরা দেখেও দেখি নি। অথচ—

যেমনটি ঘটেছিল, ঠিক সেইভাবেই বলা যাক কাহিনীটা।

একটি টিনের বাঁশি

হরদম শুনি, বাঙালীদের মধ্যে নাকি চ্যাটার্জি আছে, ব্যানার্জি আছে, মুখার্জি আছে, কিন্তু এনার্জি নেই। কিন্তু সেদিন সন্ধ্যায় জাহানারায় আসার জন্যে ইন্দ্রনাথের তোড়জোড়ের বহর দেখে বাঙালীদের সম্বন্ধে এহেন ধারণার কিছু রদবদল করার দরকার হয়ে পড়ল।

কবিতা আসতে চেয়েছিল। কিন্তু বেঁকে বসল ইন্দ্রনাথ। আমাকে আর জয়ন্তকে টানতে টানতে যথাসময়ে হাজির হল রিজার্ভ করা টেবিলে।

বেলোয়াড়ী ঝাড়ের নিচে ধীরে ধীরে জমজমাট হয়ে উঠছিল আসর। মূল মঞ্চে গজল গাইছিল একটি মেয়ে। জাফরানি রঙের ওড়নায় মুখের একপাশ ঢাকা। মুখ নাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঝিলমিল ঝিলমিল করে উঠছিল নাকের কমলহীরের নাকছাবিটি। ওদিকে মার্বেল পাথরের জাফরির অন্তরালে চটুল হাস্য-পরিহাসে মত্ত ছিল কয়েকজন তয়ফা—কাচের বাসন ভেঙে যাওয়ার মত হাসির চমক ভেসে আসছিল এদিকেও।

গতরাতে যে চেয়ারে বসে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন সত্যেন মল্লিক সেই চেয়ারেই বসেছিল জয়ন্ত। বড় অস্বস্তিবোধ করছিল বেচারি। হয় মশা, না হয় বিষাক্ত পোকা—খুব সম্ভব দুটোর একটার ভয় পেয়ে বসেছিল ওকে। বিপরীত চেয়ার দখল করেছিল ইন্দ্রনাথ, পাশে আমি।

পাঠান ম্যানেজারের খাতিরের ঠেলায় প্রাণ তখন ওষ্ঠাগত হবার সামিল। চক্ষুলজ্জাহীন ইন্দ্রনাথের কোন কিছুতেই অরুচি দেখলাম না। পাশের চেয়ারে ম্যানেজারকে বসিয়ে খোশগল্প জুড়ে দিলে ধ্রুপদী সঙ্গীত নিয়ে। কথায় কথায় আবহ সঙ্গীতের কথাও এসে

পড়ল। নিচু মঞ্চে বসা বাজনদারদের প্রশস্তি আরম্ভ করে দিলেন ম্যানেজার। ফেজ টুপি মাথায় ওই যে মুসলমানটি এস্রাজ বাজাচ্ছেন, ওঁর জন্মভূমি আরবে রাঙা আপেলের মত টুকটুকে রঙ। হাতটিও বড় মিঠে। আর পাশের পাখোয়াজ বাজিয়ে? তাকে আনা হয়েছে ইন্দোর থেকে। চেহারাটা কালো আঙুরের মত হলেও ওঁর হাতের বোল নাকি মানুষের মত কথা কয়। তিন-চার রকমের বাঁশি নিয়ে ওই যে সারস পাখির মত লিকলিকে লোকটি—ওঁকে আনা হয়েছে মহীশূর থেকে। বড় যে-সে শিল্পী উনি নন। ওঁর পূর্বপুরুষেরা ছিলেন কর্ণাটক রাজাদের সভাশিল্পী। কার্জন পার্কের সাপ্তাহিক জলসায় ওঁর বাঁশি শুনে মুগ্ধ হয়ে গেছিলেন জাহানারার মালিক। শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে গেল আমার।

আরও কিছুক্ষণ পরেই শুরু হল আজকের অনুষ্ঠান-সূচীর সবচাইতে বড় আকর্ষণ—বেনারসী নর্তকীর অনবদ্য নৃত্য।

ইন্দ্রনাথ তখন বাঁশি-বাজিয়ের নাম ঠিকানা নিচ্ছে ম্যানেজারের কাছ থেকে। ইডেন উদ্যানের আসন্ন জলসায় শিল্পী সংগ্রহের ভার যে ওর ওপর পড়েছে, তা জানতাম না। বাঁশিবাজিয়েকে নাকি এই জলসায় একান্তই দরকার।

বিনা মতলবে ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যে বলার পাত্র নয় ইন্দ্রনাথ। তাই চুপ করে শুনে যাচ্ছিলাম সবকিছু কিন্তু এবার আর চুপ করে থাকা গেল না।

হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ও, 'এই যাঃ, একদম ভুলে গেছি।

'কি হে, ফিরপোর পার্টির কথা দেখছি তোমরাও ভুলে মেরে দিয়েছ। একেই বলে নাচের মাহাত্ম্য। ওঠো, উঠে পড়, আর দেরি নয়। আচ্ছা ম্যানেজার সাব। বহুত সুক্রিয়া। আবার আসা যাবে—আজকে আর নয়—।'

বলে, সবে জমে-ওঠা নাচের আসর থেকে একরকম টানতে

টানতে দরজার দিকে এগোল ইন্দ্রনাথ।

অতবড় কক্ষে তখন নৃত্যের দোল লেগেছে; এক রাঙা হাসি শত শত রাঙা অধরে রাঙা নেশার সৃষ্টি করেছে; দুই কাঁকনে রিনিঝিনির সঙ্গে এক হয়ে মিশে গেছে নূপুরনিক্বণ—এক আশ্চর্য ঝঙ্কারে মুখরিত হয়ে উঠেছে গোটা ঘরটা। নাচের তালে তালে সমস্ত ঘরটা যেন দুলছে, স্বপ্নের মত অস্পষ্ট হয়ে গেছে বেলোয়ারী আর তসবির—এতগুলো চোখ মন্ত্রমুগ্ধের মত স্থির হয়ে রয়েছে মঞ্চের নৃত্যপরা রাজেন্দ্রনন্দিনীর মত তন্বীমূর্তিটির ওপর। এ যেন অলকাপুরী থেকে ছিনিয়ে আনা এক স্বপনরূপিনী অলোকসুন্দরীর জীবন্ত চিত্র।

ঠিক এই মুহূর্তে আমাদের নিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াল ইন্দ্রনাথ।

ফুটপাথে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই যেন ভিসুভিয়াসের চূড়ো উড়ে গেল—ফেটে পড়ল জয়ন্ত।

'ইয়ার্কি হচ্ছে নাকি? কি পেয়েছ আমাদের?'

গলার স্বর খাদে নামিয়ে এনে রহস্যঘন কণ্ঠে জবাব দিলে ইন্দ্রনাথ, 'বাঁশিবাজিয়ের ওপর নজর রাখতে হবে জয়ন্ত, লোক চাই।'

থমকে গিয়ে জয়ন্ত বললে, উনি আর যাই করেন, মশার চাষ করেন না।'

অসহিষ্ণু গলায় ইন্দ্রনাথ বললে, 'প্লীজ হেল্প মি। এক্ষুণি ফোন করে হেডকোয়ার্টার থেকে কাউকে আনাও। তাকে বসিয়ে চল আমার সঙ্গে। মৃগাঙ্কও যাবে।'

'কোথায়?'

'বাঁশিবাজিয়ে বিশ্বনাথ দীক্ষিতের বাড়ি। আর কিছু এখন জিজ্ঞেস করো না। আমার অনুমান যদি সত্যি হয়, তাহলে দেখতেই পাবে, কোন্ ধরণের মশার কামড়ে খুন হয়েছেন সত্যেন মল্লিক।'

'খুন' শব্দটার ওপর জোর দেওয়ায় রোমাঞ্চের শিহরণ বয়ে গেল আমার মেরুদণ্ড বেয়ে।

কসবা অঞ্চলের ছোট একটা একতলা বাড়ির সামনে যখন পৌঁছলাম, তখন রাত দশটা।

অ্যাসবেসটসের ঢালু শেড দেওয়া কটেজ প্যাটার্নের বাড়ি। সামনে একফালি বাগান—পেছনে খানিকটা জঙ্গল। জঙ্গলের পেছনে ঝলমলে অত্যাধুনিক কলোনীটায় কিছু কিছু আলোয় চমক দেখা যাচ্ছিল গাছপালার ফাঁক দিয়ে।

ফটক খুলে ঘরের সামনে পৌঁছে দেখি ইয়া বড় তালা ঝুলছে দরজায়। অর্থাৎ বিশ্বনাথ দীক্ষিত একলা মানুষ, ঘরে না থাকলেই ঘর ফাঁকা।

আগে থেকেই তৈরি হয়ে এসেছিল ইন্দ্রনাথ। দাওয়া থেকে সিধে নেমে এল বাগানে। ফুল আর সব্জির গাছই বেশি দেখলাম। টর্চের আলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কিছুই দেখতে বাকি রাখলে না ও। এদিক সেদিক দেখতে দেখতে পৌঁছলো নিরালা এক কোণে।

এদিকটায় ফুলগাছ একটিও নেই। যা আছে, তা আমি কস্মিনকালেও দেখি নি। অচেনা এক ধরনের গাছ—খুব সম্ভব সব্জির।

এইখানেই থমকে দাঁড়াল ইন্দ্রনাথ। টর্চের আলোয় দেখলাম এক জায়গার মাটি সদ্য খোঁড়া হয়েছে এবং সারির মধ্যে বেশ খানিকটা ফাঁকা। অর্থাৎ, শেকড় সমেত এই নাম না-জানা একটি গাছকে সম্প্রতি এখান থেকে উপড়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

স্থির চোখে সেদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে উবু হয়ে বসে পড়ল ইন্দ্রনাথ। পকেট থেকে একটা ছোট ছুরি বার করে হঠাৎ ঝপাঝপ কোপ মারতে লাগল আর একটা গাছের গোড়ায় মাটির ওপর।

হল কি ইন্দ্রনাথের? পাগল হয়ে গেল নাকি? কোথায় জাহানারায় রহস্যজনক মৃত্যু ঘটল সত্যেন মল্লিকের, আর ও কিনা ছুটে এল শহরের উপকণ্ঠে কসবায়—বসে গেল একটা অদ্ভুত গাছের মাটি খুঁড়তে। প্রাইভেট ডিটেকটিভদের কাজকর্ম সব সময়েই একটু

উদ্ভট হয় বটে, কিন্তু এ যে দেখছি সৃষ্টিছাড়া। ইন্দ্রনাথ অবশ্য বলেছে, সত্যেন মল্লিক নিহত হয়েছেন। তাই যদি হয়, আমার মশার থিওরিটাকে অমন হেসে উড়িয়ে দেওয়া কি ঠিক হয়েছে? বিশেষ করে এই সেদিন একটা সায়েন্স ফিকশান গল্পে পড়েছিলাম, রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় মশার একটা লালাকে কেউটের বিষের চাইতেও শতগুণ তীব্র গরলে পরিণত করা যায়। তখন এই নিরীহ মশার এক এক কামড়েই চক্ষের নিমেষে অক্কা পেতে হবে মানবকুলকে। সেক্ষেত্রে, মশা-থিওরিকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে এই আধা পাড়াগাঁয়ে এসে গাছ উপড়োনো আর নির্দোষ বাঁশিবাজিয়ের ওপর নজর রাখার মধ্যে কি এমন বাহাদুরী আছে?

আমার মনের বিদ্রোহ হয়তো মুখেই প্রকাশ হয়ে পড়ত, যদি না—যদি না ঠিক সেই সময়েই মাটির ভেতর থেকে বেরিয়ে আসত মূলোর মত একটা শেকড়।

ঠিক মূলোর মতই তলার দিকটা সরু হয়ে এসেছিল লম্বাটে শিকড়টার। টর্চের আলোয় অত্যন্ত নিবিষ্ট মনে উল্টেপাল্টে দেখতে লাগল ইন্দ্রনাথ।

এ যে দেখছি পর্বতের মূষিক প্রসব! এত লম্ফঝম্প করে কিনা শেষকালে মূলো আবিষ্কার!

বিদ্রূপতরল কণ্ঠে তাই বললাম, 'কি হে টিকটিকি, হত্যাকারীর হাতিয়ারটাকেই আবিষ্কার করে ফেললে দেখছি!'

ব্যঙ্গটুকু গায়েই মাখল না ইন্দ্রনাথ। মুখ তুলল আমার দিকে। অন্ধকারে মুখটা স্পষ্ট দেখতে পেলাম না। তবে নিশ্চয় তখন বিজয়োল্লাস ওর দুই চোখে নৃত্য করছিল কেননা, উত্তেজিত চাপা গলায় সঙ্গে সঙ্গে ও বলে উঠল, 'তা পেয়েছি, মৃগাঙ্ক। অকল্পনীয় এই হাতিয়ার!'

ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলাম কণ্ঠস্বর শুনে। নিরাশার লক্ষণ তো দূরের কথা, এ যে আবিষ্কারের তূর্যনিনাদ!

মূল্যের মত শেকড়টাকে পকেটে পুরে উঠে দাঁড়িয়েছিল ইন্দ্রনাথ। বাগান সম্বন্ধে আর কোন আগ্রহ দেখলাম না ওর মধ্যে।

ফটক বন্ধ করে বেরিয়ে এলাম বাইরে। কিছুদূরে ঝুপসি বটগাছের নিচে রাখা জীপে এসে বসলাম তিন বন্ধু। জয়ন্ত এতক্ষণ মুখ বুজে সাক্ষীগোপালের মত দেখছিল বন্ধুবরের উন্মাদ কার্যকলাপ। এবার কি বলতে গেল, কিন্তু মুখের ওপর কাঁচির একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে মুখ বন্ধ করে দিলে ইন্দ্রনাথ।

প্রায় ঘন্টাখানেক এইভাবে বসে বসে মশার কামড় খেলাম। দূরে দেখা গেল একটা ছায়ামূর্তি।

বিশ্বনাথ দীক্ষিত। সারস পাখির মত লম্বা লম্বা ঠ্যাং ফেলে ফটকের সামনে এসে দাঁড়াল তার অত্যন্ত হাল্কা মূর্তি। বাঁ হাতে ঝুলছিল একটা লম্বাটে বাক্স—বাঁশির বাক্স।

ডানহাতে ফটক খুলে দরজার সামনে পৌঁছলো সে। তারপর কড়াৎ করে তালা খুলে অন্তর্হিত হল ভেতরে।

ঘরের মধ্যে আলো জ্বলে উঠতেই গাড়ি থেকে নেমে এলাম আমরা। কড়া নাড়তেই দরজা খুলে গেল। তার আগেই আড়ালে দাঁড়িয়েছিল জয়ন্ত। দরজার সামনে রইলাম শুধু আমি আর ইন্দ্রনাথ।

বিরক্ত চোখে দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিল বিশ্বনাথ দীক্ষিত। কিন্তু আমাদের দেখেই সামান্য চমকে উঠল।

তবে কি আমাদের চিনতে পেরেছে ও?

কিন্তু এ চমক ক্ষণেকের জন্যে। পরক্ষণেই রুক্ষ স্বরে শুধোলে, 'কি চাই আপনাদের?'

ইন্দ্রনাথ বললে, আপনার সঙ্গে বিশেষ দরকার আছে আমাদের। কিন্তু তা তো এখানে দাঁড়িয়ে বলা যাবে না।'

একটু ইতস্তত করল বিশ্বনাথ। তারপর দরজার সামনে থেকে সরে দাঁড়িয়ে বললে, 'ভেতরে আসুন।'

টিমটিমে আলো জ্বলছিল দেওয়ালের ব্র্যাকেটে। ধুলো জমে এমন অবস্থা হয়েছে যে, বিদ্যুৎ-বাতি বলে চেনাই যায় না। এক-কোণে একটা তক্তপোষ। অপর দিকে একটা কাঠের আলমারি। তক্তপোষের ওপর সতরঞ্চি পাতা। এলোমেলোভাবে ছড়ানো বাদ্যযন্ত্র—বাঁশিই বেশি।

রসকষহীন গলায় বিশ্বনাথ বললে, 'বসুন। আমি বড় ক্লান্ত—যা বলবার সংক্ষেপে বলুন।'

তক্তপোষের ওপর গিয়ে বসলাম আমরা। ইন্দ্রনাথ বললে, 'জাহানারাতে আপনার বাঁশি শুনলাম আজ। বড় ভাল লেগেছে আমাদের। আমার ইচ্ছে, ইডেন গার্ডেনের আগামী ফাংশনে আপনি আসুন।'

'আপনি কে?'

'আমার নাম ইন্দ্রনাথ রুদ্র। এই জলসার আর্টিস্ট সংগ্রহের ভার পড়েছে আমার ওপর।' অম্লান বদনে কাঁচা মিথ্যে কথা বলে গেল ইন্দ্রনাথ।

কিন্তু তাতে বিশ্বনাথের গলার রুক্ষতা একটু কমল বলে মনে হল না। শুধোল, জলসা কবে?'

'তারিখটা এখনো ঠিক হয় নি—তবে নভেম্বরের শেষাশেষি।'

'আমাকে একটু ভাবতে দিন।'

'বেশ তো, ভেবেচিন্তেই বলুন।' পকেট থেকে কাঁচির প্যাকেট বার করতে করতে বললে ইন্দ্রনাথ, 'এত রাতে আসাটা সত্যিই অন্যায় হয়েছে। কিন্তু—' ঠোঁটের গোড়ায় একটা কাঁচি ঝুলিয়ে পকেট হাতড়াতে হাতড়াতে, 'ম্যানেজারের কাছে শুনলাম আপনি মাইশোরিয়ান, কিন্তু বাংলাটা বেশ রপ্ত করেছেন তো? ধুত্তোর, দেশলাইটা বোধ হয় জাহানারাতেই রেখে এলাম। আছে নাকি মিস্টার দীক্ষিত?'

নিরুত্তরে চৌকাঠের দিকে পা দিলে বিশ্বনাথ। তৎক্ষণাৎ

বিদ্যুদ্বেগে তক্তপোষ ছেড়ে আলমারির সামনে গিয়ে দাঁড়াল ইন্দ্রনাথ। কাঠের পাল্লার একদম কাছে চোখ নিয়ে গিয়ে কি দেখে চকিতে ফিরে এসে বসে পড়ল তক্তপোষের ওপর।

ফিসফিস করে বললে, 'এখন আমি যাই বলি না কেন, তোমরা মুখে চাবি এঁটে বসে থাকবে।'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকল বিশ্বনাথ। হাতে দেশলাই।

সিগারেটটা ধরিয়ে নিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে ইন্দ্রনাথ বললে, 'ইডেন গার্ডেনে শুধু বাঁশি বাজানো নয়, আরও একটা কাজের ভার আপনাকে দিতে চাই। অন্যের কাছে কাজটা কঠিন হলেও, আপনার কাছে নয়। কেননা, এ কাজে আপনি হাত পাকাচ্ছেন অনেকদিন ধরেই।'

কি বলতে চায় ইন্দ্রনাথ? ওর ওপর মাঝে মাঝে আমার প্রচণ্ড রাগ হয় যখন-তখন সাসপেন্স সৃষ্টির জন্যে। কিন্তু এ-ধরণের প্রস্তাবনা তো ওর কাছে আশা করি না। এ কোন কাজের কথা বলছে ও? অত্যন্ত ধীর, অত্যন্ত সীরিয়াস ভঙ্গিতে কথা বলছিল ইন্দ্রনাথ। লক্ষ্য করলাম, বিশ্বনাথের মুখেও পড়েছে কৌতূহলের ছায়া।

প্রত্যেকটি অক্ষরের ওপর জোর দিয়ে থেমে থেমে বলে চলল বন্ধুবর, 'ইডেন গার্ডেনে মঞ্চের একদম সামনের সারিতে কয়েকজন হোমরাচোমরা ব্যক্তি বসে থাকবেন। তাঁদের মধ্যে থাকবেন একজন বিখ্যাত জননেতা—নামটা পরে বলব। নানা কারণে তাঁর এখন রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চ থেকে সরে যাওয়ারই দরকার হয়েছে।'

শক্তিমান অভিনেতার মতই মাত্র এই কটি কথায় ঘরের পরিবেশকে যেন আমূল পাল্টে দিলে ইন্দ্রনাথ। উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠায় থমথমে হয়ে উঠল ঘরের আবহাওয়া। আর ধীরে ধীরে তীব্র হয়ে এল বিশ্বনাথের চোখের দৃষ্টি, শক্ত হয়ে এল হাতের রেখা।

চুপ করে ছিল ইন্দ্রনাথ। এখন বন্দুকের গুলির মত বলে উঠল, 'আপনি অভিজ্ঞ। তাই এ দায়িত্ব আপনার ওপরেই দিতে চাই।

পারিশ্রমিকের পরিমাণ দশ হাজার টাকা।'

এতক্ষণ বাদে তীব্র চাপা গলায় গর্জে উঠল বিশ্বনাথ—কাল-নাগিনী যেন ফণা তুলে হিসহিসিয়ে উঠল ওর কণ্ঠে, 'কে আপনি?'

'বললাম যে, ইডেন গার্ডেনের জলসায় আর্টিস্ট সংগ্রহের—'

'রাতদুপুরে এসব কথা কি বলতে এসেছেন? কি মতলব আপনার?'

ধীরে-সুস্থে আধপোড়া সিগারেটটা তক্তপোষের গায়ে রগড়ে রগড়ে নিভিয়ে দিল ইন্দ্রনাথ। থমথমে নৈঃশব্দ যেন ফেটে পড়তে চাইল আতীব্র উদ্বেগে। নিভোনো সিগারেটটা জানলা দিয়ে আঙুলের টোকায় উড়িয়ে দিয়ে শান্ত গলায় বললে ও, 'আপনি ভয় পেয়েছেন, ভাবছেন আমি পুলিশের লোক। পুলিশ হলে কি এসব ভণিতা করতাম? সত্যেন মল্লিকের মৃত্যুর কারণ পুলিশ জীবনেও জানতে পারবে না। কিন্তু আমি জানি। জানি বলেই এত রাতে—'

'জানেন যে তার প্রমাণ কি?'

চমকে উঠলাম বিশ্বনাথের স্বর শুনে। এ যে দেখছি স্পষ্ট চ্যালেঞ্জ।

টুপ করে মেঝেতে নেমে পড়ল ইন্দ্রনাথ। লম্বা লম্বা পা ফেলে কাঠের আলমারির সামনে গিয়ে বললে, 'প্রমাণ এই আলমারিটা।'

বিশ্বনাথের কেউটের মত বিষময় চোখ আর সারা দেহের টানটান ভঙ্গি দেখে মনে হল এই বুঝি লিকলিকে নেকড়ের মতই লাফিয়ে উঠবে সে।

'আপনি পুলিশের লোক?'

'না। আচ্ছা, এই জিনিসটা চিনতে পারেন?'

বাগান থেকে খুঁড়ে আনা শেকড়টা বার করে তুলে ধরল ইন্দ্রনাথ।

'মূলো বলেই তো মনে হচ্ছে।'

'হ্যাঁ, সেই রকমই দেখতে। ভুল করে মূলো অথবা গাজর

জাতীয় সব্জি মনে করায় অতীতে অনেক শোচনীয় পরিণতিরও কারণ হয়েছে নিরীহ চেহারার এই শেকড়টি।'

একটু থামল ইন্দ্রনাথ। অসহ্য উৎকণ্ঠায় ভারী হয়ে উঠেছিল ঘরের বাতাস। সুচ্যগ্র চোখে তাকিয়েছিল বিশ্বনাথ। মোচড়ের পর মোচড় দিয়ে ক্লাইমেক্সের দিকে এগিয়ে যাওয়ার কায়দায় আবার শুরু করল ইন্দ্রনাথ :

'মূলো নয়, এ শেকড়ের নাম অ্যাকোনাইট। জানেন কি, এ থেকে একটা মারাত্মক বিষ ডিস্‌টিল করে বার করে নেওয়া খুব কঠিন নয়?'

'না, জানি না, জেনেই বা করব কি?'

'এ শেকড় আপনার বাগানে এন্তার রয়েছে কিনা!'

'আগাছার জন্যে নিশ্চয় দায়ী নই আমি।'

'সবুর, সবুর! দায়িত্বের কথা পরে কইব। সত্যেন মল্লিককে আপনি এর আগে চিনতেন?'

'না।'

'তা সত্ত্বেও গত রাতে অত লোকের চোখের ওপরেই ওঁকে খুন করলেন আপনি। আপনার ধড়িবাজির তারিফ করছি। কিন্তু ওঁর মত মানুষকে কেন খুন করতে গেলেন বলুন তো?'

ঠিক যেন মেশিনগান থেকে আচমকা একঝাঁক গুলিবর্ষণ ঘটল, এমনি উপর্যুপরি প্রশ্ন করে গেল ইন্দ্রনাথ। কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে উঠছিল ওর কণ্ঠ আর চোয়ালের রেখা। আর শক্ত হয়ে আসছিল বিশ্বনাথের দৃষ্টি।

কয়েক মুহূর্তের শ্বাসরোধী নীরবতা ভঙ্গ করে চিবিয়ে চিবিয়ে জবাব দিল বিশ্বনাথ, আপনি উন্মাদ। দয়া করে এত রাতে আর জ্বালাবেন না, বিদেয় হোন।'

'না, আমি উন্মাদ নই। আমি জানি কি করে সত্যেন মল্লিককে খুন করেছেন আপনি। আপনি জানতেন, গতকাল রাতে উনি

হাজির থাকবেন জাহানারাতে। তাই বেশ কিছুদিন ধরে সাধনা করেছেন এই ঘরে বসে।'

'কিসের সাধনা ? কি বলতে চান আপনি ?'

'বাঁশির নয়। আলমারির ওই পাল্লার ওপর একটা পুঁচকে তীর ছোঁড়ার সাধনা।'

'আপনি কি দৈবজ্ঞ, না সবজান্তা, না পাগল ? রাতদুপুরে এ কি উৎপাত ?'

'আমি কোনটাই নই। পাল্লার আগাগোড়া ছোট ছোট ছুঁচ ফোটার মত চিহ্ন দেখলেই বোঝা যায় ওগুলো কিসের চিহ্ন।'

'কিসের ?'

'বললাম তো, তীর বেঁধার চিহ্ন।'

আচমকা অট্টহাস্য করে উঠল বিশ্বনাথ। সারস পাখির কণ্ঠে যেন হায়নার হিমেল হাসি—হাসির দমকে ফুলে ফুলে উঠতে লাগল পাতলা লম্বা দেহটা। এ-হাসি যার কণ্ঠে জাগে, কে বলবে সময় বিশেষে তারই ফুসফুস থেকে বেরোতে পারে সুরের যাদু।

আমি তো হতবাক। ইন্দ্রনাথ নির্বিকার।

হাসি থামাতে গিয়ে খকখক করে কাশতে লাগল বিশ্বনাথ। কাশি আর হাসির মধ্যে মধ্যে বললে, জাহানারার মধ্যে আমি তীর ছুঁড়েছি—এই কথাই বলতে চান তো আপনি ? মিস্টার ডিটেকটিভ, পুলিশের চাকরি ছেড়ে দিয়ে গোয়েন্দা-গল্প লিখুন, দুটো পয়সার মুখ দেখবেন—এ কাজ আপনার নয়।'

সর্বনাশ! ইন্দ্রনাথের প্রশ্নবাণ আর আক্রমণের ধারার মধ্যে যে অসঙ্গতিটা একটু একটু করে প্রকট হয়ে উঠছিল আমার মনের মধ্যে, ঠিক সেইখানেই ঘা দিয়েছে বিশ্বনাথ। এও কি সম্ভব ? অত লোকের সামনে তীর ছুঁড়ে হত্যা ? দারুণ রাগ হয়ে গেল ইন্দ্রনাথের ওপর। আগে থেকে আমাদের সঙ্গে শলাপরামর্শ না করার ফলেই তো এই দুর্গতি। এখন ল্যাজে-গোবরে এক হয়ে

ঘরমুখো হওয়া ছাড়া আর কোন পথ নেই। ইন্দ্রনাথের নিষেধ অমান্য করে আমি হয়তো কথাই বলে ফেলতাম, কিন্তু বন্ধুবরের এক ঝলক ঠাণ্ডা দৃষ্টিতেই চুপ মেরে গেলাম।

অস্বাভাবিক শান্ত গলায় ইন্দ্রনাথ বললে, 'আমি পুলিশ নই, আমি গল্প-লিখিয়েও হতে চাই না। কিন্তু আমি প্রমাণ করে দিতে পারি তীর ছুঁড়েই সত্যেন মল্লিককে ওপারে পাঠিয়েছেন আপনি।'

হাসির চোটে চোখ-মুখ লাল করে বিশ্বনাথ শুধোলে, 'কেমন করে শুনতে পারি কি?'

ইন্দ্রনাথের মার্বেল পাথরের মত শক্ত মুখে ধ্বক ধ্বক করে জ্বলছিল যেন আগ্নেয়শিলায় তৈরি চোখ দুটি।

'হ্যাঁ, পারি। আপনার বাহাদুরী তো সেইখানেই, মিস্টার দীক্ষিত। এ খুনের আসল ধাঁধাঁই তো সেইখানে। মাঝে মাঝে আপনি একটা সাদাসিধে টিনের বাঁশি বাজান। ওই বাঁশিটা।'

তক্তপোষের ওপর থেকে টিনের বাঁশিটা নিয়ে এল ইন্দ্রনাথ। বাতাসের গর্তগুলোর ওপর আঙুল রেখে বললে, 'সব ক'টা ছেঁদা এইভাবে বন্ধ করে খুব জোরে ফুঁ দিলে দমকা বাতাসের স্রোত বয়ে যায় বাঁশির মধ্যে দিয়ে। অ্যাকোনাইটের শেকড় থেকে পাওয়া মৃত্যু-বিষে ভেজানো একটা ক্ষুদে তীর যদি এই বাঁশির মধ্যে থাকে, আর দীর্ঘদিন ধরে কেউ যদি হাত পাকিয়ে থাকে ছুঁচের মত সূক্ষ্ম এই তীর ছোড়ার বিদ্যায়, তাহলে ফুঁ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা কারও ঘাড়ে গিয়ে বিঁধে যাওয়া এমন কিছু বিচিত্র ব্যাপার নয়। যার কাঁধে লাগবে, সে ভাববে বুঝি মশা বা পোকা-মাকড়ের কামড়। ঘাড়ের চামড়ায় বিষ ঢুকিয়ে মেঝেয় খসে পড়ে যাবে ছুঁচরূপী তীরটা। তারপর অন্যান্য ময়লার সঙ্গে ঝাড়ুদারই তা ঝেঁটিয়ে ফেলে দেবে জঞ্জালের গাদায়। যদি না—যদি না তীরন্দাজই তা পরে কুড়িয়ে নেয়।

'মিস্টার দীক্ষিত, এইভাবেই সত্যেন মল্লিককে খুন করেছেন

আপনি। পুলিশ যখন হট্টগোলের মধ্যে তাদের রুটিনওয়ার্ক নিয়ে ব্যস্ত, তখনি বিশেষ ধরণের এই ছুঁচটা আপনিই সরিয়ে ফেলেছেন। ইডেন গার্ডেনে এই জিনিসকেই আবার কাজে লাগাতে হবে আপনাকে। ছুঁচটা একবার দেখাবেন?'

বিশ্বনাথের মুখখানা তখন পর্যবেক্ষণ করার পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে। নিঃসীম বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে দু' চোখ—কৌতুকের বাষ্পকণাও নেই সে চোখে। অদম্য উত্তেজনা, অপরিসীম উদ্বেগ আর ভয়ানক শঙ্কায় মৃগীরুগীর মত কেঁপে কেঁপে উঠছিল মুখের আর ঠোঁটের মাংসপেশী।

ঠিক এই সময়ে নাটকীয়ভাবে গটগট করে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করল জয়ন্ত।

চকিতে ইন্দ্রনাথের কণ্ঠ থেকে অন্তর্হিত হল অসির ঝনঝনানি। সহানুভূতির স্বরে সে বললে, 'থাক, থাক, আমরাই খুঁজে নেবো তীরটা। ও জিনিস ছাড়া তো এ মামলায় আপনার বিপক্ষে খাড়া করার মত সত্যিকারের কোন প্রমাণই নেই। আসুন, আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই আমার এই বন্ধুটির। জয়ন্ত চৌধুরী—ডিটেকটিভ ইনসপেক্টর।

কালো টাকা

'রেজালা'র ঝোলে তন্দুরি ডুবিয়ে ইন্দ্রনাথ বললে, 'জয়ন্তর রিপোর্ট কি?'

ম্লানভাবে ইন্দ্রনাথের জীর্ণ টেবিলটার ওপরেই বসেছিল জয়ন্ত। বললে, 'বিশ্বনাথ দীক্ষিতই খুন করেছে সত্যেনবাবুকে।'

কবিতা ফোঁস করে বললে, 'হায় কপাল, একলক্ষ বার তা শুনেছি আমার কর্তার কাছে। কিন্তু কেন?'

'কারণ সেই একই—কালো সরকার!'

'সেটা আবার কি হে?' তন্দুরি চিবোতেও ভুলে গেল

ইন্দ্রনাথ।

'কালো সরকার কি বলতে গেলে গৌরচন্দ্রিকা হিসেবে যে টাকার হিসেব নেই, তার সম্বন্ধে কিছু বলতে হয়। দয়া করে ধৈর্য ধরে শোনো।

'কাগজে পড়েছ তো সম্প্রতি অর্থমন্ত্রী রাজ্যসভায় দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন, হিসেবের বাইরে টাকা উদ্ধার করতে সরকার চেষ্টার ত্রুটি করবেন না। এই টাকাই কালো টাকা। গত যুদ্ধের সময়ে সরকারী নিয়ন্ত্রণের বাইরে যে কালোবাজার সৃষ্টি হয়, কালো টাকার উদ্ভব ঘটে সেখানেই। কালোবাজারে কোটি কোটি টাকা মুনাফার জন্যে কোন আয়কর দিতে হয় না। এই টাকাই আবার কালোবাজারে খাটানো হয়। এইভাবেই কালো টাকার অঙ্ক ফেঁপে উঠে এমন অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে যে সরকার শুদ্ধ দিশেহারা হয়ে উঠেছে।

'বর্তমানে কালো টাকা রোজগারের আর খাটাবার একটা প্রধান পথ হচ্ছে ঃ বিধি-নিষেধের বেড়া ডিঙিয়ে বিদেশ থেকে 'স্মাগলিং' অর্থাৎ শুল্ক ফাঁকি দিয়ে পণ্য আমদানী করা আর সুড়ঙ্গপথে দেশের বাইরে মাল পাঠানো। পুলিশ এ খবরও রাখে যে, কলকাতারই কোন একটা বাজারে প্রতিদিন এক কোটি টাকা দামের বে-আইনী ভাবে আমদানী করা মাল কেনাবেচা হয়। কেউ কেউ মনে করেন, আমাদের দেশে কালো টাকার পরিমাণ তিন হাজার কোটি টাকার মত। অবশ্য সঠিক অঙ্ক নির্ধারণ করা সত্যিই খুব কঠিন।

'বর্তমানে অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে, তাতে সমাজবিরোধীদের হাতে কালো টাকা একটা বিরাট শক্তিতে পরিণত হয়েছে। এরা কালো টাকার জোরে সরকারের সবরকম নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা আর বিধি-নিষেধকে ভেঙে তছনছ করে দিচ্ছে। সরকার-নিয়ন্ত্রিত প্রকাশ্য বাজারের নাকের ডগাতে কালোবাজার চলছে। কালোবাজার চালু রাখার জন্যে এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী বাজারে এসেনশিয়াল কোমোডিটি অর্থাৎ অত্যাবশ্যক পণ্যদ্রব্যের কৃত্রিম ঘাটতি সৃষ্টি করছে। সেই সঙ্গে

জিনিসপত্রের দাম বাড়ানোর জন্যে সরকারের ওপর চাপ দিচ্ছে। এই চাপ যে কত প্রবল, জিনিসপত্রের দামের উর্ধ্বগতির দিকে তাকালেই তা বোঝা যায়। সমাজবিরোধীরা কালো টাকার জোরে দেশে প্রায় অরাজক অবস্থার সৃষ্টি করেছে। সরকার এই দুঃসহ অবস্থার কোন প্রতিকার করতে পারছেন না। সরকারের সবরকম আইন-কানুন ডিঙিয়ে কালোবাজারীরা অবাধে তাদের কারবার চালিয়ে যাচ্ছে। কালো টাকার মালিকরা বলতে গেলে, আজ প্রায় একটা পাল্টা সরকার চালাচ্ছে। আমি এই সরকারের নাম দিয়েছি কালো সরকার।'

একটানা বলতে বলতে দারুণ উত্তেজনায় টকটকে লাল হয়ে উঠেছিল জয়ন্তর মুখ। উত্তেজনা অত্যন্ত ছোঁয়াচে জিনিস। কাজেই আমাদের রক্তও যেন ধীরে ধীরে টগবগিয়ে উঠছিল কালো সরকারের খপ্পরে পড়ে, নিজেদের অসহায় অবস্থা উপলব্ধি করে।

কবিতাই শুধু চোখ গোল-গোল করে বলে উঠল, 'বাবা, এ যে দেখছি রেগুলার ইকনমিক্সের লেকচার শুরু করে দিলে। কিন্তু কালো টাকার সঙ্গে সত্যেন মল্লিকের মৃত্যুর—'

'সম্বন্ধ আছে।' মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললে জয়ন্ত, 'কালো টাকার দাপট নষ্ট করতে হলে কালোবাজার ধ্বংস করতে হবে, যে কোন ভাবে স্মাগলিং বন্ধ করতে হবে। স্মাগলিং বন্ধ হলেই কালো টাকা খাটাবার আর কালো টাকা উপায়ের একটা প্রধান পথ বন্ধ হয়ে যাবে। বেশ কিছুদিন ধরে লালবাজারের প্রত্যেকেই হিমসিম খাচ্ছিলেন এই গুরুদায়িত্ব নিয়ে। ঠিক এই সময়ে মারা গেলেন সত্যেন মল্লিক।'

'কেন?' কবিতা নাছোড়বান্দা।

'কারণ, কালোবাজারীদের নির্মূল করার জন্যে একটা পরিকল্পনা রচনা করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল যে কমিটির ওপর, তারই চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছিলেন সত্যেন মল্লিক। সমস্ত ব্যাপারটা

এত গোপনে চলছিল যে, জনসাধারণ তো দূরের কথা, আমরা শুদ্ধ কিছু জানতে পারি নি। কিন্তু কালো সরকার জানতে পেরেছিল।'

'অর্থাৎ তুমি বলতে চাও কালো সরকার আমাদের সরকারের এই স্কীমও বানচাল করে দিলে সত্যেন মল্লিককে খুন করে?' শুধোলে ইন্দ্রনাথ।

'হ্যাঁ, তাই বলতে চাই। বিশ্বনাথ দীক্ষিতের জবানবন্দীতে যেটুকু তথ্য পাওয়া গেছে, তা থেকে অনায়াসেই এ সিদ্ধান্তে আসতে পারি আমরা। বিশ হাজার কালো টাকার লোভে এ কাজ করেছে বিশ্বনাথ।'

'কিন্তু সুরের সাধক খুনের ব্যাপারে হাত পাকাতে গেল কেন, তাই তো বুঝলাম না।' অবুঝের মত লেগে থাকি আমি।

কবিতা মুখ টিপে বললে, 'অ্যাঙ যায়, ব্যাঙ যায়, খলসে বলে আমি এক লাফ দিই। সবই যদি তুমি বুঝবে, তাহলে আর আমার কপালে জুটবে কেন?'

ইন্দ্রনাথ তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'আরে, আরে, সভামধ্যে দাম্পত্য কলহ নৈব নৈব চ। শোনো বৌদি, শুধু স্ত্রীলোকের চরিত্র কেন, মানব চরিত্রও বড় দুর্জ্ঞেয়, বড় জটিল। টাকার লোভে ছেলে যদি বাপকে খুন করতে পারে, তাহলে সঙ্গীতসাধকই বা অ্যাকো-নাইটের চাষ করবে না কেন?'

'বেশ, কিন্তু ওই নিরীহ মানুষটাকে তুমি সন্দেহ করতে গেলে কেন? নিশ্চয় হাত গোণো নি?'

'তবে শোনো, প্রথমটা সত্যিই আমি দিশেহারা হয়ে গিয়ে-ছিলাম। ভেবেছিলাম, এ যাত্রা বুঝি মুখ কালো করেই ঘরে ফিরতে হবে। বাস্তবিকই, নীল বৃত্ত না থাকলে সত্যেন মল্লিকের মৃত্যুকে অস্বাভাবিক কখনোই বলতে পারতাম না—খুন তো নয়ই। শেষ পর্যন্ত করোনারি অ্যাটাক বলেই সুড়সুড় করে সরে পড়তাম। কিন্তু গোল বাধালে মৃগাঙ্ক আর একটা সায়েন্সফিকশন গল্প!'

'আমি ?'

'হ্যাঁ, তুমি। আমি একটু কল্পনাবিলাসী বলে তোমরা টিটকিরি দাও। গোয়েন্দাদের নাকি প্র্যাকটিক্যাল হতে হয়। কিন্তু এ কেস সমাধানের জন্যে ফিফটি পার্সেন্ট ক্রেডিট দিতে হবে আমার কল্পনা, আর আমার কপালকে।' মনে আছে, ব্লু সার্কেল দেখে তুমি বলেছিলে, এ মশার কামড়ের দাগ ?'

'বলেছিলাম তো।'

'মাই ডিয়ার ফ্রেণ্ড, সঙ্গে সঙ্গে প্রেমেনবাবুর একটা গল্প মনে পড়ে গেল। বইটা তুমিই পড়তে দিয়েছিলে আমাকে। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় মশার একটি বিশেষ লালাকে বিষাক্ত করে তুলতে পারলেই সেই মশার কামড় খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অক্কা পেতে হবে প্রতিটি প্রাণীকে। তবে কি এই ধরণেরই কোন মশার জন্ম হয়েছে কারো ল্যাবরেটরিতে ? পরক্ষণেই ভাবলাম, রাবিশ। তাই যদি হয়, মশার রাগ তাহলে কেবল সত্যেন মল্লিকের ওপর কেন ? আরও অনেককে সেদিন পরলোকের টিকিট কাটতে হত।

'মশার সম্ভাবনাকে তক্ষুণি নাকচ করেছিলাম। কিন্তু তুমিই সর্বপ্রথম আমার মাথায় একটা জব্বর পয়েন্ট এনে দিলে—বিষের সম্ভাবনা। সে বিষ মশার হুল মারফৎ না এলেও নিশ্চয় বায়ুপথেই এসেছে সবার চোখের ওপর দিয়ে। পাঠিয়েছে, মানুষ। কেননা বুদ্ধি খাটিয়ে একমাত্র মানুষই মানুষকে হত্যা করে।

'কল্পনার রাশ ছেড়ে দিলাম। নিজেকে হত্যাকারীর পদে অধিষ্ঠিত করলাম। যে কোন কারণেই হোক, খুন করতে হবে সত্যেন মল্লিককে। কিন্তু কি করে ?

দূর থেকে ব্যক্তি বিশেষের প্রাণ হরণ করার একটিমাত্র পদ্ধতিই আধুনিক মানুষ আবিষ্কার করেছে এবং তা হল আগ্নেয়াস্ত্র। কিন্তু নাচ-গান ভরা কক্ষে সাইলেন্সর লাগানো রিভলবারও বিপজ্জনক।

'আহা রে, এমন কোন একটা হাতিয়ার যদি পাওয়া যেত যাকে

দিয়ে নিঃশব্দে সবার চোখে ধুলো দিয়ে আগুন নয়, তপ্ত সীসের বুলেট নয়, এককণা বিষ পাঠিয়ে দিতে পারতাম।

'সঙ্গে সঙ্গে যেন এক লক্ষ ওয়াটের ফ্ল্যাশ-বাল্ব জ্বলে উঠল মাথার কোষে কোষে। অভিভূতের মত 'ইউরেকা! ইউরেকা!' বলে চেঁচিয়ে উঠতে ইচ্ছে হয়েছিল। মনে পড়ে গিয়েছিল ব্লো-পাইপের কথা।

'দক্ষিণ আমেরিকার কোন কোন আদিবাসীরা আজও এই মারাত্মক অস্ত্র ব্যবহার করে শত্রুনিধনের জন্যে। সামান্য একটা নল। তার মধ্যে থাকে বিষ মাখানো তীর। ফুঁ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা অব্যর্থ লক্ষ্যে বিঁধে যায় টার্গেটে।

'ব্লো-পাইপ। একমাত্র ব্লো-পাইপে ফুঁ দিয়েই নিঃশব্দে মারতে পারি সত্যেন মল্লিককে। তীরটা এত ছোট হওয়া চাই যা গরলটুকু ঢেলে দিয়েই খসে পড়ে যাবে মাটিতে।

'নিঃশব্দে না হয় হল। কিন্তু অত লোকের চোখের ওপর ব্লো-পাইপে ফুঁ দেওয়া কি সম্ভব?'

কিন্তু ব্লো-পাইপের মত দেখতে প্রত্যেকের চেনা অত্যন্ত নিরীহ চেহারার কোন পাইপে যদি ফুঁ দেওয়া যায়? যা দেখে কেউ কোন সন্দেহ করবে না, অথচ যা দিয়ে—

'বাঁশির সম্ভাবনা মাথায় এল তখুনি। বাজনদারদের মধ্যে বসে যদি বাঁশি বাজাতে থাকি আমি, তারপর একফাঁকে আসল বাঁশিটা তুলে তীরটা ছুঁড়েই আবার বাঁশি পাল্টে নিই, তা হলেই তো কেল্লা ফতে!

'কিন্তু বিষ? কোন বিষ লাগাবো তীরের ডগায়? দক্ষিণ আমেরিকার ব্লো-পাইপের আবিষ্কর্তারা যে বিষবৃক্ষের নির্যাস ব্যবহার করে, তা তো এদেশে পাওয়া যাবে না, এ জন্যে চাই এদেশের বিষ।

'কীট-বিজ্ঞান নয়, জাহানারা থেকে ফিরে এসেই বসলাম বিষ-বিজ্ঞানের বই নিয়ে। সন্ধান পেলাম অ্যাকোনাইটের। সম্পূর্ণ হল আমার কল্পনা-সিদ্ধান্ত।

'ম্যানেজারের কাছে বিশ্বনাথ দীক্ষিতের ঠিকানা নিয়ে সেই রাতেই হানা দেওয়ার ঠিক করলাম। ম্যানেজারকে ভয় খাইয়ে দিলাম, আমাদের পরিচয় জাহানারার কোন কর্মচারী জানতে পারলে তিনিই বিপদে পড়বেন। বাগানে অ্যাকোনাইটের শেকড় আবিষ্কারের পরেই আর কোন সন্দেহ রইল না। বাকিটুকু তো তোমরা জানোই। স্রেফ কথার মারপ্যাঁচে কুপোকাৎ করতে হয়েছে ওকে।'

কবিতা বললে, 'কিন্তু এক নজরেই তুমি কি করে জানলে যে টিনের বাঁশিটাই ব্লো-পাইপ?'

'স্রেফ আন্দাজে। এরকম ঝুঁকি আরও কয়েকবার নিয়েছি ওর পেট থেকে কথা আদায়ের জন্যে। অনুমান মিথ্যে হলেও অপ্রস্তুত যাতে না হই, তার জন্যে পাল্টা আক্রমণের পন্থাও মনে মনে তৈরি রেখেছিলাম। আচ্ছা জয়ন্ত, তীরটা পাওয়া গেছে?'

'হ্যাঁ।'

'এটাই তো এ কেসের একমাত্র প্রমাণ। এ ব্যাপারে সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে, সত্যেন মল্লিকের মত মানুষের জাহানারায় আগমন এবং ওদেরই পাতা ফাঁদে পা দেওয়া। এ রহস্যের মীমাংসা জয়ন্তই করবে। তবে আমার ধারণা, কালোবাজারীরাই নিজেদের মৃত্যুবাণ ওঁর হাতে তুলে দেওয়ার লোভ দেখিয়েছিল। এমনই লোভনীয় সেই টোপ যে উনি আর সামলাতে পারেন নি।'

'শয়তানগুলোকে গ্রেপ্তার করার ব্যবস্থা হয়েছে?' কবিতা শুধোয়।

'তা সম্ভব নয়, বৌদি।' ম্লান হেসে বলল জয়ন্ত 'বিশ্বনাথ তাদের মুখ চিনলেও ঠিকানা জানে না। একজনকে তো আমরা দেখেইছি সত্যেন মল্লিকের সামনের চেয়ারে জাহানারা রেস্তোরাঁয়। কিন্তু এরা তো এজেন্টও হতে পারে—গভীর জলের রাঘব বোয়ালদের নাগাল পাওয়া কি এতই সহজ? তদন্ত চলছে, একদিন না একদিন—'

'তদন্ত নয়, বলো যুদ্ধ।' সংশোধন করে দিলে ইন্দ্রনাথ, 'কালো সরকার বনাম ভারত সরকার।'

অপরাধের চিহ্ন থাকে

মনীশ প্রধান

'ঢে'কি স্বর্গে গিয়েও ধান ভানে—' এই বহুপ্রচলিত প্রবাদটি বোধ হয় সকলেরই জানা আছে। আর এই প্রবাদ আমার ক্ষেত্রে দারুণভাবে মিলে গিয়েছিল।

ভূমিকা লিখে কাহিনী আরম্ভ করাই নিয়ম। তাই আগের ইতিহাস দিয়েই আরম্ভ করি কারণ আগের কথা না জানলে পরের কথা বোঝা যায় না।

পেশায় আমি ডাক্তার। এখন পসার প্রতিপত্তি মোটামুটি ভাল। প্র্যাকটিসের শুরুতে সকলেই চায় তার ভাল পসার হোক। পরে যখন পসার হয়, তখন সেটাই তার সুখ-শান্তির পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু তখন আর পিছিয়ে আসার উপায় থাকে না।

আমারও আজ সেই অবস্থা। এই নিয়ে সংসারে অশান্তি। শিখা প্রথম দিকে ছুটিছাটায় বাইরে যাওয়ার জন্যে একটু আবদার করত। পসার জমানোর নেশায় তা আর সম্ভব হয় নি। পরে অভিমান করে বলেছে, 'দেখ, এখন ছুটি পেলেই লোকে গোয়া-কাশ্মীর-সিমলা কোথায় না যাচ্ছে। তা তোমায় আমি অতদূর যেতে বলছি না। পুরী তো বেশি দূর নয়—সেখানেও তো যেতে পারো। তাও যদি দূর মনে হয়, ঘরের পাশে আছে দীঘা। সেখানেও কি যেতে নেই? এত খেটে যদি একটু বাইরে ঘুরে না বেড়াও তো পয়সা রোজগার করে কি লাভ? পয়সা কি সঙ্গে যাবে?'

কথাটা শিখা অন্যায় বলে নি। তবু রুগীর চাপে সে সময়টুকুও বার করতে পারি নি।

এর পরেই বাইরে যাওয়ার একটা সুযোগ এল। খুড়তুতো ভাই সুরেশ একদিন বাড়িতে এল। পুলিশে কাজ করে। এতদিন কুলটিতে ছিল, এখন ট্রান্সফার হয়ে দীঘায় ও-সি হয়েছে।

'বড়দা, আগে তো অনেকবার বলেছি, আসেন নি। তখন ওখানে ছিলাম, গেলে আপনাদের মাইথন কল্যাণেশ্বরী দেখিয়ে আনতাম। এখন তো আরও কাছে পোস্টিং। নরঘাটের ব্রীজ খুলেছে। এবার একবার চলুন। আপনার কথা পেলেই আমি সবচেয়ে ভাল হোটেল বুক করে রাখব। কোনরকম অসুবিধে হবে না।

শিখা বলল, 'ঠাকুরপো, বলে কোন লাভ নেই। তোমার দাদার কাছে রুগীই সব। আমরা কেউ নই।'

এই কথার পরে রাজী না হয়ে উপায় নেই। ক্যালেণ্ডারের পাতায় ছ' সপ্তাহ পরে দিন তিনেকের ছুটি দেখে বললাম, 'ঠিক আছে, এই সময় ক'দিন ছুটি আছে। হোটেল বুক করে রাখিস। তোর ওখানে যাব।'

বাইরে না যাওয়ার ওটাও একটা কারণ। অনেক আগে থেকে

হোটেল বুক করা, ট্রেনের যাওয়া-আসার রিজার্ভেশন। এই সব ঝামেলা আমার ধাতে সয় না। কেউ যদি করে দেয়, আমার আপত্তি নেই।

সেইমত ব্যবস্থা হল। শিখা অবশ্য গাড়ি নিয়ে যাওয়ার জন্যে জেদ করে নি। নিজে লোক দিয়ে বাসের দুখানা টিকিট করে রেখেছিল। ঠিকই করেছিল। দুজন গেলে তেলের দামে পোষায় না। তাছাড়া গাড়িতে গেলে বাড়ি না ফেরা পর্যন্ত ভাবনা থেকেই যায়। সেবার যেমন মাসতুতো ভাইয়ের হয়েছিল। ভাল গাড়ি নিয়ে বেড়াতে বেরিয়ে ফেরার সময় দীঘায় পেট্রল নিয়ে নন্দকুমারে এসে গাড়ি অচল। মেচেদায় দেখা গেল প্লাগ কালো—পেট্রলে কেরোসিন মেশানো ছিল।

যাওয়ার দিন সাতসকালে উঠে ধর্মতলায় গিয়ে বাসের আশায় দাঁড়িয়ে থাকা খুব বোরিং। যাক, মিনিট পনেরো পরে বাস এল। সারাটা পথ কাগজে চোখ রেখেই কাটল। নিজের কাগজ শেষ হলে, অন্যের কাগজ নিয়ে পাঁচ ঘণ্টা সময় কাটালাম।

বেলা প্রায় সাড়ে বারোটায় দীঘা পৌঁছলাম। বাসস্ট্যাণ্ডে সুরেশ জীপ নিয়ে অপেক্ষা করছিল। আমাদের হোটেল পূর্বাচল-এর ঘরে পৌঁছে দিয়ে সুরেশ বলল, 'এ বেলা চান-খাওয়া এখানেই সেরে নিন। রাত্রে আমার ওখানে খাবেন।'

'না রে, আজ থাক। এতটা বাসজার্নিতে গায়ে ব্যথা হয়েছে। কাল বরং দু'বেলা তোর বাড়ি খাব।'

'খুব ভাল। কাল খাওয়ার পরে তোমাদের নিয়ে একটু এদিক-ওদিক ঘুরিয়ে দেখাব। অবশ্য এখানে সাগর ছাড়া দেখার খুব বেশি কিছু নেই।'

হোটেলের ঘরটা বেশ ভাল। বিছানায় শুয়ে সাগরের ঢেউ গোণা যায়, আওয়াজ শোনা যায়।

আজ আর সাগরে স্নান করতে গেলাম না। লাঞ্চ সেরে একটা

লম্বা ঘুম দিলাম। বাস ধরার জন্যে অনেক তাড়াতাড়ি উঠতে হয়েছিল। সেটা পুষিয়ে নিতে হবে তো।

বিকেলে একটা শতরঞ্জি বগলে করে চললাম সাগরের ধারে। হোটেলে চা খেলাম না। ইচ্ছে ছিল সাগরের ধারে বসে ঝালমুড়ি আর চা খাব। শহরে চেনাজানা লোকের কাছে ধরা পড়ার ভয়ে তো আলুকাবলি, ঝালমুড়ি খাওয়া ভুলেই গেছি।

যাওয়ার পথে ডান দিকে একটা দোকানে জিলিপি ভাজছে দেখে সেখানে বসে পড়লাম। জিলিপি আর এক গেলাস চা শেষ করে সাগরের ধারে গিয়ে শতরঞ্জি বিছিয়ে বসলাম। তখন সূর্য ডুবছে, অন্ধকার হয় নি। অপূর্ব দৃশ্য! কোনদিন চোখ চেয়ে এ দৃশ্য দেখার সুযোগ হয় নি।

আস্তে আস্তে অন্ধকার নেমে এল। সাগরের ধারে হ্যালোজেন জ্বলে উঠল না জ্বললেও ক্ষতি ছিল না। ঘটনাচক্রে আজ পূর্ণিমা। দূর থেকে রুপোলি ঢেউ আসছে। আছড়ে পড়ছে পাথরের বোল্ডারের ওপর। আমাদের কারও মুখে কোন কথা নেই।

শিখা কি ভাবছিল জানি না। আমার মনটা যেন কয়েক বছর পিছিয়ে গেল। ডাক্তার বিধান রায়ের প্রতি শ্রদ্ধায় মনটা ভরে গেল। এক অজানা গ্রামে এই রাজ্যের ট্যুরিস্ট স্পট গড়ে তোলার যে পরিকল্পনা তিনি করেছিলেন, তা সফল হয়েছে। কত লোক বেড়াতে আসছে। কত হোটেল, হলিডে হোম, দোকান হয়েছে। কত মানুষ এখানে ব্যবসা করে সংসার চালাচ্ছে। আজ দীঘা জমজমাট ভ্রমণকেন্দ্র।

আমাদের আশপাশে নানা ধরণের লোক। ওদের মধ্যে অল্প-বয়সীর সংখ্যাই বেশি। একজন বেশ জোরে টেপে হিন্দি গান বাজাচ্ছে। কয়েকজন কুৎসিত অঙ্গভঙ্গি করে নাচছে।

শিখাকে বললাম, 'ভিডিও টেপ করে ওদের নাচ দেখালে ওরা বোধ হয় লজ্জা পেত।'

'মোটেই না। এটাই এ যুগের কালচার। তুমি আগের আমলে পড়ে আছো। তাই ব্যাকডেটেড। ওদের সঙ্গে চলতে গেলে ওদের মধ্যে মানিয়ে নিতে হবে।'

'আমার দরকার নেই। আমি বাকি জীবনটা আমার মতই কাটাব। আধুনিকতা মেনে নেওয়া যায় কিন্তু এই অতি-আধুনিকতার অসভ্যতা অসহ্য।'

ঢেউ তার মত আসছে, বিরামহীন। রাত বেড়েছে। চাঁদের আলোয় সমুদ্রের অনেক দূর পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি। দেখতে দেখতে মনটা যেন হারিয়ে গেল সাগরের জলে। জীবনে কখনো কবিতা লিখি নি। কিন্তু হঠাৎ সেদিন কবিতা ভর করল। পকেট থেকে হিসেব লেখার কাগজখানা বার করে লিখতে আরম্ভ করলাম। এক লাইন, দু' লাইন। আলো কম—তাতে কি! এখন না লিখলে পরে তো আর মনে পড়বে না!

হঠাৎ ঝপ করে লোডশেডিং হল। ক্ষতি নেই। পূর্ণিমার চাঁদের আলো যেন আরো উজ্জ্বল মনে হল। একটু থেমে আলো-আঁধারির মধ্যেই লিখে চললাম। আবার আলো জ্বলে উঠল। আমার লেখাও শেষ।

একটু দূরে একজন মাঝ-বয়সের লোক একজন অল্পবয়সী মেয়ের কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছে। এতক্ষণ লিখছিলাম বলে চোখে পড়ে নি। আর চোখে পড়ার মত কোন ব্যাপারও নয়। বাইরে এসে এইসব তরুণ দম্পতিদের মানসিক বাধা কমে যায়। চোখে পড়ার কারণ ভদ্রলোকের জামা। এই ধরণের অদ্ভুত রঙীন জামা যারা পরে, আমার মনে হয় তাদের রুচি ও মাসসিকতা নিম্নমানের।

শিখার চোখেও ওদের ব্যবহার ভাল লাগে নি। তবে আমি লিখছিলাম বলে আমাকে কিছু বলে নি। ওদের চোখে এমন কিছু ধরা পড়ে যা আমরা, অন্তত আমি, দেখতে পাই না।

বীচ থেকে হোটেলে ফেরার পথে শিখা বলল, 'বীচে ওই

লোকটাকে দেখলে, কেমন জামা পরে ছিল ?'

'দেখেছি। তা তোমার যদি পছন্দ হয়ে থাকে, কিনে দিও। সমুদ্রের ধারে তোমার কোলে মাথা রেখে শুয়ে থাকব।'

'আহা-হা, কথার ঢং দেখ! বলি বয়েস বাড়ছে, না কমছে ?' একটু থেমে আবার বলে, 'দেখ, ওইরকম পোশাক যারা পরে, তারা ভাল লোক হতে পারে না। তাদের টেস্ট নিচু। আর ওই মেয়েটাও ভাল না।'

'বাব্বা, কোন কথা না বলে দূর থেকে দেখেই বলে দিলে ওরা খারাপ লোক ? তোমাকে তো জজ করে দেওয়া উচিত। মামলা-টামলা অনেক তাড়াতাড়ি ফয়সলা হয়ে যেত।'

'ওসব তুমি বুঝবে না। চোখ থাকলে তো বুঝবে! তুমি পুরুষমানুষ, চোখ থাকতেও অন্ধ।'

কথা বাড়ানো অপ্রয়োজন। কোন প্রতিবাদ করলাম না।

হোটেলে এসে ডিনার সেরে কবিতাটি পরিষ্কার করে কপি করলাম। তারপর শুয়ে পড়লাম।

সারাটা দিন বেশ কাটল। রুগীর কষ্টের বিবরণ শুনতে হয় নি। সত্যিই মাঝে মাঝে কলকাতা ছেড়ে পালালে মন্দ হয় না।

আমার তখনও ঘুম আসে নি। এরই মধ্যে শিখার নাকডাকা শুরু হল।

হঠাৎ ঘরে ঘণ্টা বাজল। ঘুম ভেঙে গেল। পর্দার ফাঁকে আলোর আভাষ দেখা যাচ্ছে।

কি ব্যাপার! এত ভোরে বেড-টি নিয়ে এল! ধ্যেৎ, এ ঠিক শিখার কাজ। ও হয়তো ওদের তাড়াতাড়ি চা দিতে বলেছে!

ঘুম চোখে কোনরকমে হাতড়ে হাতড়ে দরজা খুললাম। সামনে দাঁড়িয়ে হোটেলের ম্যানেজার!

'কী ব্যাপার ?'

'স্যার, এখানে একটা দুর্ঘটনা হয়েছে। থানা থেকে ও-সি

এসেছেন। একজন সুইসাইড করেছে। এখন হাসপাতালের ডাক্তার আনতে গেলে দেরি হবে। আপনার একটা ওপিনিয়ন পেলে বডি মর্গে পাঠানো হবে কন্টাইতে।'

'আমি যাচ্ছি। তবে আমার কাছে স্টেথো পর্যন্ত নেই।'

গায়ে গাউনটা চাপিয়ে একটা টর্চ হাতে নিয়ে ম্যানেজারের সঙ্গে চললাম।

ঘটনাটা ঘটেছে একই ফ্লোরে। ঘরে ঢুকে দেখলাম খাটে একটি অল্পবয়সী মেয়ে শুয়ে আছে। বিছানা অবিন্যস্ত। আর কোণের দিকে চেয়ারে মাথায় হাত দিয়ে এক ভদ্রলোক বসে আছে।

আরে! এ তো কালকের সেই লোক যে রাতে সমুদ্রের ধারে একটি মেয়ের কোলে মাথা রেখে শুয়ে ছিল। কিন্তু মেয়েটি তো সে মেয়ে নয়?

সুরেশ আমাকে দেখেই বারান্দায় নিয়ে এল। বলল, 'বড়দা, এখানে আপনি যে আমার দাদা, সে কথাটা প্রকাশ করবেন না। হোটেলের বোর্ডার—ডাক্তার এই পর্যন্ত। এখন এই ভদ্রলোক যা বলছেন, তাতে সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। ওঁর কথা হচ্ছে, উনি সানরাইজের ছবি তুলে এসে দেখেন যে ঘর বন্ধ। ঘণ্টা দিয়েও ঘর খুলছে না দেখে ম্যানেজারকে ডেকে ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে ঘর খুলে দেখলেন যে ওঁর স্ত্রী পাখায় ঝুলছেন।'

আমি প্রথমেই সুরেশকে সাবধান করে বললাম, 'দেখ, এত লো-হাইটের ঘরে শাড়ি দিয়ে ফাঁস দিলে ঠিক ফাঁসির কাজ হবে না। যাই হোক, সেটা আমি একটু পরে নিশ্চিত করে বলব। তবে এক মিনিটের দেখাতেই আমার সন্দেহ এটা সুইসাইড নয়—মার্ডার। সন্দেহের কারণও আছে। লোকটা মোটেই সুবিধের নয়। কাল রাতে তোর বৌদি বলছিল লোকটা খারাপ। আমরা কাল ওকে সমুদ্রের ধারে আর একটা মেয়ের সঙ্গে দেখেছি। যাক, তুই এখন ওকে নিয়ে নিয়মমাফিক জেরা কর। আমি এর মধ্যে ঘরটা দেখি।

বডি পাঠাবার আগে একটু দেখে নিই কিভাবে মরতে পারে। এর মধ্যে তিনটে লোক আনিয়ে নে থানা থেকে। একটু পরে ওকে ছেড়ে দিবি। তবে ওকে তোর লোক ফলো করবে। অন্য একজন কালকের মেয়েটার খোঁজ নেবে। কোন হোটেলে আছে, কি নাম লিখেছে খাতায়, দেখতে হবে। এখানে কাউকে একা ঘর দেয় না—এক ট্যুরিস্ট লজের তিনতলা ছাড়া। মেয়েটার ডেসক্রিপশন আমি ঠিক দিতে পারব না, কারণ আমি ভাল ভাবে লক্ষ্য করি নি। তোর বৌদি দেখে বলেছিল মেয়েটা এর বৌ নয়। আমি কোন গুরুত্ব দিই নি। নাই বা হল বৌ, তাতে আমাদের কি। তবে ওর ক্যামেরার রীলটা ডেভেলাপ করলে মেয়েটার ছবি পাওয়া যেতে পারে। আরও জানা যাবে সানরাইজের ছবি তুলেছে কিনা। কোর্ট-কেসের ব্যাপার—দোকানদার প্রতি ছবির পিছনে যেন তার দোকানের রবার স্ট্যাম্প দিয়ে সই করে দেয়। মেয়েটাকে ট্রেস করা গেলে সেই হোটেলের আশপাশে লাল রঙের শার্ট খুঁজবে—যেখানে ময়লা ফেলা হয় বা ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে। এইবার তুই ঘরে গিয়ে খাতা খুলে ওর স্টেটমেন্ট রেকর্ড কর। আমি একটু এদিক-ওদিক দেখে নিই।'

দরজার কাছে এসে ম্যানেজারবাবুকে বাইরে ডাকলাম।

বললাম 'আমাকে কয়েকটা খাম আর একটা ফিতে এনে দিতে পারেন?'

আমি ঘরে ঢুকে প্রথমেই ওয়ার্ডরোব খুললাম। লাল জামা নেই। মাঝারি সাইজের দুটো সুটকেস ছিল। প্রথমটায় শার্ট-প্যান্ট ইত্যাদি, অপরটায় মেয়েটির পোশাক। দুটোর কোনটাতেই লাল জামা পেলাম না।

এদিকে সুরেশ ওকে জেরা করে চলেছে, নোটও লিখছে। কানে কথা আসছে। স্ত্রীর বাপের বাড়ি কোথায়, তাদের বাড়িতে কে কে আছে, কতদিন বিয়ে হয়েছে, ফটো তুলতে যখন গেলেন তখন স্ত্রীকে

সেদিন এমন আশ্চর্য ব্যাপার ঘটেছিল—'

বলে নার্সটি সেদিনকার ব্যাপার আদ্যোপান্ত শুনিয়ে দিল অলীকবাবুকে।

অলীকবাবু তো হতভম্ব। অবাক। একটু পরেই তাঁর চোখে জল দেখা দিল।

ভদ্রলোকের অবস্থা দেখে নার্স আরো বিমূঢ়।

আত্মসংবরণ করে অলীকবাবু অবশেষে যা বললেন, তাতে নার্স তো সাত হাত জলের তলায়।

ভদ্রমহিলা অলীকবাবুর মা। বছর খানেক আগে মারা গেছেন। নার্সের কথা শুনে তাঁর এখন মনে হচ্ছে, মা মারা গেলেও সন্তানের পীড়ার কথায় স্থির থাকতে পারেন নি, তাই পরলোক থেকে তিনি দেখতে এসেছিলেন ছেলেকে। এমনই মাতৃ-মমতা।

(১৪৪ পৃষ্ঠার পর)

কিন্তু তখনও বুঝি নি বিজনের হাতের আঁকিবুকি জ্যোতিষীর মত মানুষের মনের গহনের পরিষ্কার মানচিত্র বলে দেয়। মানুষের চিন্তা, মানুষের অন্তস্থলের বাসনা তার তীক্ষ্ণধী রেখায় অঙ্কের মত নির্ভুল প্রতিবিম্ব রচনা করে। ম্যাগনিফাইং গ্লাসের মত তার অন্তর্ভেদী দৃষ্টি তখনও আমাদের খেয়াল হয় নি। কিন্তু না হলেও, বিজন থট্ পেইন্টার ছিল, সে বিষয়ে কোন ভুল নেই। জাতিস্মরের মতই সে জন্মগত প্রতিভা নিয়ে এসেছিল আমাদের মধ্যে, আমরা তার অতিলৌকিক ক্ষমতাকে ইনস্যানিটি বলে ভুল করেছি।

আমাদের 'ক্লোজআপ' শেষ পর্যন্ত কিন্তু দাঁড়িয়ে গেল। প্রথম দিকের দু'চারটি ধাক্কা যা এসেছিল, বিজনের জন্যই এসেছিল, সেগুলি সামলে নিতে আমাদের বিলম্ব হলো না। তারপর কাজ আসতে লাগলো, প্রায় হু-হু করেই আসতে লাগলো। আমাদের অফিসে ফোন বসলো, স্টেনো এলো, বেয়ারা রামসদয় দরজায় মোতায়েন হল। বড় বড় কনসার্ন আমাদের দিয়ে বিজ্ঞাপনের লে-আউট করাবার জন্যে টেলিফোনে ধর্ণা দিতে থাকে। আমি আর পরেশ দু'হাতে সামলে উঠতে পারি না। বিজনকে দিয়েও কিছু কিছু কাজ যে না করানো হয় তা নয়, কিন্তু সম্পূর্ণ কোন দায়িত্ব তার কাঁধে চাপাতে ভরসা হয় না। কারণ আমাদের প্রতিষ্ঠানের সুনাম এখন এমন এক পর্যায়ে উঠেছে, সেখানে সবসময়ে সতর্ক সন্ত্রস্ত থাকতে হয়।

দিনের পর দিন এমনিভাবে চলছিল। স্কেল, কম্পাশ, তুলি, প্যালেট, কলম টেবিলের ওপরে ছড়িয়ে, রাশি রাশি স্কেচ পেপার আর ড্রইংয়ের মধ্যে ডুবে গিয়ে, ঢাকা ল্যাম্পের আলোয় চোখের দৃষ্টিকে তীক্ষ্ণ করে বসে থেকেছি ঘণ্টার পর ঘণ্টা, হাত চলেছে ক্ষিপ্র গতিতে। ইজেলের সামনে বসে ক্যানভাসে পিন আঁটতে আঁটতে আমাদের খেয়াল থাকে নি বিজনের কথা। একবারও মনে হয়

নি বিজন আমাদের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, ক্রমশ দূরে, অনেক দূরে। স্বাভাবিক জীবন থেকে অন্যদিকে, অন্য কোনখানে।

হয়তো আমাদের অজ্ঞানচেতন অবহেলায়, নয়তো বা নিজের অক্ষমতায় আত্মধিক্কারে বিজন আরও অস্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল। 'ক্লোজআপে' এখন কেবল কাজ আর কাজ, পয়সা আর পয়সা। সেই সান্ধ্য আড্ডা, সেই গোধুলি-আকাশ দেখার মেজাজ হারিয়ে গেছে কোনকালে। এখন কেবল বিজনেস্-টক আর তারই সিক্রেট নিয়ে মাথা ঘামানো।

বিজন অফিসে নিয়মিত আসে না, দেখা ক্বচিৎ কদাচিত হয়। সিঁড়িতেই বেশির ভাগ সময়। উস্কোখুস্কো চুল বিজন চলেছে, আধময়লা পোশাক, পাঞ্জাবির কোণায় রঙের ছিটে। পকেটে গোটাকতক তুলি হাতে স্কেচের খাতা। ভালো করে কথাই হয় না। কখন খায়, কখন ঘুমোয়, কোথায় বেড়ায় খবর রাখা হয়ে ওঠে না।

কিন্তু খবর বাতাসেও ভেসে আসে কখনো কখনো। যেমন বিজনের কথা ক্রমে ক্রমে শুনতে পেতে থাকলাম। এমন সব পাড়ায় বিজনকে দেখা গেছে, যা খুব শোভন নয়, সম্মানের নয়। আর্টিস্টের কোন জাত নেই। কিন্তু তা বলে ছবি আঁকার নেশায় জীবনকে বিপন্ন করার কোন মানে হয় না।

নিশীথ নগরী কলকাতা। দুপুর রাত থেকে রাত শুরু হয় এমনও জায়গা আছে। এমন হোটেল পানশালা আছে যার খবর প্রয়োজনের লোক ছাড়া রাখে না। ছবি আঁকার মালমশলা খুঁজতে বিজন সেখানে গিয়ে হাজির হয়েছে আমাদের জানা ছিল না।

পা টিপে টিপে যেখানে রাত্রি নামে। জীবন বাজী রেখে যেখানে চলে জুয়ার বেসাতি। বিদেশী চিত্রশিল্পীদের জীবন-কাহিনী আরব্য-উপন্যাসের মত। তুলির পাশাপাশি তাদের তরোয়াল খেলা

করেছে। মদে আর রক্তে যারা রঙ গুলে ছবি এঁকেছে সেইসব বেহুইন চরিত্রের ছবি আঁকিয়ের দলে কি শেষপর্যন্ত আমাদের কপর্দকশূন্য নিরীহ বিজন নিজের নাম লেখালো।

নূড স্টাডিতে মন দিয়েছে বিজন। তার ছবির খসড়ার বিপুলায়তন অ্যালবামখানা খুলে সেদিন টের পেলাম। নারী মূর্তিগুলি কেউ দাঁড়িয়ে, কেউ বসে, কেউ নাচের মুদ্রায়। কিন্তু তাদের মুখ ঝাপসা। চেনার উপায় নেই। কালনাগিনীর ফণার ঝাপট যেন। ধারালো চাবুকের মত এক একটি রেখার আঁচড়। বিজনের হাত এত ক্ষিপ্র, বিজনের চোখ এত ধারালো, বিজনের বুকে এত জ্বালা, জানা ছিল না।

বিজনের হাতের রেখা বদল হয়েছে মানতেই হবে। নেশায় বুঁদ হয়ে থাকলেও বিজন যন্ত্রণায় জ্বলছে, প্রতিঅঙ্গ দিয়ে জ্বলছে, টের পাওয়া যায়। আমি আর পরেশ খানিকটা শিউরে উঠলাম। এই যৌবন যন্ত্রণা আমাদের মধ্যেও সুপ্ত ছিল একবয়সে, কিন্তু প্রকাশের পথ পাই নি। যখন চারমিনার নিভিয়ে নিভিয়ে খেতাম, যখন লণ্ড্রীর বিল মেটাবার সাধ্য আমাদের থাকতো না অনেক সময়েই।

বিজন হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে, ধ্বংসের দিকে প্রলয়ঙ্কর জল প্রপাতের মত ছুটে চলেছে টের পেলাম। বেদনা বোধ করলাম মনে মনে।

তিনবন্ধুর একজন, যার ওপর আমাদের সবচেয়ে আশা-ভরসা ছিল, না, কমার্শিয়াল দিক থেকে নয়, বিশুদ্ধ শিল্পের দিক থেকেই। ভেবেছিলাম, বিজনের গভীর অন্তর্দৃষ্টি ক্রমে চিত্রকলার মধ্যে একটি অভূতপূর্ব দার্শনিকতা এনে দেবে। কিন্তু কোথায় কি। রক্তমাংসের জগতে, হিংসা-হননের মধ্যে, ক্লেদপঙ্কিল সামাজিক অপভ্রংশের মধ্যে বিজন জেগে উঠেছে।

আমাদেয় থ্রি-ইউনিটি, ভেঙে গেল এতদিন পরে। কক্ষচ্যুত উল্কার মত ছিটকে গেল বিজন। ফ্ল্যাটের চাবি তার কাছেও আছে

একটি। গভীর রাতে হয়তো আসে সেখানে ; যখন আমরা উত্তর কলকাতার বাসায় ফিরে ঘুমের তলায় তলিয়ে যাই। শীতের রাতগুলো এমনি করে পার করে দিচ্ছিল বিজন। মধ্য কলকাতার দু'একটি রাস্তায় তার ছবির মোবাইল একজিবিশান হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। দেখি নি, খবর পেয়েছি। কিছু কিছু ছবি নাকি বিক্রীও হয়েছে।

সস্তায় স্কেচ বিক্রী করছে বিজন। কখনও শুনি অদ্ভুত ধরণের মেয়েদের সঙ্গে তাকে ঘুরে বেড়াতে দেখা গেছে শহরের বিভিন্ন জায়গায়। রাত্রে শোবার সময়, ঘুমের আগে ওর কথা মনে পড়তো ভীষণভাবে, কিন্তু দিনের বেলায় অসংখ্য কাজের চাপে কোথায় হারিয়ে যেত বিজন। তাকে খোঁজবার কথা মনে থাকতো না।

অপ্রত্যাশিতভাবে আমি বিজনকে ধরে ফেললাম একদিন, একেবারে কিম্বদন্তী শুদ্ধু। আমি বসেছিলাম পর্দা-ফেলা একটি রেস্তোরাঁ-কেবিনের মধ্যে। এক ভদ্রলোকের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল, তাই একটু আগেই এসে বসেছিলাম। মেনু-কার্ড পড়ে সময় কাটাচ্ছিলাম এমন সময় পাশের কেবিনে কথা শুরু হল। প্রথমটা কান দিই নি, তবু কানে এসেছিল। পরে উৎকর্ণ হয়ে সমস্ত কথা-গুলিকে প্রায় গিলতে বাকি রেখেছিলাম।

'তোমার ছবিটা ইদানীং বড় ট্রাবল্ দিচ্ছে।'

'কোন্ ছবিটা ?'

'যে-টা একজিবিশান থেকে কিনেছিলাম।'

অপরপক্ষ অনেকক্ষণ চুপচাপ, যেন ছবিখানাকে মনের মধ্যে হাতড়ে বেড়াচ্ছিল এতক্ষণ।

'সেই প্যাঁচার ছবিটা ?'

'আহা, আর ক'খানা কিনেছি, বলো তো—'

'কেন, সেই ছবিটা আবার কি করল ?'

নারী কণ্ঠ এবার একটু উত্তেজিত মনে হল। বলল, 'প্যাঁচাটার জ্বালায় রাতে আমি ঘুমোতে পারি নে!'

বিজনকে এবার স্পষ্ট চিনলাম। তার গলা এবং বিষয়বস্তু এক হয়ে গেল, বলল, 'সো সরি! ওটা একটা অভিশপ্ত ছবির নকলে এঁকেছিলাম। একটা ফরাসী ছবি, ভ্যামপেয়ারের আত্মাকে আমাদের দেশী কালপেঁচার শরীরে চালান করতে চেয়েছিলাম, পেরেছি মনে হচ্ছে।'

'তোমার সৃষ্টির জন্যে তোমার আনন্দ হচ্ছে কিন্তু আমার অবস্থা অত্যন্ত কাহিল, কি কুক্ষণে যে ছবিটাকে পছন্দ করেছিলাম, উঃ, ভাবতেও গা-টা শিউরে ওঠে। আজ তিনদিন রাত্রে ঘুমোতে পারি না, জানো?'

মনে হল, অপরপক্ষ নীরবে তাকিয়ে আছে জিজ্ঞাসু চোখে। কারণ ভদ্রমহিলার গলা শোনা গেল আবার:

'ছবিটাকে শোবার ঘরের দেওয়ালে টাঙিয়ে ছিলাম। পেঁচাটাকে প্রথম থেকেই অত্যন্ত জীবন্ত মনে হয়েছিল কিন্তু রাত্রে যে সেটা কি পরিমাণ জীবন্ত হয়ে উঠতে পারে তা ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করি নি কখনো। শোবার আগে রাত্রে জামাকাপড় পরতে পরতে হঠাৎ নজরে এল ছবিটা। মনে হল দেয়ালের গায়ে নিশাচর পাখিটা অদ্ভুত উপায়ে বসে আছে, দুটি চোখ আমার দিকে। এক্ষুনি উড়ে এসে আমার গায়ে বসবে! কেন যে এমন ধারণা হল জানি না। আমি ভয়ে যেমন তাকাতে পারছিলাম না, তেমনি চোখ ফিরিয়ে নেওয়াও আমার সাধ্যের মধ্যে ছিল না।'

'কিন্তু পাখিটা তো আর সত্যিসত্যিই উড়ে আসে নি তোমার দিকে, তবে এত ভয় কেন, ছেলেমানুষী ভয়?'

'একে তুমি ছেলেমানুষী ভয় বলে উড়িয়ে দিতে পার, কিন্তু আমি পারি না। আমার কাছে এ এত সত্য যে, এই যে আমরা দুজনে বসে আছি এ যেমন মিথ্যে নয়, তোমার নাম বিজন

তালুকদার যেমন মিথ্যে নয়, তেমনি, এ আর প্রমাণ করতে হয় না।'

'নার্ভাসনেস্ থেকে এসব ভয় রোগের জন্ম, কিন্তু তোমার নার্ভ এত খারাপ হল কেন বলতে পারো?'

'যা খুশি বলো, প্রতিবাদ করব না। তবে এইটুকু অনুরোধ, আমার সবটুকু কাহিনী আগে শোনো। কি জানি কেন মনে হচ্ছে একথা বলবার আর সময় পাবো না আমি।'

'কি ছেলেমানুষী হচ্ছে সুপর্ণা, চল এবার ওঠা যাক, নইলে ছবিটা শুরু হয়ে যাবে, ঠিক তিনটে-পনেরোয় আরম্ভ—'

'সিনেমায় যেতে আজ ভালো লাগছে না বিজন, টিকেট তুমি বিক্রী করে দাও। আমার মন আজকে অত্যন্ত অস্থির আছে।'

'বেশ, কিন্তু তাহলেও তো এখন উঠতে হবে।'

'আমার কথা তাহলে তুমি শুনতে চাও না, বিজন?'

'কে বললে, চাই না? শুধু এখন নয়, এই বলেছি।'

'তোমার পাখি তুমি ফিরিয়ে নাও বিজন, ও রাত্রে আমাকে ঘুমোতে দেয় না। আচমকা ওর ডাকে আমার ঘুম ভেঙে যায়, কি বিশ্রী আর কর্কশ ওর কণ্ঠস্বর যদি শুনতে।'

চেয়ার টেবিলের শব্দ হল, কয়েকগাছা চুড়ি আর শাড়ির একটা মিশ্র আওয়াজ। ওরা উঠে গেল। মেয়েটিকে দেখবার জন্যে মুখ বাড়ালাম, কিন্তু মুখ দেখতে পেলাম না। পিছন থেকে ফিগারটা নজরে পড়ল, লম্বা, ছিপছিপে। কলাপাতা-সবুজ শাড়ি, ম্যাচকরা জামা। আধখানা চাঁদের মত পিঠের ওপরের অংশটুকু অনাবৃত, নিটোলশুভ্র ঘাড়, সতেজ রজনীগন্ধার মত। বিজনের পিছু পিছু বেরিয়ে গেল।

একটা নিশ্বাস ফেলে হাতঘড়ির দিকে তাকালাম, চায়ের কাপে দীর্ঘবিস্মৃত চুমুক দিলাম একটা, তারপর দ্বিতীয় দফা মেনুকার্ড পড়তে লাগলাম। বিজন কি এই মেয়েটির প্রেমে পড়েছে? কি

জানি, ছবির অ্যালবামের আঁকিবুকির মধ্যে এই তরুণীটিকে দেখেছি বলে তো মনে পড়ে না।

তোমার পাখি তুমি ফিরিয়ে নাও বিজন—মেয়েটির করুণ ভাঙা-ভাঙা কণ্ঠস্বর ঘুরে ঘুরে কানের মধ্যে বাজছে। মেয়েটির সমস্যা ভাববার চেষ্টা করলাম, যেটুকু ও বলে গেল। যদি সত্যি হয়, কিন্তু সত্যি হওয়া কি সম্ভব? বিদেশী রহস্য গল্পের মত, কিরকম একটা আধা ভূতুড়ে অবিশ্বাস্য গন্ধ রয়েছে এর মধ্যে। কুয়াশা আর বরফের দেশে যে প্রেততুল্য অনুভব বেঁচে থাকা সম্ভব, আমাদের বিষুবরেখার দেশে, টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরির কলকাতা শহরে সেই পশ্চিমী আরব্যরজনী সম্ভব কি? উঁচু গলায় একা-একা হাসলাম। বেয়ারা ছুটে এসে পর্দা সরিয়ে বলল, 'সাব?'

বললাম, 'কুছ নেই ; সব ঝুটা হ্যায়।'

পরের অংশটুকু ও চলে গেলে। অ্যাপয়েন্টমেণ্ট টিকলো না। ভদ্রলোকের মুণ্ডুপাত করে উঠে পড়লাম। চায়ের দাম দিয়ে মেট্রোর দিকে পা চালালাম যদিই বিজনের দেখা পাওয়া যায়। কারণ তিনটে পনেরোয় একমাত্র ওখানেই ছবি আরম্ভ হয়।

একগোছা নানা ছাঁদের তুলি একটা ফ্লাওয়ারভাসের মধ্যে বসানো ছিল। শিল্পীর ফুলদানী এটিই। শীতের সকালের প্রথম রোদের ছোঁয়ায় যখন তুলির ডগাগুলো নানা রঙের মরশুমী ফুলের মত জ্বলে ওঠে তখন আমি বিছানা থেকে উঠি। জীবিকায় সব খেয়েছে কিন্তু এই মেজাজটুকুকে অন্তত খেতে পারে নি।

আজও সেই দিকে তাকিয়ে ঘুম ভাঙল। এঘরে ঘড়ি নেই, ঘড়ি রাখি নি, ওয়ালক্লক, টাইমপিস, রিস্টওয়াচ; কিছুই না। চাকর বারবার এসে উঁকি দিয়ে যায়, তুলিতে রোদ লাগলে তবে প্রথম ক্ষেপ চা আসবে। আমি চায়ের প্রতীক্ষা করছিলাম এবং খবর কাগজের, কোনটাই এলো না, শুধু খবর এলো। ভিজিটিং

কার্ড একখানা। ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর সত্যেন ঘোষাল এসেছেন আমার সঙ্গে দেখা করতে। বিস্ময়ের কারণ বৈকি। যার সঙ্গে যাই থাক, পুলিশ আর ডাক্তারের সঙ্গে আমার কোনকালেই দহরম-মহরম ছিল না। তাছাড়া এই প্রাতঃস্মরণ নিশ্চয়ই কোন জরুরী প্রসঙ্গে। প্রায় ছুটতে ছুটতে নিচে এলাম, চোখে-মুখে জলস্পর্শ না করে।

সাদা ইউনিফর্ম পরা ভদ্রলোকটি তখন আমার বৈঠকখানা-ঘরের দেয়ালের ছবিগুলো ঘুরে ঘুরে দেখছিলেন। আমাদের তিনজনের হাতের কাজই তিনদিকের দেওয়ালে টাঙানো ছিল। আমার পায়ের শব্দে ঘুরে দাঁড়িয়ে তিনি নমস্কার করলেন, 'সকালে বিরক্ত করতে এলাম, কিছু মনে করবেন না।'

আমি বললাম, 'আপনি শখ করে যে আমাকে বিরক্ত করতে আসেন নি তা জানি, সুতরাং ভণিতার প্রয়োজন কি, কি ব্যাপারটা বলুন তো!'

ভেবেছিলাম ক্ষুণ্ণ হবেন, কিন্তু না, ভদ্রলোক হাসলেন আমার কথার উত্তরে। পরে আমাকে অবাক করে দিয়ে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'আমাকে চিনতে পারছিস না? আমি ওরিয়েন্টাল সেমিনারীর সতু, থার্ড বেঞ্চের ফোর্থ বয়!'

'সতু, তুই!' আমি ওর হাতটা সাদরে জড়িয়ে ধরলাম, 'চেহারার একি পরিবর্তন! সেই ডিগডিগে চেহারা কোথায় লুকিয়ে ফেললি রে! ওঃ, কতকাল তোর সঙ্গে যোগাযোগ নেই! তারপর কোথায় আছিস, কেমন আছিস? চল, চল ওপরে চল—'

'পনেরো বছরে অনেক পরিবর্তন হয়েছে পৃথিবীর, সত্যেন ঘোষালের সে তুলনায় সামান্যই। তবে অনেকদিন দেখা নেই তাই চিনতে পারিস নি।'

সতুকে ওপরে নিয়ে এলাম। একসঙ্গে চা খেতে খেতে অনেক গল্পই হল। দেখলাম, ও আমার অনেক খবরই রাখে···বিশেষ করে

ক্লোজআপ সম্বন্ধে। পরেশ আর বিজনের কথাও জিগ্যেস করল কথা প্রসঙ্গে। জানালাম তারা আমার পার্টনার। থার্ড বেঞ্চের ফোর্থ বয় সম্বন্ধে তাদের কাছেও ইতিপূর্বে গল্প করেছি তা জানালাম। কারণ সতুর ওই নামকরণের পিছনে একটি কৌতুককর ইতিহাস ছিল।

চা শেষ হলে সতু বলল, 'এবার আসল কথা বলি, আমার সঙ্গে চল একজায়গা থেকে ঘুরে আসবি। নিজের স্বার্থেই তোকে ডাকছি। একটা ইনভেস্টিগেশনে এসেছিলাম এই দিকেই। ব্যাপারটা অবশ্য খুবই স্যাড, তবু তুই গেলে খুশি হবো, কারণ তুই একজন আর্টিস্ট।'

'কারণ আমি আর্টিস্ট। তার মানে?'

'যথা সময়ে এবং যথাস্থানেই বুঝতে পারবি, এখন চল।'

পরেশের ঘুম না ভাঙিয়ে আমি একাই সত্যেন ঘোষালের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। কোন একটা রহস্যজনক কিছু ঘটেছে এ অনুমান করা আমার পক্ষে অসম্ভব হল না। কিন্তু আমার মনের মধ্যে কৌতূহল যতই তোলপাড় করুক, সতু একেবারে নির্বাক। ঘটনাস্থলে পৌঁছবার আগে কিছুতেই মুখ খুলল না।

ঘটনাস্থল বলতে গেলে আমাদের পাড়ার কাছেই। ছোটখাটো একটা তিনতলা বাড়ি। বাইরে থেকে খুব চাপা মনে হয়। তবু খবর চাপা ছিল না। দু-চারজন কৌতূহলী রবাহুতের ভিড় ওই সকালেই দাঁড়িয়ে গিয়েছিল পথের ওপর। দরজায় কনস্টেবল মোতায়েন থাকায় ভেতরে কেউ মাথা গলাতে পারে নি।

দরজার পাহারা আমাদের দেখে সসম্ভ্রমে সেলাম করে পথ ছেড়ে দিল।

ভেতরে একটি ছোটখাটো জনতা। প্রেস ফটোগ্রাফার-রিপোর্টার থেকে শুরু করে ডাক্তার, পুলিশের ক্যামেরাম্যান, বাড়ির

লোকজন অনেকেই ছিল। দোতলার ঘরের সামনের ভিড় ফাঁক হয়ে গেল আমাদের দেখে। আমি আর সতু ঘরের মধ্যে ঢুকলাম।

দরজার পাশে সাদা-পোশাকে পুলিশের একজন লোক ছিলেন। সতু তাকে চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল, 'এনিথিং মোর ?'

ঘাড় নেড়ে 'না' জানাল লোকটি। ঘরের মধ্যে নজর দিলাম এতক্ষণ পরে। সঙ্গে সঙ্গে শিউরে উঠলাম।

ঘরখানা ছোট। তার অর্ধেক জুড়ে একখানা পালঙ্ক। সামনে দেয়াল ছুঁয়ে ড্রেসিং-টেবিল। পালঙ্কে ঠেসান দিয়ে একটি মেয়ে বসে আছে মাটির ওপর। মুখে আতঙ্কের চিহ্ন, চোখ দুটি বড় বড় হয়ে বেরিয়ে এসেছে। মুখখানা শঙ্খের মত সাদা। ঘাড়টা একটু কাত হয়ে পড়েছে। ড্রেসিং গ্লাসে ছায়া পড়েছে। একটা পা সামনের দিকে ছড়ানো, হাঁটুর ওপর পর্যন্ত কাপড় উঠে গেছে, অন্য পা মুড়ে বসা। চেহারার ধরণ দেখেই বুঝলাম মেয়েটি মারা গেছে।

সতু আমাকে ডেডবডির কাছে ডাকল। এগিয়ে গেলাম। আহা, মেয়েটির চেহারা বড় সুন্দর, ছিপছিপে, লম্বা ফিগার। চুলের রাশ মুখের চারপাশে ছড়ানো। শুতে যাবার আগের পোশাক পরা। পায়ের কাছে একখানা বাঁধানো পটের মত কি পড়ে আছে। ঝুঁকে পড়ে ছবিটা দেখেই চমকে উঠলাম। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শরীরে বিদ্যুৎ চমক খেলে গেল। 'তোমার পাখি তুমি ফিরিয়ে নাও বিজন।'

সতু আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। বলল, 'কি হল, এই প্যাঁচার ছবিটা তুমি চেনো নাকি ?'

আমি ঘাড় নেড়ে বললাম, 'ভদ্রমহিলা কি মারা গেছেন ?'

'অনেকক্ষণ। ছবিটা কার আঁকা জানো ?'

আমি বললাম, 'নাম সই নেই ?'

'না। অথচ ছবিটা একটু স্ট্রেঞ্জ। এবং এই মৃত্যুর সঙ্গে হয়তো

জড়িত।'

'কি করে বুঝলে?'

হার্টফেল করে মেয়েটি মারা গেছে। চোখে-মুখে উত্তেজনা ও ভয়ের চিহ্ন তো মুছে যায় নি দেখতেই পাচ্ছো। পাশে কাচ-ফাটা অবস্থায় ছবিখানা এই ভাবেই পড়েছিল। তা থেকে অনুমান করা যেতে পারে এই ভয় পাওয়ার পিছনে ছবিটার কোন ভূমিকা ছিল। দেওয়ালের ছবি মাটিতেই বা পড়তে গেল কেন?

'শুধু এইটুকু দেখে তুমি এই সিদ্ধান্ত করছ?'

'না। মৃতের চোখের দিকে তাকাও। দৃষ্টিটা কোন দিকে দেখ!'

'দেওয়ালের দিকে, অনেকটা উঁচুতে।'

'ওখানে কি কিছু দেখতে পাচ্ছো?'

'কই, কিছুই তো দেখতে পাচ্ছি না। অবশ্য যদি এই ছোট পেরেকটার কথা তুমি ধর্তব্যের মধ্যে আনতে চাও—'

'ঠিক তাই। ওই পেরেক এই মৃত্যুর দিকে আঙুল বাড়িয়ে রয়েছে।'

'আমি কিছুই বুঝতে পারছি নে।'

'একটু বুদ্ধি খরচ করলেই পারবে। পেরেকটা ভালো করে ছাখো তো, ওটা সম্বন্ধে যা যা দেখছ এবং মনে হচ্ছে, বলে যাও।'

আমি কিছুক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলাম পেরেকটা, তারপর মেয়েটির চোখের দিকে, হাতের দিকে বার-দুই তাকালাম। তারপর একটু ইতস্তত করে বললাম, পেরেকটা দেয়ালে নতুন গাঁথা হয়েছে। পেরেকের আয়তন দেখে মনে হচ্ছে কোন ছবি-টবি টাঙাবার জন্যেই ওটিকে পোঁতা হয়েছিল। এবং সম্ভবত পেঁচার ছবিটি ওখানেই ছিল এবং সেই ছবির দিকে মেয়েটি তাকিয়ে ভয় পেয়েছিল। কারণ তোমার ভাষাতেই বলি, ছবিটা একটু স্ট্রেঞ্জ ধরণের। একটু বেশি মাত্রায় জীবন্ত। তাছাড়া চোখের মণিকে

যে রঙ ব্যবহার করা হয়েছে, এই রঙ রাত্রে জ্বলে, তাছাড়া চোখের মণির ইনার্ ডিজাইন এমনভাবে করা হয়েছে যে দেখলেই মনে হবে মণিটা ঘুরছে।

'এক্সেলেন্ট, এইজন্যই তোমাকে এনেছি হে। এবার ছবিটার ইতিহাস বলো। ওটা কার আঁকা বলে মনে হয়? নিশ্চয়ই তোমার বা তোমাদের গ্রুপের কারো নয়?'

'আমার নয় তা আমি জানি। তবে আমাদের গ্রুপের কারো হলেও হতে পারে। এ ধরণের রেখা আর রঙের ব্যবহার আমাদের মধ্যে একজনই করতে পারে, এবং করে থাকেও—এইটুকু মাত্র বলতে পারি।'

'তাঁর নাম?'

'বিজন তালুকদার।' আমি ইচ্ছে করেই গত কালকার কাহিনী গোপন রাখলাম।

'পার্টনার? মিস্টার তালুকদারকে এখন কোথায় পাওয়া যেতে পারে?'

'হ্যাঁ, ক্লোজআপ-এর পার্টনার। কিন্তু তাকে কখন কোথায় পাওয়া যাবে আমার পক্ষে বলা শক্ত।'

'কার কাছে গেলে তবে সঠিক হদিশ পাওয়া যেতে পারে?'

'কেউই বলতে পারবে না। খেয়ালী মানুষ, সংসারে পিছুটান নেই। তুলি রঙ আর কাগজের মধ্যেই ও নিজের ফ্যামিলি খুঁজে পেয়েছে। ওর আঁকা ছবি নিয়েই ওর সংসার।'

'স্ট্রেঞ্জার দ্যান ফিকশান। ওঁর সঙ্গে তোমার কত দিনের পরিচয়? ব্যবসা সূত্রে?'

'ছাত্রাবস্থা থেকেই। কিন্তু ওর সম্বন্ধে তুমি এত কথা জিজ্ঞেস করছ কেন বলো তো? ও কিন্তু সত্যিই খুব ভালো মানুষ, আলাপ হলেই বুঝতে পারবে। এবং প্রতিভাবান—'

'কিছু মনে করিস না, সতু আবার সহজ অন্তরঙ্গ সম্বোধনে ফিরে

এল, 'বিজনবাবুকে আমি সন্দেহ করছি না। কিন্তু এই মৃত্যুটা হৃদ্‌যন্ত্রঘটিত হলেও আমি এর মধ্যে একটু অস্বাভাবিকত্বের গন্ধ পাচ্ছি। আর তাই বিজনবাবুর খোঁজ করছি, যদি তাঁর মুখ থেকে কোন আলোর সন্ধান পাই। আচ্ছা, এই ছবিটায় বিজনবাবু নাম সই করতে ভুলে গেছেন কেন বলতে পারিস।'

'বিজন তার কোন ছবিতেই নিজের নাম লেখে না।' ও বলে, আর্টিস্টের নাম তার রঙ আর রেখাই বলে দেবে, তার চেয়ে দেখার ভঙ্গি। তুই ভবিষ্যতে নামকরা গোয়েন্দা হতে পারবি, ধরণধারণ দেখে এই ভবিষ্যৎবাণী করলাম, মিলিয়ে নিস।'

সতু কৃতার্থের হাসি হাসল, 'ফরেনে গিয়েছিলাম এই অপরাধ-বিজ্ঞানটা হাতে-কলমে আয়ত্ত করতে—তা তোদের আশির্বাদে দেখাই যাক না কি ফল ফলে—'

আমি বললাম, 'রসিকতা করছিস না ঠাট্টা করছিস বুঝতে পারলুম না। তবে বিজনকে একটা জায়গায় বোধ হয় এখন পেলে পেতে পারিস। চল, আমি সঙ্গে যেতে পারি।'

সতু লাফিয়ে উঠল, 'এখুনি, এই মুহূর্তে। চল—'

সহকর্মীদের যথারীতি নির্দেশ দিয়ে সতু আমাকে নিয়ে উঠে পড়ল। ওর মোটর-বাইকে করে আমরা পার্ক স্ট্রীটে ক্লোজআপের উদ্দেশে রওনা হলাম। কিন্তু আমাদের ছোটাছুটিই সার হল, ক্লোজআপের ফ্ল্যাট বন্ধ। বিজন সেখানে নেই। বোধ হয় গতরাত্রে শুতে আসে নি।

আমার কাছে চাবি ছিল অফিসের। সতুকে আমাদের স্টুডিওতে নিয়ে গিয়ে বসালাম। এইবার ধীরেসুস্থে ওর মুখে মেয়েটির ইতিহাস শুনলাম। মেয়েটির নাম সুপর্ণা সেন। চিত্রজগতের সাম্প্রতিক আবিষ্কার। অর্থাৎ প্রতিভাবান—ব্যাকরণ ভুল হল—চিত্রতারকা। ওর কোন ছবিই এখনো মুক্তি পায় নি, একসঙ্গে তিনটি ছবিতে কাজ করছিল সুপর্ণা। কোনটি অর্ধেক, কোনটি

বারো আনা, কোনটি ছ' আনা মাত্র তোলা হয়েছে। সুতরাং জনা-তিনেক প্রোডিউসারকেই সুপর্ণা একেবারে ডুবিয়ে দিয়ে গেল। নায়িকার অকালমৃত্যু অন্তত বাইরের দর্শক বুঝবে না। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে মাত্র মাস দুই আগেও ইন্সিওরেন্সের যে মেডিকেল রিপোর্ট লেখা হয়েছিল, তাতে সুপর্ণা সেনের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত বিবরণ লেখা হয়েছিল, অবশ্য ডাক্তারী ভাষায় যতখানি উচ্ছ্বাসের অবকাশ থাকা সম্ভব।

সুপর্ণা সেন চিত্রতারকা হলেও তার মধ্যে কালচারের চিহ্ন যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। সে লেখাপড়া জানত, অন্তত কলেজের পড়া তার শেষ হয়েছিল। কিন্তু তার প্রাইভেট স্টাডির নতুন করে শুরু হয়েছিল। সত্যেন ঘোষাল নানান রিপোর্ট থেকে এবং সেই প্রোডিউসারদের একজনের হাহাকার বাণী থেকে এই সব তথ্য সংগ্রহ করেছিল। এবং সেগুলি দ্বিতীয় দফা চা-পান করতে করতে আমাকে সমস্তই খুলে বলল।

সংসারে সুপর্ণার এক প্রৌঢ় বয়সী বিপত্নীক এবং নিঃসন্তান মামা আর এক বিধবা পিসি ছাড়া কেউ ছিল না। এঁরা দুজনেই এই বাড়িতে বাস করতেন। মামা মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ, কোন খ্যাতনামা ওষুধের কোম্পানীর। রোজগার মোটামুটি ভালই। গান বাজনার দিকে, বিশেষ করে বাজনার দিকে ভদ্রলোকের খুব ঝোঁক। তিনি ভাল ভায়োলিন বাজান, সখের বাজিয়ে হিসেবে কলকাতায় অনেক পাড়াতেই তাঁর নাম আছে। পিসি স্কুল মিস্ট্রেস, কোন কিণ্ডারগার্টেন স্কুলের শিক্ষয়িত্রী। ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে মশগুল হয়ে থাকেন।

তিনজনের মধ্যে সম্পর্ক অতি মধুর ছিল। একসঙ্গে খাওয়া এবং গল্প করা তাঁদের অভ্যাস ছিল। পিসি এবং মামা দুজনেই সুপর্ণাকে নিজের মেয়ের মত ভালবাসতেন। আর সুপর্ণাকে যে দেখেছে সেই ভালবেসেছে (এমন কি বিজনও, আমি মনে মনে বললাম)।

বাড়িটা সুপর্ণার বাবার। ব্যাঙ্কে কিছু গচ্ছিত অলঙ্কার এবং অর্থও রয়েছে, সুতরাং সে পরমুখাপেক্ষী ছিল না।

অভিনয়, গান, বাজনা, আবৃত্তি ইত্যাদির দিকে তার ছোটবেলা থেকেই প্রচণ্ড উৎসাহ ছিল। বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় কৃতিত্ব দেখিয়ে অনেক পুরস্কার পেয়েছে স্কুল জীবন থেকেই। এছাড়া আর একটি গুণ ছিল তার, লুকিয়ে লুকিয়ে ছবি আঁকতো। সাহিত্যের প্রতি যেমন অনুরাগ ছিল, তেমনি চিত্রকলা সম্বন্ধেও। এই প্রসঙ্গেই অনেক গুণী এবং অপগুণীর সমাগম হত মাঝে মাঝে। অনেকসময় অনেক অসুবিধের মধ্যেও পড়তে হয়েছে তাকে এই গুণমুগ্ধতার জন্যে। সব শেষে একটি যুবক খুব আসা যাওয়া করত, সুপর্ণার মামার অভিমত অনুযায়ী একটু অদ্ভুত গোছের লোক। ছেলেটি চিত্রকর, প্রচলিত ধরণের চিত্রকর নয়। অনেকদিন মুখোমুখি দেখা হয়েছে তাঁর, কিন্তু ছেলেটির নাম জিজ্ঞেস করা হয়ে ওঠে নি। তবু এই ছেলেটিই যে বিজন তা অনুমান করতে আমাদের বিশেষ কষ্ট হল না।

বিজনের পরিবর্তন সম্বন্ধে আমি সতুকে কিছু-কিছু তথ্য দিলাম। তারপর ওর মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম.'সমস্ত কেসটাকে তুই কোন দিক থেকে দেখছিস বল তো? আর বিজনকেই বা এর সঙ্গে কি পরিমাণ জড়িত বলে মনে করছিস?'

সত্যেন পুলিশের ঈষৎ হোমরা-চোমরা হলেও তার গায়ে পুলিশের গন্ধ নেই। সে আমার বাল্যবন্ধু। থার্ড বেঞ্চের ফোর্থ বয়, তার গায়ে মেদমজ্জা লেগেছে সত্যি, চেহারায় জৌলুষ এসেছে, ওরিয়েন্টাল সেমিনারীর স্পর্শ এখনো লেগে আছে। তাই বন্ধুভাবেই সব বললাম, এমন কি সেদিনের রেস্টুরেন্ট-সংবাদও দিলাম।

অনেকক্ষণ চিন্তা করে সত্যেন বলল, 'এটা সুইসাইড নয়, মার্ডার তাও বলা চলছে না। অথচ নার্ভাস ব্রেকডাউনের ফলে ন্যাচারাল কোর্সের হার্টফেল তাও নয়। প্রশ্ন হচ্ছে তবে এটা কি? পোস্ট-মর্টেমের আগে সেকথা বলা শক্ত, তবে ডাক্তারের পরীক্ষায় প্রাথমিক

রিপোর্ট অনুযায়ী আমি যে দুটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি তার একটি হচ্ছে, কোনরকম মেণ্টাল শকের ফলে সুপর্ণার মাথার একটু গোলমাল দেখা দিয়েছিল, সেই শকটি কি তা আমাদের আবিষ্কার করতে হবে। এবং এরই ফলে অদ্ভুত উদ্ভট চিন্তা তার মাথায় খেলা করত রাত্রিবেলায়। শিল্পের মধ্যে বিশেষ করে ছবির মধ্যে তন্ময় হয়ে যাবার স্বভাব ওর বরাবরই ছিল। ফিল্মের কর্তাদেরও রিপোর্ট তাই। কোন কোন সেটে কাজ করবার সময় সুপর্ণা আত্মবিস্মৃত হয়ে যেত। একটা ভূতুড়ে ছবি 'ছায়াময়ী', যেটিতে সে মরবার আগের দিন সকালেও ইনডোর অ্যাপিয়ারেন্স দিয়ে এসেছে, সেখানকার স্টুডিও রিপোর্ট আমি টেলিফোনে পেয়ে গিয়েছি।'

একটানা অনেকক্ষণ কথা বলে সাসপেন্সের মুখে এসে সত্যেন থামল। আমি জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে বললাম, 'হুঁ—'

সত্যেন বলল, 'উঁহু। সে-কাহিনী এখন নয়, সেটা এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণও নয়। সুতরাং অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় দুটো ব্যাপার ঘটতে পারে সুপর্ণার ক্ষেত্রে, এক, তাকে হত্যার চেষ্টা—ভয় দেখিয়ে অবশ্যই। দুই, কোন সুপারন্যাচারাল স্ট্রোক টু ডেথ। কিন্তু অলৌকিকে পুলিশ এবং আমি অবিশ্বাসী হতে বাধ্য। ফরমুলায় যাকে আনা যায় না, তাতে আমাদের ফেথ নৈব নৈব চ। তবু সেই সূত্রেই বিজনকে আমরা মনে করতে বাধ্য। কারণ তোর কথা অনুসারে এবং এতক্ষণ ওর স্কেচ ডায়েরী এবং অ্যালবাম দেখে মনে হল বিজন সত্যিই থট পেইণ্টার। সে যে কেবল মনের ছবি আঁকে তাই নয়, মনের চিন্তাকেও সে ডেভেলাপ করতে জানে। তার হাতের রেখা এবং রঙ ফটোগ্রাফারের ডার্করুমের স্পেশাল সলিউ-শনের মত। নেগেটিভকে, অন্ধকার রহস্যকে, পজেটিভে, আলোর-ভাষ্যে ফুটিয়ে তোলে। বিজন ইচ্ছে করলেই অনেকের মনের ভয়-ভীতি-ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে রঙিন করে দিতে পারে, উদ্দীপ্ত করে তুলতে পারে।'

'কিন্তু সুপর্ণাকে হত্যা করে বিজনের লাভ কি ?'

জিভ কেটে সত্যেন বলল, 'বিজন সে চেষ্টা করেছে এ-কথাই আমরা ভাবছি না। যে সুপারন্যাচারাল স্ট্রোকের কথা বললাম, সেই প্রসঙ্গেই বিজনের ছবির কথা এল। একটা সোর্স তো চাই, তা অলৌকিক হলেও।'

'তাহলে যে মার্ডারের কথা হল, সেবিষয়ে তুমি কাদের সন্দেহ কর ?'

'কাউকেই না। কেউ যদি ভয় দেখিয়ে থাকে, কে দেখিয়েছে আমরা জানি না। তবে সুপর্ণার মৃত্যুতে কাদের লাভ হয়, হতে পারে, আমরা একটু খতিয়ে দেখব বৈকি। বাইরের ব্যবসায়ী দৃষ্টিতে যতখানি দেখা যায়, সুপর্ণার মৃত্যুতে বিজনের লাভ নেই। অবশ্য এখনও জানি না, কোন ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন তার সঙ্গে সুপর্ণার হয়েছিল কিনা। পিসিমা এবং মামা বাকি থাকেন। ইনসিওরের টাকা এবং কনট্রাক্টের টাকা, বাড়ি, পৈতৃক ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স এগুলি অবশ্য তাঁদের দুজনের ওপরেই আইনত বর্তায়। কিন্তু তাঁরা নিঃসন্তান, এবং শেষবয়সী। তাঁদের কাছে এই অর্থ ঐশ্বর্যের যথাযথ কোন মূল্য নেই, লোভের কারণও নেই। কারণ প্রথমত তাঁরা মেয়ের মত ভালোবাসতেন সুপর্ণাকে, দ্বিতীয়ত তাঁরা দীর্ঘকাল নিজেরা রোজগার করছেন। অভাব অনটন বা দেনা কিছুই তাঁদের নেই।'

'সুতরাং,' আমি আর অন্যতর কোন মীমাংসা খুঁজে পেলাম না।

'সুতরাং' সত্যেন বলল, 'অন্য কোনরকমের স্বার্থ সিদ্ধ হয়, এমন লোকেদের তালিকা আমাদের প্রয়োজন।'

'অন্য কোন রকমের স্বার্থ ?' আমি অবাক হই।

'প্রতিহিংসা চরিতার্থ হওয়া বা ওই ধরনের কোন কিছু আর কি। কোন পুরুষবন্ধুবান্ধব বা পানিপ্রার্থীর নামধামবিবরণ আমাদের জানা নেই। তাঁদের মধ্যে আর কোন বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয় এবিষয়ে

অগ্রণী হতে পারেন। কিন্তু আমাদের তাকাতে হবে তার আগে ট্রেড-লাইনের দিকে। অর্থাৎ ফিল্ম কোম্পানীগুলির দিকে। সেখানে এই নবাগত চিত্রতারকা খসে গেলে কোথায় কি পরিমাণ আকর্ষণ বিকর্ষণ ঘটে। আমরা—'

সিঁড়িতে একপ্রস্থ পায়ের শব্দ শোনা গেল। এবং সেই পদধ্বনিকে অনুসরণ করে যে উদ্‌ভ্রান্ত আগন্তুকের আবির্ভাব ঘটল, তার চুল উস্কো-খুস্কো, বেশবাস আধময়লা, অবিন্যস্ত। মুখে কয়েক দিনের বাসি দাড়ি। চোখ দুটি রাত্রি জাগরণে পীড়িত, অবসন্ন।

আমি চিৎকার করে উঠলাম, 'বিজন, তুমি এসময়ে!'

বিজন একমুহূর্ত থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে ভিতরে ঢুকে এল। কোন কথা বলল না। স্টুডিওর মধ্যে ঢুকে কি যেন খুঁজতে লাগল। আমি আর সত্যেন তার পিছন পিছন স্টুডিও ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়ালাম।

আঁকা ছবিগুলি ছড়িয়ে ছিটিয়ে তখনও বিজন কি যেন খুঁজে চলেছে।

বললাম, 'কি খুঁজছো বিজন, কি হয়েছে তোমার?'

'একটা ছবি খুঁজছি,' বিজন বলল, 'কোথায় রেখেছি খুঁজে পাচ্ছি না।'

আমি এগিয়ে গেলাম, 'প্যাঁচার ছবি নয় তো?'

উদ্যত ছুরির ফলার মত আচমকা বিজন অন্য মূর্তিতে ঘুরে দাঁড়াল। আমি কি বলব ভেবে পেলাম না। সত্যেন আমাকে বিভ্রান্ত অবস্থা থেকে মুক্তি দেবার জন্য প্রসঙ্গান্তরে এনে ফেলল।

'মিস্টার তালুকদার, আমি আপনার সঙ্গে পরিচিত হবার জন্যে এখানে ছুটে এসেছি। যদি কিছু মনে না করেন তাহলে আত্মপরিচয় দিই—আমি আপনার বন্ধুর বাল্যবন্ধু, নাম সত্যেন ঘোষাল।'

বেশ রুক্ষ ভঙ্গিতেই বিজন জবাব দিল, 'আসল পরিচয়টা গোপন রাখার প্রয়োজন কি, বলেই ফেলুন না আপনার পেশাটা।

পুলিশের লোক কারও বন্ধু হয় না—তা বাল্যবন্ধু।'

সত্যেন সহিষ্ণু হাসি হেসে বলল, 'থাক, থাক, হয়েছে, আর লজ্জা দেবেন না, আত্মপ্রশংসা শুনতে অস্বস্তি লাগে। আমি ছবি সম্বন্ধে কিছু—'

বিজন অট্টহাসি হেসে উঠল, 'কালোয়ারও কালোয়াত হয়, পুলিশের শখ চিত্রকলায়, শেষটুকুতে অবিশ্বাস নেই, কিন্তু চিত্র? চলচ্চিত্র ছাড়া আর কিছু দেখেছেন জীবনে?'

আমি মনে মনে অধৈর্য এবং অসন্তুষ্ট হয়ে উঠছিলাম বিজনের অভদ্র ব্যবহারে, এবার আর চুপ করে থাকতে পারলাম না।

বললাম, 'অন্তত একখানা বিখ্যাত ছবি উনি দেখেছেন—'

ও অবাক হয়ে আমার দিকে চোখ তুলে তাকাল।

আমি শেষটুকুও এবার ছাড়লুম, 'একটি প্যাঁচার ছবি। যাক, তুমি নবাগত চিত্রতারকা সুপর্ণা দেবীকে চিনতে?'

আমার কথার এমন প্রতিক্রিয়া হবে ভাবি নি। বিজন প্রথমে একটু চমকে উঠল, তারপর একেবারে নিষ্প্রভ হয়ে গেল। ভেতরের দারুণ যন্ত্রণা যেন চাপতে চেষ্টা করছে, কিছুক্ষণ কথা কইতে পারল না। আমি ভাবলাম, এতখানি আঘাত ওকে না দিলেই হত।

বিজন অবশেষে বলল, 'হ্যাঁ, চিনতাম।' সত্যেনের দিকে ফিরে পরে বলল, 'সুপর্ণা সেনকে আমি ভালোবাসতাম, তবে চিত্রতারকা হিসেবে নয়। সুপর্ণা ছিল আমার ছবির অন্ধ ভক্ত, কোথাও কোন প্রদর্শনীতে আমার ছবি দেখলেই তার কেনা চাই। এই ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্য দিয়েই আমাদের পরিচয়। সুপর্ণা সত্যকার শিক্ষিতা ছিল, তার রুচিরসবোধ আমি সচরাচর মেয়েদের মধ্যে দেখি নি। কিন্তু তার চরিত্র কেমন ছিল, আমার সঙ্গে তার অবৈধ সম্পর্ক ছিল কিনা, দোহাই আপনাকে, ঐ ধরনের প্রশ্ন আর আমাকে করবেন না—আই অ্যাম ফেডআপ উইথ দিস সিলি কোশ্চেনস—'

দু'হাতের মধ্যে মুখ গুঁজে বসে পড়ল। মনে হল এতক্ষণ শক্ত

হয়ে ছিল যে লোকটা, এইবার সে একেবারে ভেঙে গলে ঝরে পড়বে। বুঝতে পারলাম একটু আগেই সুপর্ণাদের বাড়িতে গিয়েছিল বিজন, এবং সেখানে নানাবিধ প্রশ্নের জবানবন্দী দিয়ে আসতে হয়েছে তাকে।

সত্যেন বিজনের কাঁধে হাত রাখল সোফার পাশে উঠে গিয়ে, 'এত সফট্ হলে পুরুষ মানুষের চলে, বিজনবাবু! বিশেষত আপনাদের আর্টিস্টদের। আপনারা হবেন অপারেশন টেবিলের ডাক্তারের মত অকম্পিত। অপরের সুখ দুঃখ ব্যথা বেদনা নিয়েই যদিও আপনাদের কারবার—'

বিজন কিছুক্ষণ কোন কথা বলল না, তারপর সহজ হয়ে সম্পূর্ণ অন্য গলায় বলল, 'আপনি ঠিক বুঝবেন না আমার দুঃখটা, এই মৃত্যুর জন্যে আমিই প্রকারান্তরে দায়ী। আমি—মানে, আমার এই হাত—এই অভিশপ্ত হাত—'

শেষ দিকে আবার গলাটা কেঁপে গেল বিজনের।

'আপনি কি বলছেন ঠিক বুঝতে পারছি নে। আপনি কেন দায়ী হতে যাবেন? মৃত্যুর রিপোর্টটা শুনেছেন নিশ্চয়ই। দরজা বন্ধ অবস্থায় প্রথম রাত্রেই সুপর্ণা দেবীর মৃত্যু হয়েছিল। এবং তাঁর মৃতদেহ প্রথম আবিষ্কার করেন তাঁর মামা। একটি টেলিফোন এসেছিল রাত সাড়ে এগারোটায়, ফিল্ম স্টুডিও থেকে। রাত তিনটের সময় একটা নতুন সেটের কাজ আরম্ভ হবার কথা—আড়াইটের মধ্যে গাড়ি পাঠাবেন ডাইরেকটার। সুপর্ণাকে ডেকে দিতে গিয়েই দুর্ঘটনা আবিষ্কৃত হল।'

আমি বললাম, 'কিন্তু কোন চিৎকার চেঁচামেচি কিছুই কি বাড়ির কেউ শুনতে পায় নি?'

সত্যেন বলল, 'বাড়ির নক্সা লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবে যে পায় নি। এই যে—' পকেট থেকে একটুকরো কাগজ বের করে দেখাল, পেন্সিলে আঁকা, সুপর্ণার ঘরের কাছাকাছি কারও ঘর নেই, কেবল

লাইব্রেরী, বৈঠকখানা, বাথরুম, ড্রেসিংরুম ইত্যাদি রয়েছে। মোট কথা একটা সম্পূর্ণ তলাই তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল।'

ছবি সম্বন্ধে এর পরেই কথা উঠল। বিজন তার ছবি সম্বন্ধে নিজে যা বলল তা হচ্ছে, সে নিজেও তার রেখা এবং রঙের আশ্চর্য ক্ষমতা বুঝতে পেরেছে। এগুলো বুদ্ধি দিয়ে বোঝা বা বোঝানো যায় না, এগুলি কেবলমাত্র অনুভবযোগ্য বিশ্বাসের ব্যাপার। একদিন বাঘের একটা মুখ আঁকছিল বিজন, স্টুডিওর মধ্যে একা একা। ছবিটা যখন সম্পূর্ণ করে এনেছে প্রায়, তখন হঠাৎ আঁতকে উঠেছিল বাঘের গায়ের গন্ধ পেয়ে। এছাড়া আরও ঘটনা ঘটেছে ছোটখাটো। কিন্তু সুপর্ণার কেনা পেঁচার ছবিটার ইতিহাস সকলকে হার মানিয়েছে। বিজনের ধারণা এই ছবিটাই সুপর্ণার মৃত্যুর জন্যে দায়ী। সুপর্ণা বারবার এই ছবির কথাই বলেছিল মৃত্যুর আগের সন্ধ্যায়। হাতের রেখায় মানুষের ত্রিকালের ছবি পড়ে, জ্যোতিষ শাস্ত্রের এই গণনা যদি সত্যি হয়, তাহলে হাতের রেখায় আঁকা ছবিই বা ভবিষ্যতের কথা কিছু বলতে পারবে না কেন! যেমন গ্রহসূত্রে বাঁধা পাথর, মানুষের ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রিত করে, যেমন মন্ত্রতন্ত্রের কিছু কিছু সিদ্ধি আমাদের বিশ্বাসের বাইরে নয়, তেমনি বিজনের ছবি আঁকার হাত দৈব-প্রাপ্ত।

কিছুক্ষণ পরে সত্যেন বিদায় নিল। আমি আর বিজন মুখোমুখি বসে রইলাম কয়েক মিনিট। কারো মুখে কথা নেই। স্টুডিওর বেয়ারা এবং টাইপিস্ট এসে গেছে ইতিমধ্যে। মেসিনগানের গুলির মত লোহার অক্ষরগুলো কার্বোনের পিঠে গিয়ে বিঁধছে। সেই শব্দের মৌতাতের মধ্যে আমি বুঁদ হয়ে বসে রয়েছি। ভাবছি মানুষের ভাগ্যের কথা, নিয়তির কথা এবং আশ্চর্য, অভূতপূর্ব প্রতিভার কথা।

'এই হাত আমাকে টানছে।' অদ্ভুত গলায় কথা বলল বিজন। আমি চমকে তাকালাম।

'কি আজেবাজে বকছ, একটু শান্ত হও, ওরকম উত্তেজিত হলে কি চলে?'

'আমার কথা তোমরা এখন বুঝতে পারবে না, কিন্তু আমি ঠিকই বলছি—ঠিকই বলছি—' তুলিদানী থেকে একটা তুলি তুলে নিয়ে হাতের তালুর ওপর ভেঙে ফেলল বিজন।

পেঁচার ছবিটার দিকে তাকিয়ে বসেছিলাম রাত্রে আমার শোবার ঘরে। ছবিটা চেয়ে এনেছিলাম সত্যেনের কাছ থেকে। ছবিটা সত্যিই রহস্যময়। ফাটা কাচের আবরণের মধ্যে থেকেও কি অস্বাভাবিক জীবন্ত চোখে পাখিটা আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

ডিম লাইটটা জ্বালিয়ে জোড়াসন হয়ে বসে আছি খাটের ওপর। দেয়ালের পাখিটার দিকে চোখ রেখে। হান্টিং স্পটের দিকে শিকারী যেমন একদৃষ্টে তাকিয়ে জেগে বসে থাকে, কখন তার শিকার আসবে টোপ গিলতে। আমি জানি আজ রাত্রে কিছু পাব।

ধীরে ধীরে রাত নিঃঝুম হয়ে এল। পাড়া নিশুতি। পেটা-ঘণ্টায় বারোটা বেজে গেল। ঘরের মধ্যে কেবল নিঃশব্দ অস্থিরতা। কেমন একটা অস্বস্তি ছড়িয়ে পড়েছে আমার চারপাশে, আমার দেহের ওপর, আমার মনের মধ্যে। অশরীরীর নিশ্বাসের মত। যেন প্ল্যানচেটে আত্মার প্রতীক্ষায় এতক্ষণ বসে ছিলাম। এইবার তারই উপস্থিতি যেন মনে-মনে অনুভব করতে পারছি।

জোর করে আলো নিভিয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু অস্বস্তি আমার স্নায়ুর রাজ্য অধিকার করে বসে রয়েছে, তা থেকে নিষ্কৃতি নেই। রাত কত জানি না, সিলিংয়ের দিকে অন্ধকারের চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে ঘুমের জন্য কৃচ্ছ্র সাধনা করছি, কিন্তু বোধ হয় আজ রাত্রে আমার কাছ ঘেঁষবে না। মাথার মধ্যে দপদপ করছে, দু'চোখের মধ্যে উত্তাপ অনুভব করছি। হঠাৎ মনে হল ঘরের মধ্যে অত্যন্ত কর্কশ গলায় প্যাঁচা ডেকে উঠল। ধড়মড় করে

উঠে বসলাম বিছানার ওপর। একটু তন্দ্রার ভাব এসেছিল কিনা কে জানে। কান থেকে তখনো রেশ মেলায় নি ওই নিশাচর পাখির ডাকের। হঠাৎ আবার টেলিফোন চেঁচিয়ে উঠল, ঠিক পেঁচার ডাকের প্রতিধ্বনি করে।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও যন্ত্রটাকে কানের কাছে টেনে নিতে হল। তারের অপর প্রান্ত থেকে ভেসে এল আমার অতিপরিচিত একটি কণ্ঠস্বর। একটু উত্তেজিত।

বললাম, 'হ্যাঁ আমিই কথা বলছি, কিন্তু ব্যাপার কি সত্যেন?'

'স্যাডেস্ট অ্যাণ্ড দ্য মোস্ট শকিং নিউজ, বিজন মারা গেছে।'

'কে মারা গেছে। বিজন? তুমি কি এই শেষরাতে প্রলাপ বকছ?'

'আমি চরম সত্য কথা বলছি, আজ এই মুহূর্তে, বিজনের ব্যাপারে এরচেয়ে সত্য কথা আর কিছুই হতে পারে না। আমাদের ডক্টর যা নোট দিয়েছেন তা হচ্ছে কয়েক ঘণ্টা আগে বিজনের মৃত্যু হয়েছে। হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়েই মৃত্যু ঘটেছে, তবু শরীরের অবস্থা খুবই অস্বাভাবিক। মনে হচ্ছে—আচ্ছা টেলিফোনে এসব কথা নয়, আমি গাড়ি নিয়ে তোর ওখানে যাচ্ছি, গেট রেডি।'

'কিন্তু কোথায় বিজনের মৃতদেহ আবিষ্কার করলে, তা তো বললে না?'

'সচক্ষেই সেটা দেখো। আমি আসছি—'

কয়েক মিনিটের মধ্যেই একটি পুলিশ-জীপ আমার বাড়ির দরজায় এসে থামল। আমি সেই চারটে রাতে প্রস্তুত হয়েই ছিলুম। সঙ্গে সঙ্গেই গিয়ে উঠলাম। পরেশ কলকাতার বাইরে গিয়েছিল, তাই তাকে আর খবরটা দেওয়া হল না।

জীপ ছুটলো চৌরঙ্গীর দিকে। আমার সমস্ত মন এমন অবসন্ন যে, কোন কথা বলতে ভালো লাগছিল না। পাইপ দাঁতে চেপে

সত্যেন বসেছিল আমার পাশে নির্বিকার মুখে। যেন বাসের সহযাত্রী। একসময় আমার পিঠে সমবেদনার ছোঁয়া লাগল। সত্যেন তার হাতের মৃদু চাপ দিয়ে সবই বোঝালো।

আমি বললাম, 'একেবারে অবিশ্বাস্য। এই কালও যার সঙ্গে এত কথা বলেছি, রাত না পোহাতেই তার মৃত্যু-সংবাদ—সহ্য করা যায় না।'

'ভেরি শকিং—'

'সুইসাইড মনে হল?'

'কেন বল তো?'

'কাল বিজন বলছিল: 'এই হাত আমাকে টানছে, কথাটা এখনো কানে লেগে রয়েছে আমার, বারবার যেন ওর গলা শুনতে পাচ্ছি।'

'বলা শক্ত। মার্ডার কি সুইসাইড কি সাডেন্ ডেথ, আই মীন মেয়ার অ্যাক্সিডেন্ট বলা শক্ত। চল, নিজের চোখেই দেখবে।'

দেখলাম। চৌরঙ্গী পাড়ার একটি হোটেলের দোতলায়। স্যুট নম্বর কার নামে ছিল জানি না, তবে সেই স্যুটের একটি ঘরে বিজন ছাড়া আর কেউ ছিল না তার নজির দেখতে পেলাম। ঘরের দরজায় খাড়া পুলিশ পাহারা। ফটোগ্রাফাররা বিদায় হয়েছেন শুনলাম। ঘরখানা আসবাবপত্রহীন বলা যায়। দেয়ালে প্রকাণ্ড একখানা দামী বেলজিয়াম গ্লাস। একপাশে নিচু দেড় ফুট উঁচু চাইনীজ ডিজাইনের পালঙ্ক। নিভাঁজ বেড কভার পাতা।

মাঝখানে ইজেল। ছোট্ট একটা ডানলোপিলো দেওয়া টুল। বাঁ দিকে বেশ উঁচু একটা লাইট স্ট্যাণ্ড, ফোকাস এসে পড়েছে ইজেলের ওপরে। হেঁট হয়ে টুলের ওপরে বসে আছে একটি লোক। পিছন থেকে তাকে জীবন্ত বলেই ভ্রম হয়। কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় একটি নিস্পন্দ নিঃসাড় দেহ, আর স্পর্শ করলে, হিম-শীতল, আড়ষ্ট, কঠিন।

সামনে গিয়ে দেখলাম, লোকটি আমাদের প্রতিভাবান সহকর্মী এবং বন্ধু বিজন ছাড়া আর কেউ নয়। ডান হাতের তিন আঙুলে একটি তুলি উঁচানো, চোখের দৃষ্টি বরফ দেওয়া মাছের চোখের মত খোলা। ইজেলের তলায় রঙের ট্রে। ইজেলের ক্যানভাসে কতকগুলো দ্রুতগতি রেখা ছড়ানো। একাধিক রঙে আউটলাইন এবং কর্তার কনসেপশনের ছোপ দেওয়া হয়েছে। প্রথমে এলোমেলো মেঘের আভাস মনে হয়। পরে একটি মেয়ের নগ্নমূর্তি, নাচের ভঙ্গিমায়। এবং আরও পরে ফণা তোলা একটি সাপের ছবি আত্মপ্রকাশ করে। ছবি দেখেই এমন মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম যে, ডেথ-স্পটে দাঁড়িয়ে রয়েছি মনে ছিল না।

'ছবিটা আঁকতে গিয়েই, বলতে গেলে আঁকতে আঁকতেই মারা গেছেন বিজন তালুকদার—কিন্তু তাঁর মডেল কোথায় ?'

সত্যেনের জিজ্ঞাসায় আমি চমক ফিরে পেলাম। চারপাশে তাকিয়ে দেখলাম। সিলিংয়ের বাতি জ্বলছে না। ঘরে দ্বিতীয় কোন আসবাবপত্র নেই। সামনের দিকে ব্যালকনির দরজা ভেতর থেকে কাচ বন্ধ। পাশে আর একটি দরজা দেখে উঁকি মারলাম। বাথরুম। ফিরে এসে বললাম, 'মডেল এঘরে ছিল না। কোন ফটো কিংবা স্কেচ থেকে বিজন আঁকছিল।'

'কি করে বুঝলে ?'

'ইজেলের দিকে যেরকম অ্যাঙ্গেল করে বিজন বসে আছে, আর একটিমাত্র আলোর ফোকাস যেভাবে পড়েছে, তাতে মডেলের উপস্থিতি সম্ভব ছিল না। তাছাড়া মাথা হেঁট করে রয়েছে অথচ [illegible] তুলি উঁচোনো রয়েছে, এ থেকেই প্রমাণ হয়, তুলিতে রঙ [illegible] পর তার কোলের ওপরে রাখা ফটোর দিকে নিশ্চয় [illegible] সে—'

[illegible] ?' বলে খানিকক্ষণ কি ভাবল সত্যেন, তারপর ব্যালকনির [illegible] একবার, আর একবার বাথরুমের কাছ থেকে কিসব

দেখে ফিরে এল, 'তাহলে ঘরের মধ্যে কেউ আসে নি বলছ ; দরজা-জানলা ভেতর থেকে অবশ্যই বন্ধ ছিল, ভেঙে ঢোকা হয়েছে।'

'ঠিক তাই—' আমি বললাম, 'কিন্তু এই আকস্মিক মৃত্যুর কারণ কিছুই আমার মাথায়...'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও, একটা বিষয় আমাদের এখানে ভেবে দেখার আছে। যে মেয়েটির ছবি আঁকা হচ্ছিল, অর্থাৎ যে ছবি বা ফটো দেখে, সেটি তাহলে কোথায় ? এই ঘরের মধ্যে কোথাও তো তার চিহ্নও দেখতে পাওয়া যায় নি—

সত্যিই আমি ব্যাপারটা ভেবে দেখি নি। সত্যেন বাথরুমের দিকে আবার এগিয়ে গেল। বাথরুমের দিকে সত্যেন বারবার কেন যাচ্ছে ভেবে পেলাম না। একটু পরে ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো। রুমালে জড়ানো কি একটা জিনিস তার হাতে।

'কি ওটা, দেখি দেখি।' থানার ও-সি ব্যগ্র কৌতূহল নিয়ে প্রবেশ করলেন।

'একটি সামান্য প্লাগ,' সত্যেন বলল, 'বাথরুমের প্লাগ-পয়েন্ট আধখোলা অবস্থায় ছিল, সঙ্গে একটু তারও আছে।'

'তাতে কি হয়েছে ?' হা হা করে হেসে উঠলেন ও-সি।

আমি বিব্রত বোধ করলাম। সত্যি বলতে কি সত্যেনের এই গাঁজাখোরী গোয়েন্দাপনা আমার কাছেও ছেলেমানুষী মনে হচ্ছিল। প্লাগ-পয়েন্টে একটি প্লাগ পরানো থাকবে, এতে চঞ্চল হয়ে উঠবার কি আছে বুঝতে পারলুম না।

কথার জবাব না দিয়ে সত্যেন মৃদু হেসে দেয়ালের পাশ দিয়ে আইগ্লাস বুলোতে বুলোতে ব্যালকনির কাচের দরজাটার কাছে এগিয়ে গেল। তারপর খুব চিন্তিত হয়ে কি যেন দেখল সেখানে। কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে কি ভাবল। তারপর তার চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। দরজার খিলটা ম্যাগ্নিফাইং গ্লাস দিয়ে পরীক্ষা করল।

'ইউরেকা। ইউরেকা।' সত্যেন চাপা গলায় আমাকে কাছে ডাকল। থানার ও-সিও আমার সঙ্গে সঙ্গে পা বাড়ালেন।

আমি খুব উৎসাহিত হয়ে বললাম, 'কি, কোন সূত্রটুত্র পাওয়া গেল নাকি?'

সত্যেন বললে, 'নিশ্চয়।'

'কই, দেখি দেখি?' ও-সির আর তর সয় না।

'এই যে, কাচের দরজার লোহার খিল।'

'কাচের দরজার খিল, ব্যস। কিন্তু আপনার সূত্র কই?'

'ওই। সূত্র বলেন সূত্র, লোহার খিল বলেন লোহার খিল।'

'তুমি কি এই সময়ে মাথামুণ্ডহীন রসিকতা শুরু করলে।'

আমার কথার উত্তরে কাচের পাল্লা দুটো দেখিয়ে সত্যেন বলল, 'দেখ তো কোন দাগ দেখতে পাও কিনা কাচের গায়ে?'

দেখলাম সত্যিই কাচের পাল্লা দুটোর গায়ে একটি বিরাট পরিধি নিয়ে অর্ধবৃত্তাকার দাগ। কাচের দরজায় ধুলো জমেছিল, তার ওপর অস্পষ্ট ভাবে দাগটা পড়েছে।

বললাম, 'কিন্তু এ তো লোহার খিলের ঘষা লেগে কাচের ওপর আঁচড় পড়েছে। এর মধ্যে তুমি রহস্য কোথায় পেলে?'

'ভালো করে দেখ তো দাগটা খিলেরই কিনা। খিলের হলে ভেতর দিকে হবে দাগটা। নইলে—'

'আশ্চর্য! দাগটা বাইরের পিঠে। কিন্তু—' খিলটি খুলে নামাতে নামাতে আমি আমার বিস্ময় প্রকাশ করলাম, 'কিন্তু ঠিক খিলের মাপেই দাগটা পড়েছে।'

'তবেই বুঝতে পারছ এই ঘরে বিজনের মৃত্যুর সময়ে মানুষ ছিল।'

'বুঝতে কিছুই পারছি নে। এই দাগের সঙ্গে, প্লাগের সঙ্গে মানুষের কি সম্পর্ক। আর মানুষ যদি এসেই থাকে, তাহলে সে বেরিয়ে গেল কোন্ পথ দিয়ে।'

'বিজনকে হত্যা করে সে কৌশলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে। আর সেই কৌশলই আমাদের কাছে ধাঁধার সৃষ্টি করেছে। আমরা ভেবেছি এটা আত্মহত্যা।'

ও-সি এবার মুখ খুললেন, 'হেঁয়ালি রেখে ব্যাপারটা খুলে বলুন তো মশাই। আপনাদের সাসপেন্স আমার হার্টের পক্ষে ক্ষতিকর হচ্ছে।'

'ব্যাপারটা আসলে কঠিন কিছু নয়। হত্যাকারী বিজনের হালচাল সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিল। সে জানত এই রাত্রে বিজন এই ঘরে বসে ছবি আঁকবে। তাই সে আগে থেকেই প্রস্তুত হয়ে এসেছিল। বাথরুমে যে হিটারের জন্যে একটি প্লাগ পয়েন্ট আছে তার না-জানা ছিল না। সে একটি প্লাগ আর কয়েক গজ তার সঙ্গে করে এনেছিল। ঘরের মধ্যে আগে থেকেই লুকিয়েছিল হত্যাকারী, সময় বুঝে প্লাগ কানেকশন দিয়ে তারের প্রান্তটা নিয়ে বিজনের পিছন দিকে গিয়ে উপস্থিত হয়। তারপর বিজনের ঘাড়ের কাছে সেটি ছুঁইয়ে দিতে যা বিলম্ব। এসি কারেন্ট নির্ভুল ভাবে বাকি কর্তব্যটুকু পালন করেছে। আকস্মিক ভাবে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে বিজন মারা গেছে। হার্টের ক্রিয়া হয়েছিল সেই বিষয়ে সন্দেহ নেই। ডাক্তারী পরীক্ষার শেষ রিপোর্ট একটু আগে টেলিফোনে আমি পেয়েছি।'

'কিন্তু হত্যাকারী এত পথ থাকতে ইলেকট্রিক শক্ দেওয়াই পছন্দ করল কেন, আর সে দরজা-জানলা বন্ধ অবস্থায় ঘর থেকে বেরিয়ে গেলই বা কি উপায়ে?'

'সবই বলছি ধীরে ধীরে। বৈদ্যুতিক পন্থা গ্রহণ করার কারণ আক্রান্ত ব্যক্তি চিৎকার করার অবকাশ পাবে না। নিঃশব্দে অল্প সময়ের মধ্যে অতি সহজে কাজটা হাঁসিল হয়ে যাবে। তাছাড়া এই উপায়ে হত্যা করা তেমন নিষ্ঠুর কাজ বলে মনে হয় নি হত্যাকারীর কাছে। এবং সে ভেবেছিল এই হত্যা ডাক্তারী পরীক্ষায়

ধরা পড়বে না। হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা গেছে—তা আরও প্রমাণ সিদ্ধ করার জন্য সে দরজা বন্ধ করে রেখে গেছে। বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করেছে সে এক আশ্চর্য উপায়ে। একটা শক্তিশালী চম্বুককে সে কাজে লাগিয়েছে কাচের ও-পিঠ থেকে লোহার খিলটাকে যথাস্থানে স্থাপন করার কাজে। কাচের গায়ে চম্বুকটিকে টানা হয়েছিল খিলের আগার সমান্তরাল ভাবে। তারই দাগ পড়েছে কাচের পাল্লায়।'

আমরা দুজন সত্যেনের কথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। সত্যেনের সূক্ষ্ম দৃষ্টির প্রশংসা না করে পারলাম না। যেমন আশ্চর্য এই হত্যা করার পদ্ধতি, তেমনি আশ্চর্য সেই রহস্যভেদ।

'কিন্তু বিজনের কোন শত্রু ছিল বলে জানি না। তাকে হত্যা করে কারই বা কি লাভ হতে পারে ভেবে পাই না। এমন কিছু মূল্যবান জিনিস ছিল না যা কেড়ে নেবার জন্যেও কারও পক্ষে এই জঘন্য ধরনের কাজ সম্ভব।'

সত্যেন বলল, 'এই ঘর থেকে স্পষ্টতই একটি জিনিস খোয়া গেছে, এবং সেটি বিজনের হত্যার পরেই, সেটা হচ্ছে ওই ছবির, অসম্পূর্ণ ছবির মডেল। সেই ফটোগ্রাফটি। এই হত্যাকাণ্ডটা যে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করা ছাড়া আর কিছু নয়, এই হত্যার কেন্দ্রে যে একটি নারী রয়েছে, একথা সুতরাং বলাই বাহুল্য।' একটুক্ষণ চুপ করে থেকে সত্যেন আবার শুরু করল, 'আঁকা ছবির অসম্পূর্ণ হরফ থেকে স্পষ্ট অনুমান করা যায় না, তবু একটি মেয়ের কথা এই প্রসঙ্গে আমি মনে না এনে পারছি না।'

অধৈর্য আবেগে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কে সেই মেয়ে?'

'সুপর্ণা সেন। সামান্য কিছুকাল আগে, যাকে প্রায় কিছুক্ষণ বলে মনে হয়, যে মারা গেছে, সম্ভবত নিহত হয়েছে।'

'সুপর্ণা সেন!' আমি সবিস্ময়ে চিৎকার করে উঠলাম, 'সুপর্ণা সেনের ছবিই ক্যানভাসে আঁকা হয়েছে বলছ—কই দেখি—উঁহু,

এই ফিগার কি সুপর্ণা সেনের? মনে হয় না।'

'আমি বলি নি এই ছবি সুপর্ণা সেনের। আমি বলেছি তার কথা স্বভাবতই মনে পড়ে। আমার আর একটু তদন্তের কাজ বাকি আছে—আমি বিকালে তোমার সঙ্গে দেখা করব।'

আমি যখন চৌরঙ্গী থেকে বিদায় নিলাম, তখন চারপাশ রোদে ঝলমল করছে। কিন্তু আমার চোখের সামনে তখন অন্ধকার নেমে এসেছে। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বাড়ি ফিরলাম।

ক্লোজ-আপে বসেছিলাম আমি আর পরেশ। এমন সময় সত্যেনের আবির্ভাব। সঙ্গে সঙ্গে থানার ও-সি। যথাযোগ্য সমাদরে বসালাম ওদের। তারপর পরেশের সঙ্গে আগন্তুক দুজনের পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললাম, 'কূল-কিনারা হল কিছু?'

সত্যেন গম্ভীর মুখে বলল, 'হ্যাঁ, সেইজন্যেই এসেছি। হত্যাকারী ধরা পড়েছে।'

আমি আর পরেশ দুজনেই আকস্মিক সংবাদে হকচকিয়ে গেলাম।

বললাম, 'বল কি হে, এটা তাহলে সত্যি-সত্যিই মার্ডার! তোমার অনুমানই সত্যি হল। কিন্তু তাকে গ্রেপ্তার করে কোথায় রেখেছ?'

সত্যেন বললে, 'তাকে গ্রেপ্তার করতেই এসেছি।'

পকেট থেকে হাতকড়া বের করে থানার ও-সি এগিয়ে এলেন আমাদের দিকে, 'আসুন পরেশবাবু, নিষ্ঠুর কর্তব্যটুকু আগে সেরে ফেলা যাক, তারপর গল্পগুজব করা যাবে'খন।

আমি উত্তেজিত হয়ে প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিলাম, পরেশ ইঙ্গিতে নিষেধ করে হাত দুটো বাড়িয়ে দিল। আমি বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত দাঁড়িয়ে থাকলাম। সমস্ত কিছু যেন ওলট-পালট হয়ে গেল বিজনকে হত্যা করবে পরেশ, স্বপ্নেও এমন অবাস্তব কল্পনা আমার

পক্ষে সম্ভব ছিল না। কেবল আমাদের নিবিড় বন্ধুত্বের জন্যেই একথা ভাবতে আমাদের কষ্ট হচ্ছিল তা নয়, বিজনের মত নিঃস্বচরিত্র শিল্পীকে হত্যা করে তার লাভই বা কি।

সত্যেন আমার দিকে তাকিয়ে বলল,'আমি খুব দুঃখিত যে এমন একটা মর্মান্তিক ঘটনার সাক্ষী হয়ে থাকতে হল আমাকে। কিন্তু অপ্রিয় সত্যের ভারবাহী আমরা, উপায় নেই।'

'কিন্তু আমি যে এখনও পর্যন্ত কিছুই বুঝতে পারছি নে—এমন একটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার—তাছাড়া আমাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু বিজনকে হত্যা করে পরেশের লাভই বা কি—তুমি নিশ্চয়ই এবিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ হাতে নিয়েই কথা বলছ—'

সত্যেন ম্লান হেসে বলল, 'পরেশবাবুর সঙ্গে আমার কোন স্বার্থের সম্পর্ক ছিল না যে তাঁকে এমন একটা গুরুতর অভিযোগে অভিযুক্ত করতে যাব! প্রমাণ প্রয়োগ ছাড়া এক-পা আমরা এগোতে পারি না এ তো বলাই বাহুল্য। পরেশবাবুর ঘরে ঘোড়ার ক্ষুরের আকৃতির একটি বিরাট চুম্বক আছে আমি আগেই লক্ষ্য করেছিলাম। এ ধরনের চুম্বক আগের দিনে দেখা যেত। সম্ভবত কোন ওল্ড কিউরিও শপ থেকে তিনি প্রথম যখন কিনেছিলেন, তখন দুষ্প্রাপ্য সামগ্রীর চিহ্ন হিসেবেই কিনেছিলেন,কিন্তু পরে অন্য কাজে তিনি লাগালেন। ইলেকট্রিক শক দেবার আগে তিনি হোটেলের সেই ঘরের মধ্যেই ছিলেন, কিন্তু ঘরটির মধ্যে লুকিয়ে থাকার মত জায়গা ছিল না। বাথরুম আত্মগোপন করার নিরাপদ জায়গা নয়। সেই কারণে আমার প্রথমেই সন্দেহ হয়েছিল, আততায়ী এমন কোন লোক যে বিজনবাবুর পরিচিত। কিন্তু বিজনবাবুকে যতদূর জানতাম, তাঁর পক্ষে দুটি লোককে ঘরের মধ্যে রেখে দরজা বন্ধ করে ছবি আঁকা সম্ভব ছিল, এক তাঁর মডেল, দ্বিতীয় ক্লোজ-আপের অন্য সহকর্মী। তোমার কথা শুনেই মডেলের সম্ভাবনা বাদ দিয়েছিলাম আমার দিক থেকে।'

সত্যেন তার পাইপটি ধরিয়ে নিল, তারপর আবার শুরু করল, 'সুপর্ণা প্রসঙ্গেই আমি খবর পেয়েছিলাম, পরেশবাবুও তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন। তাছাড়া বিজনবাবুর যে দুটি ছবি সম্প্রতি আমেরিকায় চড়া দামে বিক্রী হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে—সে ছবি দুটির চিত্রকর হিসেবে নাম আছে পরেশবাবুর। সুপর্ণা দেবীর ড্রয়ারে বিজনবাবুর সদ্য লিখিত একটি পত্রে তার উল্লেখ আমি পাই। তাছাড়া চৌরঙ্গীর হোটেলের স্যুটটি একদিনের জন্যে যে অপরিচিত নাম্নী ভদ্রলোক ভাড়া নিয়েছিলেন, তাঁর স্বাক্ষর এবং পরেশবাবুর হস্তাক্ষর এক বলে প্রমাণিত হয়েছে। পরেশবাবুর গোপন সঞ্চয়স্থানে হানা দিয়ে আমি বিজনবাবুর আঁকা এক ডজন অন্তত ছবি পেয়েছি। চিত্রকলায় সামান্য জ্ঞান যেটুকু আছে তাতে বুঝতে পেরেছি, সেগুলি ভবিষ্যতে যুগান্তর আনবে। আমাদের সামনেই সেদিন বিজনবাবু তাঁর হারানো ছবি খুঁজছিলেন। তাছাড়া এই ফটোগ্রাফ নিশ্চয়ই চিনতে পারো—'

একটা ন্যূড ছবি বের করল পকেট থেকে, না, সুপর্ণার ছবি নয়, ক্যানভাসের ভঙ্গির সঙ্গে হুবহু মিল খায় এমন একটি অপরিচিত নারীমূর্তির।

সত্যেন বলল, 'এটিও পরেশবাবুর ডায়েরীর মধ্যে পেয়েছি আজকে।'

সম্পাদক : রঞ্জিত চট্টোপাধ্যায়
১২, হরীতকী বাগান লেন, কলিকাতা-৬, গোলাপ প্রিন্টিং ওয়ার্কস
হইতে শ্রীঅমিত চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত ও মুদ্রিত।

রঞ্জিত চট্টোপাধ্যায়ের
'সোনার আংটি উধাও' সম্পর্কে
'আজকাল'এর মন্তব্য

গা-ছমছম পরিবেশ, লোমহর্ষক রক্তারক্তি, ঘটনার ঘনঘটা কিছুই নেই। তবুও রঞ্জিতবাবু আসর জমিয়ে দিয়েছেন। এবং এগুলি গোয়েন্দা গল্পই! রঞ্জিত চট্টোপাধ্যায় গল্প বলতে জানেন। সেই গল্পের ভাঁজে জড়িয়ে দেন রহস্যের সুতো। সেই সুতোর জটে আমাদের রোজকার চেনা, আটপৌরে ঘরোয়া পরিবেশেও মেঘের মত ঘনিয়ে আসে উৎকণ্ঠা। তখনই বোঝা যায় কিশোর গোয়েন্দা অভ্রদীপের কেরামতি। বাহুবল নয়, তার আসল ভরসা বুদ্ধি। রহস্য গল্পে রহস্যভেদীর সঙ্গে পাঠকের একটা কৃত্রিম দূরত্ব থাকে। কিন্তু অভ্র যেন আমাদের ঘরের ছেলে। তাকে নিয়ে বাবা-মার উৎকণ্ঠা, ভাই-এর খুনসুটি, অভ্রদীপের কীর্তি-কাহিনীর নানা বৃত্তান্তে ঠাসা রঞ্জিত চট্টোপাধ্যায়ের 'সোনার আংটি উধাও' নামে এই গল্প-সংকলনটিতে নিয়ে এসেছে একটা ঘরোয়া মেজাজ! অভ্রর ভাই শুভ্রই বা কম যায় কিসে? অন্তত দুটি ক্ষেত্রে দাদাকেও তার পাল্লায় পড়ে নাস্তানাবুদ হতে হয়েছে। সোনার আংটি উধাও থেকে শুরু ভূতের সন্ধানে ইস্তক সঙ্কলনের প্রতিটি গল্পই এক নিশ্বাসে পড়ে শেষ করে ফেলবে কিশোর পাঠক। 'রোমাঞ্চ'র আমল থেকে রহস্য গল্পে আমাদের মাতাচ্ছেন রঞ্জিত চট্টোপাধ্যায়। দীর্ঘদিন চুপ থাকার পর ৭৯-তে তাঁর সসম্মান প্রত্যাবর্তন। তিনি প্রমাণ করলেন 'পুরোন চাল ভাতে বাড়ে'।

দে বুক ষ্টোর ॥ ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট ॥ কলিকাতা ৭৩